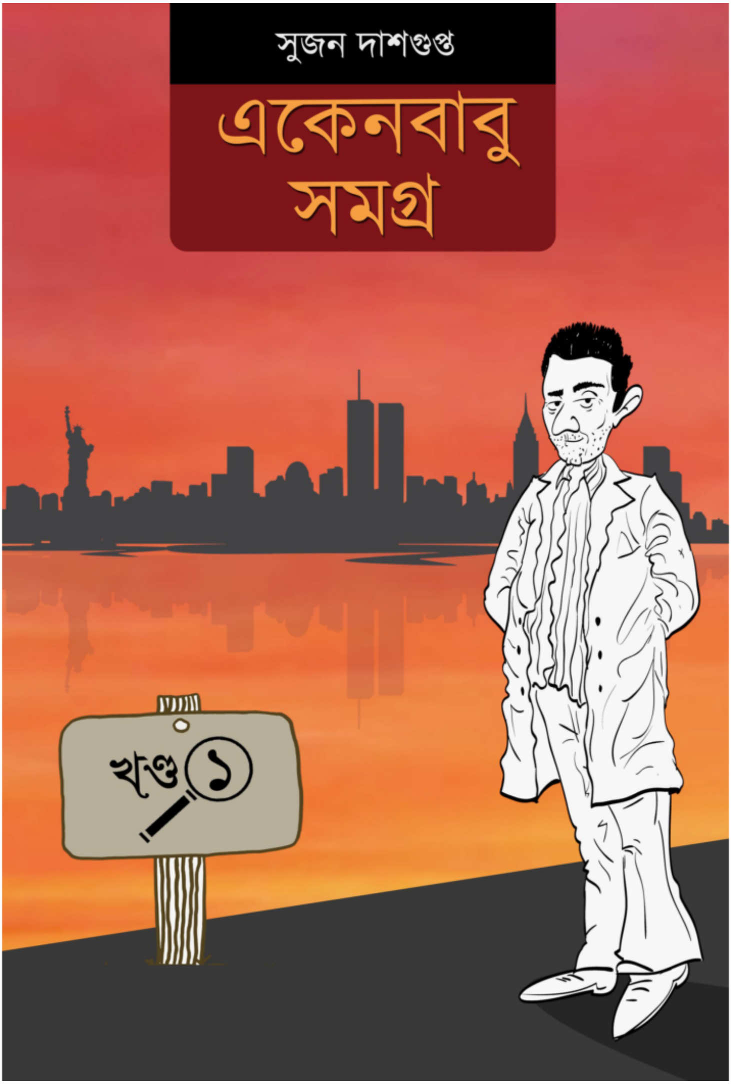
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ১

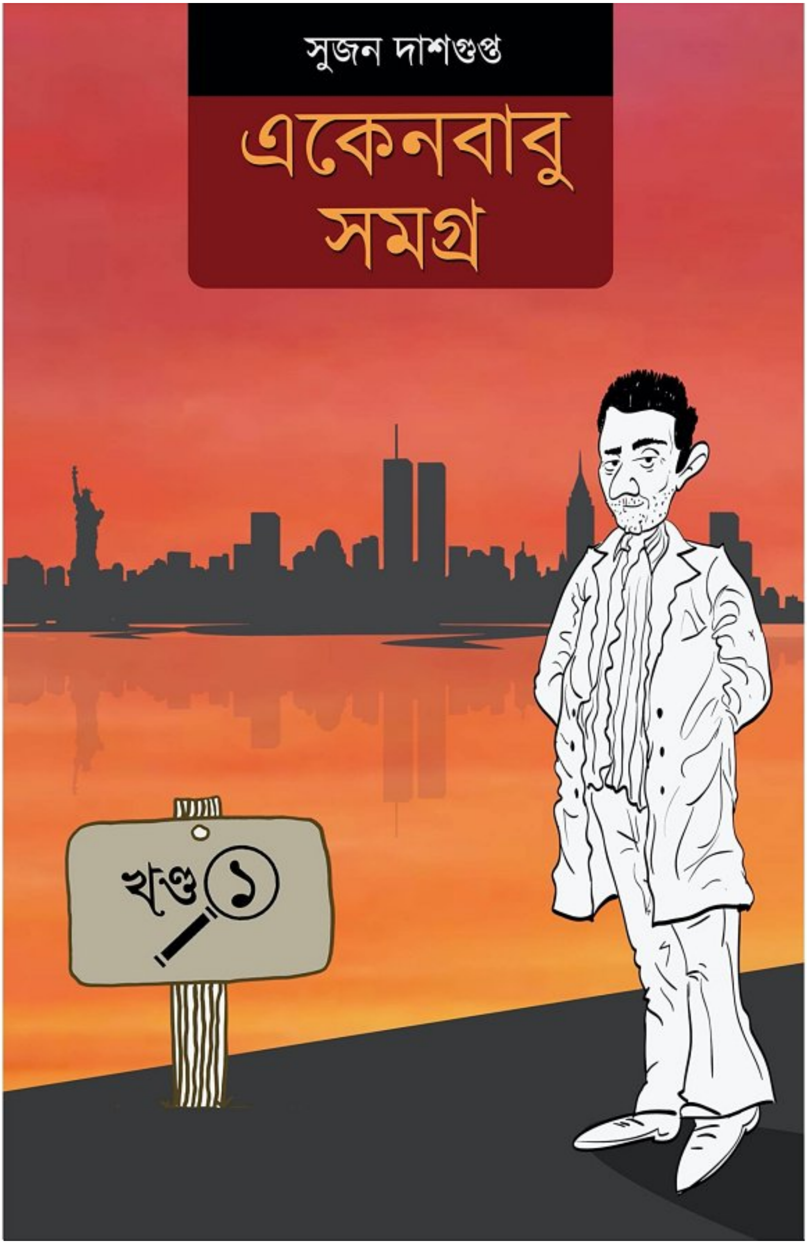
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ১

একেনবাবু সমগ্র

(প্রথম খন্ড)

সুজন দাশগুপ্ত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

The Cafe Table

www.thecafetable.com

Ekenbabu Somogra (Prothom Khondo)
Sujan Dasgupta
A Collection Of Detective Novels

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৭
পঞ্চম প্রকাশ	এপ্রিল ২০২০
ই-বুক প্রকাশ	জুলাই ২০২০
গ্রন্থস্বত্ব	সুজন দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ	একতা ক্রিয়েটিভ টেলস্
পত্রবিন্যাস	ইন্দ্রাণী নাগ
মুদ্রক	জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা-০৯
ই-বুক সংস্করণ	উত্তরণ দত্ত ও সুমন্ত অধিকারী টিম: দ্য বুকমেকার্স
মূল্য	৩২৫ টাকা / ১৬.২৫ ডলার
ISBN	978-93-87753-01-3
প্রকাশক	অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র দ্য কাফে টেবল সাহেববাগান, ব্যান্ডেল, হুগলি – ৭১২১২৩ ৯৮৭৪২৬৩৪১৩, ৯৭৪৮০৮১৫৪২

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য- সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সূচি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

ম্যানহাটানে মুনস্টোন

ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট

ঢাকা রহস্য উন্মোচিত

একেনবাবু ও কেয়াদিদি

সংখ্যার সংকেত

লেখকের কথা

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

একেনবাবু গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিলেন কিশোরদের জন্যে। ওঁর প্রথম দুটো কাহিনি 'ম্যানহাটানে মুনস্টোন' ও 'ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট' প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই দশকের প্রথম দিকে 'আনন্দমেলা' পত্রিকায়। যে সময়ে গল্প দুটি লেখা হয়েছিল, তখন আমেরিকায় মোবাইল ফোনের যুগ শুরু হলেও ভারতবর্ষে সেই টেকনোলজি আসেনি, ইন্টারনেটও না। কলকাতা থেকে ম্যানহাটানে এসে শুধু মাথা খেলিয়েই একেনবাবু রহস্যের সমাধান করেছিলেন। কিন্তু তারপর বহুদিন একেনবাবুর খোঁজখবর নেই।
প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তিনি বড়দের গোয়েন্দা! একেনবাবুর চরিত্র অবশ্য পাল্টায়নি, কিন্তু গল্পের চরিত্র পালটেছে। ঘটনাস্থল এখন আর শুধু ম্যানহাটান নয়। আর যুগটাও ইন্টারনেট, মোবাইল ও ফরেন্সিক টেকনোলজির যুগ। তার প্রভাব অল্প-বিস্তর কাহিনিগুলোতে পড়েছে।

একেনবাবু সমগ্র-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্পগুলোর কয়েকটি নিয়ে। তবে প্রত্যেকটি কাহিনিই পরিমার্জিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই একেনবাবুর প্রথম দু'টি গল্প থাকছে। বড়দের কাহিনিগুলির রচনাকাল ২০০৮ সাল থেকে ২০১৫। 'সংখ্যার সংকেত' বাদে বাকি গল্পগুলি পূর্ব-প্রকাশিত।

সুজন দাশগুপ্ত
মন্টভিল, নিউজার্সি

সুমিত রায়কে

ম্যানহাটানে মুনস্টোন

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১ ।।

নিউ ইয়র্কে থাকার একটা মস্ত অসুবিধা হলো চেনা-অচেনা অনেককেই এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করতে হয়। শুধু রিসিভ করা নয়, মাঝেমধ্যে দু'-দশ দিনের জন্য এদের হোস্টও হতে হয়। আমি প্রায় ছ'বছর ম্যানহাটানে আছি। এর মধ্যে এমন একটা মাসও যায়নি যে, আমাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, না চাইলেও এসব ঝামেলা এড়ানো খুব মুশকিল। তবে ছ'বছর এই আনপেইড পাবলিক সার্ভিস দিয়ে একটা জিনিস কিন্তু হয়েছে। আমি এখন চোখ বুজে ইউ এন বিল্ডিংয়ের গাইডেড ট্যুরটা দিতে পারি। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের কত নম্বর এলিভেটর ক'তলা অবধি যায়, সার্কেল লাইন ট্যুর ঠিক ক'টার সময় শুরু হয়, গুগেনহাইম মিউজিয়ামে ঢুকতে কত ডলার লাগে— সব আমার ঠোঁটস্থ।

"বিগ ডিল", প্রমথ আমাকে প্রায়ই খোঁচা দেয় এই নিয়ে। "তোর এই বিদ্যেগুলো হচ্ছে ইউজলেস। ফালতু পাবলিক সার্ভিসের বদলে তুই যদি পিৎজা ডেলিভারির কাজও নিতিস, তাহলে মাসান্তে অন্তত একস্ট্রা টু-পাইস ব্যাঙ্কে জমা পড়ত।"

প্রমথ সমাদ্দার আমার বহুদিনের বন্ধু, বালিগঞ্জে এক পাড়ায় দু'জনে বড় হয়েছি। ও এখন কেমিস্ট্রিতে এন ওয়াই ইউ, মানে নিউ ইয়র্ক ইউনিভারসিটিতে পিএইচডি করছে। থাকে দোতলায়, আমার নীচের অ্যাপার্টমেন্টে। প্রমথ হল আমার ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। তবে গাইড না বলে গার্জেন বলাই ভালো। সেটা হবার নাকি ওর হক আছে। লতায় পাতায় আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ও আবিষ্কার করেছে। আসলে ও নাকি আমার মামা!

অনাহুত অতিথি নিয়ে কমপ্লেন করছি বলে এই নয় যে, ইন্টারেস্টিং লোক কখনো আসেননি। বছর দেড়েক আগে শৈলেন সাঁপুই বলে এক ভদ্রলোক ক'দিন আমার কাছে এসে ছিলেন। রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কি জানি কী করতেন। ওঁর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল কপাল দেখে পাস্ট ফিউচার সবকিছু বলে দেওয়া। আমার দিকে তাকিয়ে ধাঁ করে বলে দিলেন সাত বছর বয়সে আমার জলে ডুবে মরার কথা, নেহাত বৃহস্পতির জোরে বেঁচে গেছি।

সাত কিনা মনে নেই, কিন্তু ছেলেবেলায় চৌব্বাচায় পড়ে গিয়ে সত্যিই একবার প্রায় মরমর হয়েছিলাম। প্রমথ তো সাঁপুইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে খুব ইমপ্রেসড হয়েছিল। ওর বাবার মৃত্যুর খবর উনি একেবার ঠিকঠাক বলে দিয়েছিলেন।

তবে শৈলেন সাঁপুইয়ের মতো ইন্টারেস্টিং লোক কদাচিৎ আসেন। ভদ্রলোক দিন পনেরো ছিলেন আমার কাছে। তার মধ্যেই ওর এত চেলা-চামুন্ডা জুটে গেল যে, রাইস ইনস্টিটিউটের কাজ ছেড়ে উনি একেবারে ফুলটাইম অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে বসলেন। শুনেছি এখন কুইন্সে একটা বাড়ি ভাড়া করে আছেন। ভাগ্য গণনা করেন আর গ্রহদশা ঘোচাবার জন্য তাবিচ, গ্রহরত্ন, ইত্যাদি নানান জিনিস বিক্রি করেন।

আর একবার মুম্বই থেকে পেশাদার ম্যাজিশিয়ান এসেছিলেন 'ওয়ার্ল্ড ম্যাজিক

কম্পিটিশনে' যোগ দিতে। আমার ছোটোমামার পরিচিত। প্রমথ আড়ালে তাকে 'মিস্টার ইন্দ্রজাল' ডাকত। মিস্টার ইন্দ্রজাল দুর্দান্ত ম্যাজিক দেখাতেন, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে নানান রকমের ডেঞ্জারাস সব কমেন্ট করতেন। একদিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে ম্যাজিকের আসর বসেছিল। আকাশে হাত বাড়িয়ে মিস্টার ইন্দ্রজাল নিজের নাম সই করা পাসপোর্ট সাইজের ছবি কোথা থেকে বের করেছিলেন ভগবান জানেন! আর সেগুলো এক-একটা করে দর্শকের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন, "জানেন, হোলিম্যান আর ম্যাজিশিয়ানের তফাত কি?"

সবাই চুপ।

মিস্টার ইন্দ্রজাল নিজেই তখন উত্তরটা দিলেন। "একজন হল অনেস্ট, আর একজন ডিজঅনেস্ট। আমি যেটা দেখাচ্ছি — সেটা হলো পিওর ম্যাজিক, স্রেফ হাত সাফাইয়ের খেলা। আর আমি সেটা স্বীকারও করি। কিন্ত আমাদের গুরু অবতার এটাকে বলেন বিভূতি। তা হলে অনেস্ট কে?"

প্রফেসর আনন্দ প্রভাকর সেখানে ছিলেন, এক বিভূতি দেখানো সাধুবাবার অন্ধ ভক্ত। তিনি মিস্টার ইন্দ্রজালকে এই মারেন কি সেই মারেন! যাচ্ছেতাই কান্ড! অনেক কষ্টে সবাইকে সেদিন শান্ত করা গিয়েছিল।

প্রমথ সেবার আমায় ধরে প্রচন্ড জ্ঞান দিয়েছিল। "এরপর তুই নিজে না চিনলে কাউকে বাড়িতে থাকতে দিবি না। তোর গেস্টদের বিহেভিয়ারের জন্য পাবলিক তোর ওপর কী রকম ক্ষেপেছে, সেটা জানিস!"

আমিও নাকে খৎ দিয়েছিলাম। এই শেষ, আর না। অচেনা কাউকে আর বাড়িতে রাখব না। কিন্তু ম্যান প্রোপোজেস এন্ড গড ডিসপোজেস। দেশ থেকে পাড়ার বন্ধু রনুর চিঠি-ওর এক বিশেষ পরিচিত মিস্টার সেন আমেরিকাতে এক মাসের জন্য আসছেন, আমি যেন তাঁকে রাখি। তারপর ছেলেবেলায় আমরা কত বন্ধু ছিলাম, আশা করি আমেরিকাতে গিয়ে পুরোনো বন্ধুকে ভুলে যাইনি-সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে নানা কথা। কত বড় বদমাস!

।। ২।।

সাধারণত লোক দেখলে আমার বিতৃষ্ণা হয় না। কিন্ত মিস্টার সেনকে দেখে হল। উসকোখুসকো চুল ভর্তি বিশাল মাথা একটা ক্যাংলা শরীরের উপর বসানো। গায়ে নোংরা সাদা শার্ট। ঘিয়ে রঙের কোটটা এমন কোঁচকানো যে মনে হয় দলামোচা করে কেউ কিছুক্ষণ আগে সেটার উপর বসেছিল। প্যান্টের অবস্থাও তথৈবচ। অমেরিকায় আসছে লোকটা, কিন্ত জামাকাপড়ের ব্যাপারে এতটুকু হুঁশ নেই! গলার স্বরটাও ভারি ঘ্যানঘেনে, বিরক্তিকর। তার ওপর একটা মুদ্রাদোষ খেয়াল করলাম, কথার পিঠে 'স্যার' জোড়া।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সবে ভ্যানউইক এক্সপ্রেসওয়েতে পড়েছি, মিস্টার সেন নীরবতা ভাঙলেন। একটা সিগারেট আমার নাকের সামনে নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "চলবে স্যার?"

“আমি খাই না”, সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

“ভালোই করেন স্যার, ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। আমিও এবার ছাড়ব।” বলে সিগারেটটা ঠোঁটে লাগাতে যাচ্ছিলেন। কী ভেবে নামিয়ে নিলেন।

“স্যার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?”

“করুন।”

“সিগারেটের ধোঁয়া কি আপনাকে বদার করে?”

“ওয়েল তা অবশ্য একটু করে।” সত্যি কথাই বললাম।

“তার মানে স্যার, আমি এখানে সিগারেট খেলে আপনি বদারড হবেন।”

“না, না, একটু আধটুতে কী আর অসুবিধা, আপনি খান।”

“নো স্যার, আই ক্যান নট বদার ইউ। আচ্ছা গাড়িটা কোথাও থামানো যায় না? তাহলে আমি টুক করে নেমে দুটো টান দিয়ে নিতাম।”

“না, এটা হাইওয়ে। এমার্জেন্সি স্টপিং-এর জন্য কোনো লেন না পাওয়া পর্যন্ত থামার উপায় নেই।”

“আই সি।”

আমার খারাপ লাগল। বললাম, “আপনি খান, এক -আধটা সিগারেটে কিছু এসে যায় না।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এটা আবার সময়মতো না খেলে সাইনাসটা ট্রাবল দেয়।”

লোকটা উন্মাদ নাকি! সাইনাসের সাথে ধূমপানের সম্পর্ক কী? মরুক গে যাক!

হঠাৎ খেয়াল করলাম, ভদ্রলোকের কোলের উপর রাখা ব্যাগে লেখা মিস্টার ই. সেন। ই. সেন দেখে আমি খুব অবাক হলাম। এর মধ্যে রনু একদিন ফোনও করেছিল ওর বন্ধু এন সেন যে আমেরিকা আসছে — সে খবরটা আমি ঠিকঠাক পেয়েছি কিনা। কী সর্বনাশ, আমি কি তাহলে ভুল লোককে গাড়িতে তুললাম!

“আচ্ছা আপনার ফার্স্ট নেমটা কী?”

“একেন।”

“একেন! খুব আনইউস্যুয়াল নামটা তো!”

“একেন্দ্র থেকে একেন। বাবা-মা একেবারে মার্ডার করে গেছেন স্যার। এই নিয়ে সবার গোল লাগে।”

‘হঠাৎ ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। রনুর আদি বাড়ি ঢাকায়। তাই একেন সেন না বলে বলেছিল অ্যাকেন সেন। আর আমি ভেবেছিলাম যে এক এন. সেন এসেছেন। হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। একেন সেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। কনফিউশনটা ওকে বলতেই মাথা দুলিয়ে বললেন “ভেরি ফানি স্যার”। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট থেকে বড় একটুকরো ছাই গাড়ির হলুদ কার্পেটটার ওপর পড়ল। আমি সাবধান করার আগেই জুতো দিয়ে কালো ছাইটা কার্পেটে ঘষে ঘষে মিশিয়ে দিলেন। অর্থাৎ এখন একশো বার ভ্যাকুয়াম করলেও ওই দাগ তোলা যাবে না!

সাত দিনও হয়নি একেনবাবু এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই ওঁর অনর্গল বাক্যবাণে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত! সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সবে রান্না চাপিয়েছি, একেনবাবু কিউ টিপ দিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে এসে বললেন, "আপনাদের 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড' পেপারটা ওলটাচ্ছিলাম স্যার। আপনি দেখেছেন, একজন ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যান দিনদুপুরে মার্ডারড?"

খবরটা চোখে পড়েছিল। এক ভারতীয় অ্যান্টিক ডিলার খুন হয়েছেন হিট অ্যান্ড রান অ্যাক্সিডেন্টে, অর্থাৎ মোটর গাড়ি চাপা দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সে নিয়ে আলোচনা করার উৎসাহ আমার ছিল না।

"কী মনে হয় স্যার, রেশিয়াল অ্যাটাক?"

আমি হ্যাঁ হুঁ কিছুই করলাম না। একেনবাবুর বকবক অবশ্য তাতে থামল না।

"লোকটার ব্যাগে নাকি হাজার ডলার ক্যাশ পাওয়া গেছে। সেইজন্যই পুলিশ সন্দেহ করছে রবারি নয়। তবে একটা জিনিস একেবারে অ্যাবসার্ড স্যার।"

"কী অ্যাবসার্ড?" কথা বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল না, তাও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"এই এত ক্যাশ নিয়ে ঘোরা। নিউ ইয়র্কে যখন এত মাগিং হয়, তখন এসব নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কেন?"

আমার বিরক্তি লাগল। বললাম, "কেন কলকাতা কিংবা মুম্বাইয়ে ছিনতাই হয় না?"

"না স্যার, নিউ ইয়র্কের মতো হয় না।"

"কে বলেছে আপনাকে? এখান থেকে কত লোক দেশে গিয়ে টাকা খুইয়েছে জানেন? আমাদের অবিনাশই তো গতবার দেশে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতে পর্যন্ত পারল না। ড্রাইভার্স লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড সবকিছু গন! কী প্রচণ্ড ঝামেলা! যার জন্য এবার ও সব কিছু এখানে রেখে গেছে।"

অবিনাশ প্রমথর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করে। কিছুদিন হল দেশে বেড়াতে গেছে।

একেনবাবু দমলেন না। "গ্র্যান্ট ইয়ু স্যার, পিক পকেটে আমরা টপে আছি। কিন্তু মার্ডার ছিনতাইয়ের ব্যাপারে নিউ ইয়র্কের কাছে স্যার আমরা শিশু। এই দেখুন না, কলকাতায় বছরে খুন হয় একশো জনের মতো। আর নিউ ইয়র্কে আড়াই হাজার! অথচ প্রায় সমান সমান পপুলেশন।"

"কোথায় শুনলেন কথাটা?"

"কাল টিভিতে বলছিল স্যার," উজ্জ্বলমুখে খবরের অথেন্টিসিটি প্রমাণ করলেন একেনবাবু।

কী শুনতে কী শুনেছেন কে জানে! কিন্তু আমি আর কথা বাড়ালাম না।

"আচ্ছা স্যার, প্রমথবাবু বলছিলেন, এখানে ভারতীয় অ্যান্টিক ডিলাররা নাকি সংখ্যায় গোনাগুনতি?"

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অর্থ হয় না। চুপ করে রইলাম।

"ইট মেকস সেন্স স্যার। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যা কড়াকড়ি করে! ভালো অ্যান্টিক দেশ থেকে আনতে হলে চুরি করে পাচার করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।"

"আপনি কি মিন করছেন", আমি বিরক্ত হয়ে বললাম। " অ্যান্টিক বিজনেসে যারা আছে তারা সবাই চুরি করছে?"

"না না, তা নয় স্যার। অ্যান্টিক ডিলার মাত্রই চোর নয়। আমি বলছি চোর হলে, সে ভালো অ্যান্টিক ডিলার হতে পারে।"

চোখ বুজে সিগারেটে শেষ টানটা দিলেন একেনবাবু।

"দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ান স্যার।" ফাঁকা প্যাকেটটা আমাকে দেখিয়ে বাইরের ঘরের

সোফায় গিয়ে বসলেন। "আই কুইট সিগারেট। আর জ্বালাব না আপনাকে।"

আমার অ্যাপার্টমেন্টে একটা বড় ঘরের একদিকে কিচেন-কাম-ডাইনিং এরিয়া, অন্যদিকে বসার ঘর। সুতরাং কিচেন থেকেও গলাটা একটু তুলে বসার ঘরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলা চলে।

আমি বললাম "গুড ডিসিশন। তবে আমাকে জ্বালানোর প্রশ্ন নয়, ইট ইজ গুড ফর ইয়োর হেলথ।"

"আচ্ছা এই ক্রেডিট কার্ড জিনিসটা ফ্যান্টাস্টিক, তাই না স্যার? প্লাস্টিকের একটা পাতলা কার্ড, তার উপর আপনার নাম আর নম্বর এম্বস করা। অথচ তাই দিয়ে আপনি হাজার হাজার ডলারের জিনিস কিনে ফেলছেন!"

"তা ফেলছি, তবে সে টাকা পরে দিতেও হচ্ছে। সময় মতো না দিলে উইথ হেভি ইন্টারেস্ট।"

"তা বটে। তবে কী ওয়ার্ল্ড স্যার, আর আমরা কোথায় পড়ে আছি! পকেটে ক্যাশ না নিয়ে বাজারে যাবার জো নেই।"

"কেন আমাদের দেশেও তো ক্রেডিট কার্ড চলছে।"

"কী যে বলেন স্যার, কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা! ক'জনের আছে কার্ড? আমাদের দেশে এসব আমজনতার হাতে আসতে বহুদিন লাগবে। ব্লিক ফিউচার স্যার, ব্লিক ফিউচার।" বলে ঘন ঘন কয়েকবার পা নাচালেন একেনবাবু।

"আচ্ছা স্যার, ফিউচারের কথায় মনে পড়ে গেল। আপনার এক বন্ধু ফরচুন টেলার না?"

"বন্ধু নয়, এককালে আমার এখানে কিছুদিন ছিলেন। আপনাকে তাঁর কথা কে বলল?"

"প্রমথবাবু। বলেছিলেন ওঁর কথা নাকি খুব ফলে। তাছাড়া গ্রহদশা কাটানোর জন্যে উনি নাকি রত্ন-ফত্ন প্রেসক্রাইব করেন — খুব এফেক্টিভ জুয়েল।"

"এফেক্টিভ কিনা জানি না, গ্রহ-রত্ন দেন বলে শুনেছি।"

"আপনি মনে হচ্ছে এসবে খুব একটা বিশ্বাস করেন না স্যার?"

"না," সত্যি কথাই একেনবাবুকে বললাম। "করি না।"

"যাঃ, তাহলে তো ওর কাছে যাবার কোনো অর্থ হয় না।"

"কী মুশকিল, আপনার ইচ্ছে হলে আপনি নিশ্চয় যাবেন। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আপনার কী এসে যায়!"

"তা না স্যার, আসল কথা — না থাক গে। প্রমথবাবুর বোধহয় একটু উইকনেস আছে — তাই না স্যার?"

"হ্যাঁ, প্রমথ কিছুটা বিশ্বাস করে।"

"তবে যাই বলুন স্যার, নীলা হ্যাস পাওয়ার। সকলকে স্যুট করে না অবশ্যি। যাদের করে তাদের একেবারে ফরচুন এনে দেবে।"

কী অসম্ভব বকবক করতে পারে লোকটা, তাই ভাবছিলাম।

আমার মনের কথাটা একেনবাবু শুনতে পেলেন কিনা জানি না, কিছুক্ষণের মধ্যেই বকবকানি থামিয়ে দেখলাম 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' নিয়ে চুপ করে বসলেন।

বাঁচা গেছে! আমি রান্নায় মন দিলাম। কিন্তু কতক্ষণ? এবার একেনবাবুর প্রশ্ন,

"আচ্ছা স্যার, কেউ যদি কার্ড চুরি করে বহু টাকার জিনিস কিনে ফেলে?"

আমি অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ওঁর দিকে তাকালাম।

"মানে আমি ক্রেডিট কার্ডের কথা বলছি," একেনবাবু চিন্তার সূত্র ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

"আপনি এখনও ওই নিয়ে চিন্তা করছেন! আমি তো ভাবছিলাম আপনি নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়ছেন!"

"পড়ছিলাম। কিন্ত নিউজ কিস্যু নেই, যতসব বস্তাপচা খবর! দেখুন না, কী খোয়া গেছে কেউ জানে না, তবু এখনও সেই স্মিথসোনিয়ানের স্পেস মিউজিয়াম থেকে চুরি নিয়ে পাতা ভর্তি! দুটো স্পেস স্যুট চুরি গেল কি না গেল, হু কেয়ারস? কিন্তু একটা জলজ্যান্ত ইন্ডিয়ান রাস্তার ওপর মার্ডারড হল, তার কোনো উল্লেখ নেই!

টোটালি বায়াসড স্যার, টোটালি বায়াসড।"

কথাগুলো বলে একেনবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন। একটু বাদেই দেখি ছোট ছোট পাথর ভর্তি একটা জুতোর বাক্স নিয়ে ফিরে এসেছেন।

"আচ্ছা এই পাথরগুলো কেমন লাগছে স্যার? কাল বেয়ার মাউন্টেন থেকে নিয়ে এসেছি।"

"সুন্দর," আমি প্রায় না দেখেই বললাম।

"প্রমথবাবুকে সারপ্রাইজ দেব বলে নিয়ে এলাম।"

"প্রমথ পাথর নিয়ে কী করবে?"

"কেন স্যার, ওর ক্যাকটাস গাছগুলোর নীচে ছড়িয়ে রাখবেন।"

এবার ভালো করে তাকালাম। না, পাথরগুলো সত্যিই সুন্দর। প্রমথ নিঃসন্দেহে খুব খুশি হবে।

।। ৪।।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি, একটু হাঁটবেন? আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য স্কুলে যেতে হবে, কালকে পড়াবার নোটটা ফেলে এসেছি।"

একেনবাবু টেবিলের উপর পা তুলে বসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই পা নাচাতে নাচাতে বললেন "আপনি স্কুল বললেন কেন স্যার, ইউনিভার্সিটিতে যাবেন বলুন!"

"এখানে ইউনিভার্সিটিকে লোকে স্কুল বলে।"

"ভেরি কনফিউসিং স্যার। স্কুল হচ্ছে স্কুল। মানে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন বা টুয়েলভ অবধি। তারপর কলেজ, তারপর ইউনিভার্সিটি। এখানে কি তার উলটো নাকি! "

"উলটো নয়, এখানে সব কিছুই স্কুল।"

একেনবাবু একটু মাথা চুলকোলেন। তারপর উঠে ক্লজেট থেকে ওঁর মান্ধাতা আমলের ওভারকোটটা বার করে বললেন, "চলুন স্যার, ডিনারের পর হাঁটাটা স্বাস্থ্যকর।"

আমি ওকে ইনভাইট করেই কিন্তু মনে মনে আফসোস করতে শুরু করেছি। সারাটা পথ বকিয়ে বকিয়ে মারবেন। মারলেনও। শুধু বাঁচোয়া প্রমথর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। প্রমথ স্কুল থেকে ফিরছিল। বলল সুপারমার্কেটে যাচ্ছে, বাজার করে বাড়ি ফিরবে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত রাত্রে?"

"আর বলিস না, অবিনাশের আঙ্কল ডি. এম কাল রাত্রে হঠাৎ এসে হাজির।"

আঙ্কল ডি. এম হলেন অবিনাশের মামা কিরিট প্যাটেল। ভদ্রলোক ডায়মন্ড মার্চেন্ট বলে প্রমথ ওঁকে আড়ালে ওই নামে ডাকে।

"তোর কাছে বেড়াতে এসেছেন!" আমি আশ্চর্য হলাম।

"বেড়াতে নয়, নিরুপায় হয়ে। ওঁর বাড়ির হিটিং হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। এদিকে আজকেই আমার আবার হেকটিক স্কেজুল।"

"আমাকে একটা ফোন করে দিলেই পারতিস। আমাদের সঙ্গেই না হয় খেয়ে নিতেন।"

"আরে ধ্যেৎ, সেটা কি আমার মাথায় আসেনি না কি? ঝামেলা হলো, ভদ্রলোক হচ্ছেন স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান — এমনকী পেঁয়াজ পর্যন্ত খান না। বাড়িতে এদিকে কোনো তরিতরকারি নেই। কিছু না কিনলেই নয়! যাই হোক, গুড নিউজ হল ভদ্রলোক কালই ইন্ডিয়া কাটছেন।"

নিউ ইয়র্কে ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়িতে হিট না থাকা যে কী সমস্যা, সেটা ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবে। জমে কুলপি না হলেও নির্ঘাৎ নিমোনিয়া! তবে অবিনাশের আত্মীয়ের জন্য প্রমথের মাথা ব্যথা দেখে আমি বেশ অবাক হলাম। অবিনাশ প্রমথর সঙ্গে প্রায় এক বছর হল অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করছে ঠিকই, কিন্তু দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা আপাতত মোটেই মধুর নয়।

আমার বুঝতে দেরি হল না একেনবাবু কোন দিকে যেতে চান। বাজার করার ব্যাপারে একেনবাবুর প্রচণ্ড আগ্রহ। প্রত্যেকটা জিনিসের দরদাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েন, আর দেশের সঙ্গে অনবরত তুলনা করেন!

আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি, আপনি প্রমথর সঙ্গে যাবেন নাকি?"

একেনবাবু বোধহয় লজ্জা পেলেন। "না না, স্যার, আপনার সঙ্গে বেরিয়েছি, আপনার সঙ্গেই ফিরব।"

"তাতে কী হয়েছে, আমার সঙ্গে বেরিয়েছেন বলেই আমার সঙ্গে ফিরতে হবে?"

প্রমথও হইহই করে উঠল। "আরে চলুন, চলুন। আমার আবার একা একা বাজার করতে বোর লাগে।"

আমি ভেবেছিলাম চট করে ফিরব, কিন্তু সেটা হল না।

কলেজ থেকে বেরোবার মুখেই প্রায় এক ঘন্টা ধরে প্রচন্ড বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে পিলে চমকানো বাজ। ফিরতে ফিরতে প্রায় দশটা বেজে গেল। বাড়ির সামনে পৌছে দেখি রাস্তার উপর দুটো পুলিশের গাড়ি, একটা অ্যাম্বুলেন্স আর কিছু লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে। পুলিশের গাড়ির উপরে লাল-নীল লাইটগুলো ঘুরপাক খেয়ে- খেয়ে চারিদিকে আলোর ঘূর্ণি তুলেছে। নিউ ইয়র্কে এটা অবশ্য খুব অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। আমাদের বিল্ডিংয়ে বেশ কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন। তাদেরই কেউ হয়তো অসুস্থ বা কারোর হার্ট অ্যাটাক।

গেটের মুখে দাঁড়ানো এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম "কী হয়েছে?"

অফিসারটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ওলটালো। বুঝলাম জবাব দিতে চায় না। কিন্তু আমি দরজার দিকে এগোতেই আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল, "ডু ইউ লিভ হিয়ার?"

"ইয়েস।"

উত্তরটা শুনে আর আটকালো না।

আমি লিফটে চেপে তেতলায় উঠতেই শুনলাম নীচের তলায় একটা গোলমাল হচ্ছে। এই প্রথম আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। সিঁড়ি ধরে নামতেই দেখি প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা হাট করে খোলা! দরজায় দু'জন পুলিশ, আর একটু দূরেই করিডরে প্রমথ আর একেনবাবু দাঁড়িয়ে। প্রমথর মুখ দেখে বুঝলাম খুব বিচলিত।

"কী হয়েছে?" আমি উদ্বিগ্ন হয়ে একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ও ধরা গলায় উত্তর দিল, "মিস্টার প্যাটেল মারা গেছেন।"

"কী বলছিস যা তা!" আমি ছুটে যেতেই প্রমথ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, "ওদিকে চল বলছি।"

করিডরের অন্য পাশে জানালার ধারে আমরা তিনজন দাঁড়ালাম। তারপর প্রমথর কাছে সব শুনে আমার রক্তও হিম হয়ে গেল। ঘটনাটা হচ্ছে, প্রমথরা বাড়ি ফিরেছে আধ ঘন্টাখানেক হল। সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র থাকায় একেনবাবু সোজা তিনতলায় না উঠে প্রমথর সঙ্গে দোতলায় নেমেছিলেন। প্রমথ ডোর বেল বাজিয়ে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে চাবি দিয়ে দরজা খোলে। ঘরে ঢোকা মাত্র চোখে পরে মিস্টার প্যাটেল চেয়ারে বসে, মাথাটা ডাইনিং টেবিলের উপরে। পেছনটা খালি দেখা যাচ্ছিল, কারণ মুখটা কিচেনের জানলার দিকে। কয়েক মুহুর্তের জন্য প্রমথ বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী। তারপরেই দেখে সারা টেবিল রক্তে ভেসে গেছে!

মেঝেতেও রক্ত — টেবিলের পায়া বেয়ে বেয়ে নেমেছে। মিস্টার প্যাটেলের বাঁ হাতটা সোজা অবস্থায় টেবিলের উপরে ছড়ানো, আর তার কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা রিভলভার পড়ে আছে। গুলিটা ঢুকেছে মাথার বাঁ দিকে, ঠিক রগের ওপর। প্রমথ এমনিতে খুব শক্ত। কিন্তু এমন ভয়াবহ রক্তাক্ত দৃশ্য দেখে প্রায় কোলাপস করছিল। ভাগ্যিস একেনবাবু সঙ্গে ছিলেন। শেষমেশ দুজনে শক্তি সংগ্রহ করে পুলিশকে ফোন করে।

প্রমথর কথা শেষ হয়নি, সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি, দু'জন লোক তাড়াহুড়ো করে উঠছে। একজন স্পোর্টস জ্যাকেট পরা প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা সাদা আমেরিকান। দ্বিতীয় লোকটা কালো, লম্বায় প্রায় আমাদেরই মত–পাঁচ সাত কি পাঁচ আট হবে। গলা পর্যন্ত জিপার লাগানো উইন্টার জ্যাকেট, কাঁধে ঝুলছে পেল্লাই সাইজের ফ্লাশ লাগানো ক্যামেরা। লম্বা লোকটা একবার আমাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রেসের লোক। কিন্তু ভেতরে 'ক্যাপ্টেন' শব্দ শুনে অনুমান করলাম হোমিসাইড স্কোয়াডের ডিটেক্টিভ।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্ট শুধু একফালি দেখা যায়। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সেখান থেকে আলোর ঝলকানি আসতে লাগল। আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে প্রায় স্ট্যাচু হয়ে দাড়িয়ে আছি। প্রমথ ছোট্ট করিডোরের ভেতরেই নার্ভাসনেসটা কাটানোর জন্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। বক্কেশ্বর দি গ্রেট একেনবাবুও চুপচাপ। মাঝে শুধু একবার দরজার সামনে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছেন। সময়ের দিক থেকে হয়তো আধ–ঘন্টার বেশি হবে না, কিন্তু আমার মনে হল প্রায় এক যুগ দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় লম্বা ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এসে আমাদের ভেতরে ডাকলেন। ঠিকই ধরেছিলাম হোমিসাইডের লোক। নিজের পরিচয় দিলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বলে।

ডেডবডিটা ইতিমধ্যে কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকেই সেখানে দাড়িয়ে। অনুমান করলাম তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার। ক্যামেরাম্যানকে তো আগেই দেখেছি। আরেকজনের কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, বোধহয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিট।

আরও দু'-একজন ছিল। তাদের ভালো করে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বডি নিয়ে ওরা সবাই চলে যাবার পর চারদিক দেখলাম। টেলিফোনের নীচে বাজারের ব্যাগটা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কিচেনের ডাইনিং টেবিলটা আর তার ঠিক নীচে মেঝের দিকে না তাকালে ঘরের আর সব কিছুই স্বাভাবিক। এখানে যে একটু আগে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা বোঝার জো নেই।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট প্রথমেই আমাদের সাইড টেবিলে রাখা টাইপ রাইটারের রোলারে যে কাগজটা আটকানো — সেটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমরা আগে এটা দেখেছি কিনা।

দেশে যাবার ক'দিন আগে কাগজ আটকানো অবস্থাতেই টাইপরাইটারটা অবিনাশ অ্যান্টিক স্টোর থেকে কিনেছিল। ভগবান জানে কেন! ঐ অবস্থাতেই ওটা পড়েছিল। অবিনাশ ব্যবহার করেনি। আর প্রমথ তো অবিনাশের কোনো কিছুই ব্যবহার করে না।

কাগজটা দেখেছি, কিন্তু কাগজের লেখাটা নতুন। লেখাগুলো আবছা তবে পড়া যাচ্ছে। 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ এনি মোর।'

ফিতের কালিগুলো প্রায় শুকনো। ধরে নিচ্ছি ঐ টাইপরাইটার ব্যবহার করেই কেউ লিখেছে। মিস্টার প্যাটেল? কিন্তু হাতে না লিখে এই মান্ধাতার আমলের টাইপরাইটার ব্যবহার করলেন কেন?

আমাদের বক্তব্য শোনার পরে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একজনকে ফোন করে টাইপরাইটারটা নিয়ে যেতে বললেন।

"ইউ উইল গেট এ রিসিট," আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন।

প্রমথ জানাল, "এটা যার, সে এখানে নেই।"

"তিনি কোথায়?" এভাবেই প্রমথর জবানবন্দি নেওয়া শুরু হল।

অবিনাশের প্রসঙ্গ শেষ হলে মিস্টার প্যাটেলের কথা এল। আমি ভেবেছিলাম প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদা আলাদা করে স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে। কিন্তু মনে হল এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট একটু ক্যাসুয়াল। ওঁর হাতে একটা ছোট্ট নোটবই। প্রশ্ন করছেন, আর মাঝেমাঝে সেখানে দু'-একটা পয়েন্ট লিখছেন। মিস্টার প্যাটেল যে এখানে থাকতেন না — হঠাৎ এসেছিলেন, সেটা শুনে উনি প্রমথকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁর এখানে আসার কথা আর কি কেউ জানতেন?"

প্রমথ উত্তর দিল, "অন্য কারো কথা বলতে পারব না, তবে মিস্টার ব্রিজ শাহ জানতেন।"

"ব্রিজ শাহ কে?"

"ব্রিজ শাহ ওঁর অ্যাটর্নি।"

"আপনি জানলেন কী করে যে, মিস্টার শাহ জানতেন?"

"আজ দুপুরে উনি আমার সামনেই মিস্টার শাহকে ফোন করে বলেছিলেন উনি আমার এখানে আছেন।"

"এছাড়া আর কী কথা হয়েছিল মনে আছে?"

"বলতে পারব না, কারণ ঠিক ঐ সময়ে আমি আমার ঘরে কিছুক্ষণের জন্যে যাই। তবে যখন বেরিয়ে আসি তখন শুনি মিস্টার শাহকে উনি বলছেন কাল সকালে ন'টার আগে অবশ্য করে একটা ফোন করতে। কী একটা খবর জানি ওঁর দরকার।"

"আর কারোর সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছিল?"

"আমি যতক্ষণ বাড়িতে ছিলাম — হয়নি।"

"আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে ছিলেন?"

"একটা নাগাদ স্কুলে যাই।"
"ওঁর আচার ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন কি?"
"হি ওয়াজ নট ইন দ্য বেস্ট অফ স্পিরিট।" প্রমথ এক মুহূর্ত চিন্তা করে উত্তর দিল।
"হোয়াই ডু ইউ সে দ্যাট?"
"আমার মনে হয়েছিল উনি একটু ডিপ্রেসড ছিলেন। আসার পর থেকে বাড়ির বাইরে কোথাও বেরোননি। শুধু তাই নয়, কারো সঙ্গে দেখা হোক — সেটাও উনি চাননি। আমাকে বলেছিলেন ওঁর এখানে আসার কথাটা কাউকে না জানাতে। "
"আপনি কাউকে জানিয়েছিলেন?"
"না।"
"একসেপ্ট আস," আমি মনে মনে বললাম।
এর পর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জানতে চাইলেন, মিস্টার প্যাটেল লেফট হ্যান্ডেড ছিলেন কিনা। প্রমথ বলল ও আগে জানত না। তবে সকালবেলায় মিস্টার প্যাটেল যখন কয়েকটা জিনিস আনার জন্য লিস্ট লিখতে যাচ্ছিলেন, তখনই ও প্রথম খেয়াল করে।
"লিস্টটা কোথায়?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন।
"শেষ পর্যন্ত লিস্টটা উনি লেখেননি," প্রমথ উত্তর দিল। "একটা মাত্র জিনিস হলেই চলবে বলেছিলেন।"
"কী জিনিস?"
"নাইলনের একটা শক্ত দড়ি।"
"নাইলনের দড়ি! এনি আইডিয়া, হোয়াই?"
"না," কথাটা প্রমথ বলল বটে, কিন্তু আমার চোখ এড়াল না যে, প্রসঙ্গটাতে ও অস্বস্তি বোধ করছে।
"সামথিং রং?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট প্রশ্ন করলেন।
"একটা কথা উনি বলেছিলেন, তখন সেটাকে আমি গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু... " এটুকু বলেই প্রমথ হঠাৎ চুপ করে গেল।
"কী বলেছিলেন?"
"আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কীরকম সাইজের দড়ি উনি চাইছেন। উনি...উনি একটা অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন।" প্রমথ আবার একটু থামল। "... আই থট ইট ওয়াজ এ জোক... আই স্টিল থিঙ্ক ...।"
"হোয়াট দ্য হেল ডিড হি সে?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের স্বরে অসহিষ্ণু ভাবটা স্পষ্ট।
"যা দিয়ে ফাঁস লাগানো যায় এমন দড়ি।" কোনোমতে কথাগুলো বলল প্রমথ।
আমি নিজের অজান্তেই ওপরে সিলিংয়ের দিকে তাকালাম। যদিও আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সিলিংয়ে কোনো হুক লাগানো নেই। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টও আমার দেখাদেখি পলকের জন্যে ওপরে একবার তাকালেন।
"দড়িটা কোথায়?"
"আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম ওটার কথা, কেনা হয়নি।"
"আই সি।" কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কী জানি ভাবলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। তারপর প্রমথ কী করে, কী না করে, কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, কখন ফিরেছে, টেবিলের রিভলভারটা আগে দেখেছে কিনা, ওর নিজের বন্দুক বা রিভলভার আছে কিনা, ইত্যাদি হাজার গন্ডা প্রশ্ন করলেন। আমি আর একেনবাবুও রেহাই পেলাম না। তবে একেনবাবুর ক্ষেত্রে ভোগান্তিটা একটু বেশিই হল। উনি এদেশে ভিসিটার শুনে ওঁর পাসপোর্ট দেখতে

চাইলেন। তারপর কেমন জানি সন্দিগ্ধভাবে ওঁর দিকে তাকালেন। আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবার কিছু একটা ঘটবে! ঠিক তাই। জেরা করার জন্য ওঁকে সোজা অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি আর প্রমথ দু'জনেই বেশ নার্ভাস হয়ে বসে রইলাম। নিউ ইয়র্ক পুলিশ কোনো কারণে কিছু সন্দেহ করে বসলে সর্বনাশ! আর বাক্যবাগীশ কী বলতে কী বলে বসবেন কে জানে! তবে যার ভয় পাবার কথা, তাঁরই কোনো বৈকল্য নেই। একটা কথা আছে না — 'হোয়্যার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড, দ্য ফুল রাশেস ইন'!

কিছুক্ষণ বাদে দিব্যি কান চুলকোতে চুলকোতে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের পেছন পেছন বেরিয়ে এলেন। শুধু তাই নয়, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট যখন চলে যাচ্ছেন, তখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "আপনার কি মনে হয় স্যার, এটা মার্ডার?"

এভাবে যে কেউ ওকে প্রশ্ন করতে পারে, সেটা বোধহয় ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কল্পনা করেননি। একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "ওয়েল, নাথিং ইজ ইমপসিবল।"

"কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!" প্রমথ বলল।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট প্রমথর দিকে বেশ একটু অবজ্ঞাভরে তাকালেন। দরজার নবটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "এই দরজা একটা ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়েও খোলা যায়। একটা ডেড বোল্ট লাগিয়ে নেবেন। নিউ ইয়র্ক ইজ নট এ সেফ প্লেস।"

।। ৫ ।।

আমি ভেবেছিলাম পুলিশ প্রমথর অ্যাপার্টমেন্ট লক করে দিয়ে চলে যাবে 'সিন অফ ক্রাইম' বলে। এরকম সিল করে যাওয়াটাই এখানকার দস্তুর। দরকার হলে যাতে পরে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় নতুন কোনো ক্লুর জন্য। তাই বেশ আশ্চর্য হলাম যখন "দ্য প্লেস ইজ অল ইয়োরস," বলে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বিদায় নিলেন।

ক্যাপ্টেন চলে যেতেই আমি আর প্রমথ সাবানজল আর স্পঞ্জ এনে বাইরের ঘর নিয়ে পড়লাম। মিস্টার প্যাটেলের দুটো স্যুটকেস পুলিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে। একেনবাবু সেগুলো গুছোতে ভেতরে গেলেন। আমাদের ধোঁয়াপোঁছার কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন একেনবাবু বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "স্যার আমাকে একটা ক্রেডিট কার্ড দেবেন?"

"ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কী করবেন?"

"দেখব সত্যিই দরজাটা খোলা যায় কিনা।"

আমি আর উচ্চবাচ্য না করে আমার 'আমেরিকান এক্সপ্রেসের' কার্ডটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম। একটু পরেই একেনবাবু বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে লক করে দিলেন।

একেনবাবু বাইরে গিয়ে খুটখাট করছেন। প্রমথ আচমকা প্রশ্ন করল,

"আচ্ছা বাপি, ওঁর যদি সুইসাইড করারই প্ল্যান ছিল তাহলে নিজের বাড়িতে না করে এখানে এলেন কেন? সুইসাইড নোটে সইটাই বা করলেন না কেন?"

প্রমথ কী ভাবছে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। না, চিঠিটা মিস্টার প্যাটেল নন, ওঁর হত্যাকারীই টাইপ করেছে। এটা আত্মহত্যা হতে পারে না, ইট গট টু বি এ মার্ডার।

কিন্তু প্রমথ সেটা শুনে সন্তুষ্ট হল না।

"সামহাউ ইট লুকস টু অবভিয়াস," এইটুকুই শুধু বলল।

"হোয়াট এলস কুড ইট বি, এনি আদার এক্সপ্ল্যানেশন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আই ক্যান থিঙ্ক অফ ওয়ান। ধর, এমন একজন লোক, যিনি নিজে বাঁচতে চান না, অথচ ওর রোজগারের ওপর যারা নির্ভর করে আছে, তাদেরও জলে ফেলতে চান না। এই অবস্থায় তিনি কী করতে পারেন?"

"আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড।" আমি বললাম।

"বুঝতে পারছিস না! আমি বলতে চাইছি, উনি সত্যিই সুইসাইড করেছেন, কিন্তু সেটা কেউ ধরে ফেলে, সেটা উনি চাননি। হি রিয়েলি ওয়ান্টেড ইট টু লুক লাইক এ মার্ডার। সেই কারণেই উনি এখানে এসে আত্মহত্যা করেছেন, আর সেই কারণেই উনি সুইসাইড নোটে সই করেননি।"

"তাতে লাভ?"

"লাভ হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলো যাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তারাই পাবে। সুইসাইড করলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কানাকড়িও জুটত না। সেটাই হচ্ছে আইন। এবার বুঝতে পারছিস?" (পরে অবশ্য জেনেছি — প্রমথর এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, সে কথা যাক।)

"তা পারছি। তবে অবাক লাগছে, ওর কথাবার্তা থেকে তুই কোনো ক্লু পাসনি যে উনি আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন!"

প্রমথ একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন মনে হচ্ছে হয়তো পেয়েছিলাম, একটা কথা কাল রাত্রে উনি বলেছিলেন, যেটা খুবই খাপছাড়া। উনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোনো উইল আছে কিনা। নেই শুনে বলেছিলেন, প্রত্যেকেরই উইল থাকা উচিৎ। ওয়ান মাস্ট বি প্রিপেয়ার্ড ফর ডেথ, দড়ির ব্যাপারটা তো ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকেই বলেছি। কিন্তু বলার সময় যেটা মনে পড়েনি, সেটা হল বেরোনোর সময় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আর কিছু লাগবে কিনা। তখন উনি বলেছিলেন 'রাইট নাউ, দ্যাট্স অল আই নিড।' 'রাইট নাউ' কথাটাতে বেশ খানিকটা জোর দিয়েছিলেন। বুঝলি, এখন নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হচ্ছে!" বিমর্ষভাবে প্রমথ বলল।

আমি প্রমথকে আশ্বস্ত করে বললাম, "দ্যাখ, আজ মিস্টার প্যাটেল মারা না গেলে, ওর এই কথাবার্তাগুলোতে আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারতাম না। তুই দড়িও কিনিসনি, আর সেই দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে উনি আত্মহত্যাও করেননি। উনি ব্যবহার করেছেন রিভলভার। ইন ফ্যাক্ট, উনি দড়ির খোঁজ করছিলেন কেন কে জানে!"

"আমার ধারণা স্যার, উনি দড়ি আনতে বলেছিলেন ওর স্যুটকেস দুটো বাঁধার জন্যে।"

আমি আর প্রমথ দু'জনেই চমকে উঠলাম একেনবাবুর গলায়। কখন নিঃশব্দে উনি ঘরে ঢুকে পড়েছেন!

"সে কি, আপনি ঢুকতে পারলেন?" আমি বেশ আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"নট টু ডিফিকাল্ট স্যার। ক্রেডিট কার্ডটা দরজা আর ফ্রেমের মাঝখানে ঢুকিয়ে যেখানে লকের মেটাল রডটা আছে — সেখানে চাপ দিলেই রডটা সরে যায়। আমি নিজেই সারপ্রাইজড স্যার!"

"মাই গুডনেস! দেখি কী করে ঢুকলেন?" প্রমথ উঠে দরজার দিকে গেল। আমিও পেছন পেছন গেলাম।

একেনবাবু গর্ব গর্ব মুখে একটা ডেমনস্ট্রেশন দিলেন। সত্যিই ব্যাপারটা খুব একটা শক্ত নয়।

“কী আশ্চর্য! এটা তো যে কেউ খুলতে পারে!” প্রমথ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

“তাই তো বলছিলাম স্যার, আমি নিজেই সারপ্রাইজড। কিন্তু যে কথাটা বলছিলাম স্যার, আমার ধারণা নাইলনের দড়িটা মিস্টার প্যাটেল স্যুটকেসের জন্যই চেয়েছিলেন।”

“আপনি কী করে সেটা বুঝলেন?”

“আসুন স্যার, স্যুটকেস দুটো আপনাকে দেখাই।”

অবিনাশের বেডরুমে বিছানার ঠিক পাশে মেঝের ওপর পর পর দুটো স্যামসনাইট স্যুটকেস। কোনোটাই পুরোপুরি বন্ধ নয়। একেনবাবু বললেন “আমি স্যার, অনেক সময় নিয়ে ভেতরে জিনিসগুলো গুছিয়েছি, এভরিথিং ইজ জ্যাম প্যাকড। কিন্তু বন্ধ করার চেষ্টা করুন স্যার।”

আমি একটার ডালা ধরে চাপ দিলাম, প্রমথ অন্যটার। বন্ধ হল ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে এত জোরে চাপ দিতে হল যে আমার ভয় হচ্ছিল লকটা ভেঙে খুলে আসবে। প্রমথকেও বার কয়েক চেষ্টা করতে হল ডালাটা বন্ধ করতে।

“আরেকটা জিনিস দেখাই স্যার। এই লেবেলটা দেখুন,” একেনবাবু স্যুটকেসে সাঁটা একটা লেবেল দেখালেন।

লেবেল এ মিস্টার প্যাটেলের নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখা।

“এখানে একটা কালির পোঁচ পড়েছে খেয়াল করেছেন? কিন্তু দেখুন স্যার, মাঝখানে খানিকটা অংশ পরিষ্কার। দেখে মনে হয় না স্যার যে, ওই জায়গাটা দড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল?”

“তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মিস্টার প্যাটেল ওর স্যুটকেস দড়ি দিয়ে বাঁধতেন এবং সেই জন্যেই দড়ির খোঁজ করছিলেন?”

“আমার তো সেরকমই সন্দেহ হচ্ছে স্যার। এত জিনিস ঢোকাতে হলে আমি কোনো লককেই ট্রাস্ট করব না, সে যে দেশেরই হোক না কেন স্যার।”

“হোল্ড অন!” প্রমথ বলল, “তাই যদি হবে তাহলে মিস্টার প্যাটেলের তো মরার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। দেশে যাবার জন্যে সত্যিই উনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন!”

“আই উইল নট বি সারপ্রাইজড স্যার।” একেনবাবু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন।

আমি আর প্রমথ চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কথার কোনো প্রয়োজন নেই। সুইসাইড নয়, ইট ইজ এ কেস অফ পিওর এন্ড সিম্পল মার্ডার!

।। ৬।।

সেই রাতে একেনবাবু প্রমথকে প্রায় জোর করে আমার অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নীচে প্রমথর ঘরে শুলেন। আমি অবশ্য সবাইকে ওপরে এসে শুতে বলেছিলাম। প্রমথ সোফায় শুতে পারত। কিন্তু একেনবাবুর মনে হল নীচে শুতে কোনো অসুবিধাই নেই। ইন

ফ্যাক্ট একবার মনে হল উনি সেটাই চাইছেন। স্ট্রেঞ্জ!

শুতে গেলাম ঠিকই, কিন্তু ঘুমটা মোটেও ভালোমতো এল না। জেগে-জেগে সারারাত খুটখাট নানা রকমের শব্দ শুনলাম। আমি ভূতফুতে বিশ্বাস করি না। তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, যে-লোকটা সকালেও জলজ্যান্ত ছিল, তার কি কোনোও অস্তিত্বই আর নেই? প্রেতাত্মার এত গল্প শুনেছি — সবই কি ভুয়ো? আসলে কাঠের বাড়িতে টেম্পারেচার চেঞ্জের জন্য সবসময়ে এ ধরনের আওয়াজ হয়। আগে খেয়াল করলেও পাত্তা দিইনি। কিন্ত কিরিট প্যাটেলের মৃত্যু আর একেনবাবুর দরজা খোলার ডেমনস্ট্রেশনের ফলে প্রত্যেকটা আওয়াজেই জেগে জেগে উঠছিলাম। প্রত্যেকটা শব্দেই মনে হচ্ছিল, হয় কোনো খুনি বাড়িতে ঢুকেছে কিংবা কিরিট প্যাটেলের অতৃপ্ত আত্মা হেঁটে বেড়াচ্ছে!

তারপর পাশের বাড়ির কুকুরটা রাত্রে বেশ কয়েকবার সুর করে কেঁউ কেঁউ করেছে। কুকুরেরা শুনেছি অনেক কিছু দেখতে পায়, শুনতে পায়, যেগুলো মানুষ পায় না। মানছি এর আগেও ব্যাটা এরকম চেঁচিয়েছে। কিন্তু তখন তো... যাক সে কথা।

ভোর রাত্র ঝিমুনি এসেছিল, অ্যালার্মে ঘুম ভাঙল। প্রমথ দরজা বন্ধ করে তখনও ঘুমোচ্ছে। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখি একেনবাবু ডাইনিং টেবিলে একটা বিশাল বোলে পাহাড় করে সিরিয়াল ঢেলে দুধ-চিনি মিশিয়ে খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, আপনারা ঘুমোচ্ছেন দেখে, ডিস্টার্ব না করেই ঢুকে পড়লাম। এই নিন স্যার, আপনার ক্রেডিট কার্ডটা। আপনি তো কাল ভুলে মেরে দিয়েছিলেন ফেরত নিতে।

আমি ক্রেডিট কার্ডটা ওয়ালেটে ঢোকালাম, একেনবাবু মুড়মুড় করে সিরিয়াল খেতে খেতে বললেন, "ঘুম থেকে উঠলেই বড্ড খিদে পেয়ে যায় স্যার।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কী করে ঘুমোতে পারলেন আপনি? মিস্টার প্যাটেল মিস্টিরিয়াসলি ডেড, পসিবলি মার্ডারড। অ্যাপার্টমেন্ট ডোর ইজ ভার্চুয়ালি ওপন!"

"দ্যাট্‌স ট্রু," একেনবাবু চিবোনোটা একটু থামালেন। "এনিওয়ে স্যার। দ্য নাইট ইজ ওভার। আপনাকে একটা মামলেট করে দেব?"

"না আমার খিদে নেই।"

"তাহলে স্যার আপনাকে একটা কফি বানিয়ে দিই। খুব বিধ্বস্ত লাগছে আপনাকে।"

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম। একেনবাবু শুনলেন না।

"আপনি রিল্যাক্স করুন স্যার। আমি কফিটা বেশ বানাতে পারি।"

"তার জন্যে নয়, কিছুই ভালো লাগছে না আজ। রাত্রেও একদম ঘুমোইনি। খালি ভাবছিলাম, কে মিস্টার প্যাটেলকে খুন করতে পারে? এভাবে খুন করে তার লাভটা কী?"

কফির জল চাপাতে চাপাতে একেনবাবু বললেন, "আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন স্যার যে, কেউ ওকে খুন করেছে। আমার তো মনে হয় আত্মহত্যাও একটা স্ট্রং পসিবিলিটি। "

"মোর স্ট্রং দ্যান মার্ডার? এর মধ্যে আবার কী ইন্ডিকেশন পেলেন যাতে মনে হয় উনি মরতে চেয়েছিলেন?"

একেনবাবু চেয়ারে বসে সিরিয়ালের বোলটা সামনে টেনে নিলেন। মুড়মুড়ানির ফাঁকে বললেন, "কাল বোধহয় আমরা একটু বায়াসড হয়ে গিয়েছিলাম। "

"তার মানে?"

"লোকে যখন সুইসাইড করে — তখন কি অত র‍্যাশেনাল হয় স্যার? আমি যখন কলেজে পড়তাম, আমার হস্টেলেরই একটা ছেলে আমার ক্লাসনোট কপি করবে বলে নিয়ে গেল। তার কয়েক ঘন্টা বাদে শুনি, সে নাকি আত্মহত্যা করবে বলে অ্যাসিড খেয়েছে। মরতে যদি চেয়েছিলি, তাহলে আমার ক্লাসনোট কেন নিলি? সে এক যাচ্ছেতাই

ব্যাপার স্যার। সেই ক্লাসনোট আমি ফেরতই পাইনি। ফলে পরীক্ষাটা...।"

"আপনার পয়েন্টটা কী?" আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম।

"ও হ্যাঁ স্যার, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম — অন্য পসিবিলিটিগুলোও ভাবুন। ফোনেও তো উনি কোনো দুঃসংবাদ পেতে পারেন? ধরুন, উনি জানতে পেরেছেন ওঁর ক্যান্সার হয়েছে — একেবারে ফাইনাল স্টেজ, বা জুয়ো খেলায় উনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, আরও কত কী? এইসব জেনে উনি আর বাঁচতে চাননি। এভরিথিং ইজ পসিবল স্যার, ঠিক কি না?"

"তা বটে," আমি স্বীকার করলাম। বলতে কী, একেনবাবুর ব্যাপার-স্যাপার দেখেআমি বাস্তবিকই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! ক্রাইসিস অনেক সময় লোকের মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন আনে। ওঁর বাজে বকা যে একদম কমেছে, তা বলতে পারব না, কিন্তু দু'একটা ইনসাইটফুল কথা বলে বেশ তাজ্জব করে দিচ্ছেন!

সকালে আমাকে একটু স্কুলে যেতে হল। দুপুরে যখন বাড়ি ফিরলাম প্রমথ তখন লাঞ্চ বানাচ্ছে। আমাকে দেখে হড়বড় করে খবর দিল, একেনবাবু নাকি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ফোন করে জেনেছেন নিজের ছোঁড়া গুলিতেই মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যু হয়েছে। রিভলভারের ট্রিগারে যে ছাপ পাওয়া গেছে, সেটা ওর বাঁ হাতের ইনডেক্স ফিঙ্গারের সঙ্গে একদম মিলে গেছে। তার চেয়েও বড় কথা বাঁ হাতে বারুদের গুঁড়ো পাওয়া গেছে, যেটা নাকি একমাত্র সম্ভব কেউ যদি নিজের হাতে গুলি ছোঁড়ে। সুতরাং কনক্লুশন হচ্ছে আমরা প্রথমে যেটা ভেবেছি তাই, সুইসাইড।

এরকমভাবে পুলিশকে ফোন করা একমাত্র একেনবাবুর পক্ষেই সম্ভব। অবভিয়াসলি ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। তদন্তের কাজ শেষ। তাই উত্তরটা একেনবাবু পেয়েছেন, নইলে কপালে ধমক জুটত।

একেনবাবু প্রমথর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি যোগ করলেন, "লাকিলি স্যার, বিশেষ কষ্ট পাননি।"

প্রমথ সায় দিল। গুলিটা নাকি আড়াআড়ি ভাবে ঢুকে এদিক থেকে ওদিক চলে গেছে। ম্যাসিভ ব্রেন ড্যামেজ এন্ড অলমোস্ট ইনস্ট্যান্ট ডেথ।

লাঞ্চ খেতে খেতে মিস্টার প্যাটেলের কথাই বারবার আলোচনার মধ্যে এসে পড়ল। সবাই খুব ডিপ্রেসড বোধ করছিলাম। প্রমথ তো খাবার পর শুতেই চলে গেল, রাত্রে নাকি ওর একদম ঘুম হয়নি! আমি সোফায় বসে ঝিমোচ্ছি, একেনবাবু বললেন, "চলুন স্যার, কোথাও ঘুরে আসি। বাড়ি থেকে বেরোলে আপনার মনটা অন্তত একটু চাঙ্গা হবে।"

বেরোতে যে খুব ইচ্ছে করছিল তা নয়, আবার বাড়িতে থাকতেও ভালো লাগছিল না। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাবেন?

"চলুন না স্যার আপনার সেই অ্যাস্ট্রলজার বন্ধুর কাছে।"

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। প্রায় এক বছর কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু একেনবাবুর ভীষণ ইচ্ছে যে, একবার যান। ওঁর এতটা উৎসাহ দেখে শেষ পর্যন্ত শৈলেন সাঁপুইকে ফোন করলাম। শৈলেন সাঁপুই আমার ফোন পেয়ে খুব খুশি। বললেন, "আরে সে কি কথা, আপনার পরিচিত — নিশ্চয় তার গণনা করে দেব।"

একেনবাবু দেখি ভীষণ হাত- পা নেড়ে ফিসফিস করছেন, "চার্জ, চার্জটা জিজ্ঞেস করুন স্যার।"

"ও হ্যাঁ, আপনার ফি-টা কীরকম?"

"দুশো ডলার। কিন্ত আপনার বন্ধুর জন্য কিচ্ছু লাগবে না। দরকারের সময় আপনি

আমার জন্য অনেক করেছেন। আই মাস্ট পে ব্যাক। ”

“ওসব কি বলছেন। যাক সে কথা, আপনার কখন সুবিধা?”

“আজই আসুন না। সাতটা নাগাদ আমার অফিসে। প্রমথবাবুকেও নিয়ে আসবেন।”

আমি ডিরেকশনটা নিয়ে নিলাম।

প্রমথ ঘুম থেকে উঠলে ওকে প্ল্যানটা বললাম। ও বলল, “কোনো মানে হয়! ভদ্রলোকের সঙ্গে গতকাল কথা হল, আমায় বারবার আসতে বললেন। এদিকে আজকে বিকেলেই আমার একটা সেমিনার।”

“তোর সঙ্গে কথা হল!” আমি একটু অবাকই বললাম।

“হ্যাঁ, অবিনাশের খোঁজ করতে করতে আমায় ফোন করেছিলেন। আমাকে তো চিনিস, বললাম, অবিনাশ নেই, তবে ওর মামাকে পাবেন, চলে আসুন। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, ‘না, না, আমার অবিনাশকে দরকার’। তখন বললাম, অবিনাশের আসতে এখনও কয়েকদিন দেরি আছে। ”

আমি বললাম, “অবিনাশ শুনলে রাগ করবে কিন্তু — এর আগের বার কী করেছিলি মনে আছে?”

“কী স্যার?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“অবিনাশের গার্লফ্রেন্ড ফোন করেছিল,” প্রমথ বলল, “ওকে তো এখন পাওয়া যাবে না, একটা মেয়ের সাথে ক’দিন হল দিনরাত ঘুরছে’। গার্লফ্রেন্ড তো রেগে কাঁই। অবিনাশকে অনেক তেল খড় পোড়াতে হয়েছিল পরে তাকে ম্যানেজ করতে।”

“আমি তো মিথ্যে কথা বলিনি।”

“তা বলিসনি। কিন্তু তোর সেই মেয়েটি যে অবিনাশের মা — সেটাও তো বলিসনি।”

“মাইনর পয়েন্ট।”

একেনবাবু প্রমথকে বললেন, “আপনি না স্যার, সত্যি!”

“ভদ্রলোক অ্যাস্ট্রলজিটা জানেন। বাপি মানুক না মানুক — ওঁর কথা ফলে। দিনরাত রিসার্চ নিয়ে কলেজে কাটাচ্ছি শুনে অভয় দিলেন, আমার প্ল্যানেট পজিশন এত ভালো, সাকসেস হবেই — অকারণ দুশ্চিন্তা না করতে, যাক গে, তোদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভালো লাগত।”

।। ৭।।

শৈলেন সাঁপুই অবশ্য ম্যানহাটানে থাকেন না, থাকেন কুইন্সে। সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। কিন্ত পথে একেনবাবুর কফি তেষ্টা পাওয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সাতটাই বাজল!

গ্লোব স্ট্রিটের ওপরে দোতলা একটা বাড়ি। সদর দরজাটা খোলাই ছিল।

ঢুকতেই একটা ছোটো ওয়েটিং রুম। ঘরটা ফাঁকা, রিসেপশনিস্ট ছাড়া আর একজনই শুধু বসে আছে। সেই লোকটির কাজ মিনিট দশেকের মধ্যে হয়ে যেতেই আমাদের ডাক পড়ল।

অফিসটা সত্যিই দেখার মতো। মেহগনি কাঠের বিশাল একটা টেবিল, আর তার পাশে সাজানো মখমলের কুশন দেওয়া অ্যান্টিক চেয়ার। হার্ড উডের মেঝেয় একটা ইন্ডিয়ান কার্পেট পাতা। টেবিলের পেছনে কয়েকটা কাচের আলমারিতে নানান ধরনের কিউরিও সাজানো। ঘরের দুই কোণে কর্নার টেবিলে দুটো টিফানি শেডের ল্যাম্প। কিন্তু প্যানেলের গাঢ় রঙের জন্য ঘরটা তাতে খুব আলোকিত হয়নি।

শৈলেন সাঁপুই দেখলাম একটু মোটা হয়েছেন। মুখচোখেও বেশ একটা উজ্জ্বলতা ফুটে বেরোচ্ছে। আবছা আলোয় গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা আর বিবেকানন্দ স্টাইলের পাগড়িতে ভদ্রলোককে বেশ অলৌকিক-অলৌকিক লাগছে।

আমরা বসতেই শৈলেন সাঁপুই জিজ্ঞেস করলেন, "কফি চলবে তো?"

"আজ না, এক্ষুণি খেয়ে এলাম।" কথাটা বলে আমি একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। "এঁর কথাই ফোনে আমি বলেছিলাম। আপনার কাছে ভাগ্য গণনা করাতে চান।"

শৈলেন সাঁপুই মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললেন, "বেশ বেশ, গণনা নিশ্চয় হবে। পেছনে আমার একটা প্রাইভেট অফিস আছে, সেখানে যাব। ব্যক্তিগত প্রশ্ন-টশ্ন যদি থাকে ..."

আমি বললাম, "তার কী দরকার, আমিই না হয় বাইরে যাচ্ছি।"

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, একেনবাবুই বাধা দিলেন। "না স্যার, না। "

তারপর শৈলেন সাঁপুইকে বললেন "আসলে আপনার কথা প্রমথবাবু খুব বলছিলেন। আমি তাতে একটু পাজলড হয়ে গেলাম স্যার। দেশে অবশ্য ফরচুন নিয়ে অনেকেই ..., কিন্তু তা বলে আমেরিকাতে, মানে আমি বলতে চাচ্ছি অ্যাস্ট্রলজি ব্যাপারটাকে আমি খুব সায়েন্টিফিক ভাবতাম না। কিন্তু এখানেও যখন এত ইন্টারেস্ট... সেইজন্যই বাপিবাবুকে...।"

"টাইম — আনকলড লাইফের কথা শুনেছেন?" শৈলেন সাঁপুই বক্কেশ্বরকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"না স্যার।"

কিন্তু ব্যাপারটা কী জানার আগেই সেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ঢুকে বলল, "রিপেয়ার শপ থেকে জ্যাক ফোন করেছে। বলছে এক হাজার ডলার লাগবে।"

"সামান্য একটা বাম্পার সারাতে!" শৈলেন সাঁপুই অবাক হলেন।

"তাই তো চাইছে, বলল, অনেক সময় তিন-চার হাজারও লেগে যায় এটা নাকি কম। ইন্সিওরেন্সকে ফোন করব?"

শৈলেন সাঁপুই একটু চিন্তা করে বললেন "না থাক, দেবে তো পাঁচশো ডলার আর সময় লাগাবে দু' সপ্তাহ। তারপর প্রিমিয়াম বাড়াবে। আমরাই দেব, ঠিক করে দিতে বল। রিসেপশনিস্ট চলে যাবার পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই হরিণগুলোর জ্বালায় রাস্তায় গাড়ি চালানোর উপায় আছে। হঠাৎ করে সামনে এসে মারে। সেদিন ধাক্কা লেগে বাম্পারটা গেল!"

ইস্ট কোস্টের নানা জায়গায় হরিণ একটা সমস্যা ঠিকই। আমিই নিউ জার্সিতে একটা হরিণকে প্রায় ধাক্কা মারছিলাম। তবে বাম্পার সারাতে এত টাকা লেগে যায় ভাবিনি।

"যাক ওসব কথা। হ্যাঁ, কী জানি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, সাধারণ মানুষরা টাইম লকড জীবনযাপন করে। অর্থাৎ তারা সময়ের সঙ্গে বাঁধা। এই বন্ধন থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার –যখন যেখানে খুশি চলে যাওয়া সম্ভব। তার জন্যে দরকার ব্রেন ওয়েভকে সুপার লাইট স্পিডে মুভ করানো। সে যুগে আমাদের যোগীরা

সেটা পারতেন। এযুগে আর সে সাধনা ক'জন করেছে?"

একেনবাবুর মুখ দেখে মনে হল উনি সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করেছেন।

"দাঁড়ান স্যার, আপনি কি ... মাই গড!"

"প্রমাণ চান?" শৈলেন সাঁপুই স্মিত মুখে জানতে চাইলেন।

"না, না স্যার, কী যে বলেন!" একেনবাবু লজ্জা পেলেন।

"না প্রমাণ ছাড়া কিচ্ছু অ্যাকসেপ্ট করবেন না," শৈলেন সাঁপুই মাথা নাড়লেন। "আমি তো একটা ফোর টোয়েন্টিও হতে পারি, পারি না?"

"ছি ছি স্যার আর লজ্জা দেবেন না।"

"এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভাবুন।" শৈলেন সাঁপুই প্রায় আদেশের সুরেই বললেন।

"কেন স্যার?"

"আঃ, ভাবুন না!"

"ভেবেছি স্যার।"

"কী সেটা?"

"চার।"

"আচ্ছা, এবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান, আর বসার কুশনটা তুলে ফেলুন।"

একেনবাবু দেখলাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হুকুম মত কুশনটা উঠিয়ে ফেললেন।

"একটা কাগজ রয়েছে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ওটা তুলুন আর পড়ে দেখুন ওতে কী লেখা আছে?"

"আন বিলিভেবল, ট্রুলি, ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার!" মাথা চুলকোতে চুলকোতে একেনবাবু আমার দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

দেখলাম পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখা 'চার', সঙ্গে সঙ্গে আমার মিস্টার ইন্দ্রজালের কথা মনে পড়ল।

"এটা কিন্তু ম্যাজিক নয়। এখানে বসে নম্বরটা লিখে এক মুহূর্তে অত দূরে কাগজ পাচার করা কোনো ম্যাজিশিয়নের কম্ম নয়।" শৈলেন সাঁপুই যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বললেন।

মাই গড, লোকটা কি সত্যিই অন্তর্যামী! একেনবাবু দেখি তখনও মাথা চুলকে চলেছেন।

শৈলেন সাঁপুই একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে বললেন "এ সিম্পল প্রসেস অফ ক্রসিং দ্য স্পিড অফ লাইট। আপনার কাছে যা ফিউচার, আমার কাছে তা পাস্ট।"

একেনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "তার মানে স্যার, আপনি আগে থেকেই জানতেন, আমি কী ভাবব, কোথায় বসব...।"

শৈলেন সাঁপুই কথাটার কোনো উত্তর দিলেন না। ঘড়ির দিকে চট করে একবার তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন "এবার বলুন, ঠিক কী জানতে আপনি এসেছেন?"

"যা কিছু দু'-একটা ফিউচার বলে দিন স্যার। বিশেষ করে যে কাজের জন্য এসেছি, সেটা হবে কিনা। "

শৈলেন সাঁপুই কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজলেন।

"হ্যাঁ হবে। তবে বাধা আসবে প্রচুর। এবছরটা আপনার একটু অশান্তিতে কাটবে,

তারপর বছর পনেরো অতি শুভ সময়। পনেরোর মাথায় একটা ফাঁড়া আছে,

কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠবেন। আয়ু বিরাশি বছর। আমৃত্যু স্বাস্থ্য ভালো থাকবে — ওই ফাঁড়ার সময়টুকু ছাড়া। টাকা পয়সা প্রচুর রোজগার করবেন, তবে ধরে রাখতে পারবেন না। একটা পলা আমি আপনাকে ধারণ করতে বলব। ওটা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভালো, বিশেষ করে এই সময়টাতে।"

"পলা! পলা কোথায় পাব স্যার?"

"যাওয়ার আগে রিসেপশনিস্টকে বলে যাবেন। ও আনিয়ে রেখে দেবে।"

"জ্যাকসন হাইটস-এর ইন্ডিয়ান জুয়েলারির দোকানগুলোতে পাওয়া যাবে কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পাবেন, তবে সব জায়গায় খাঁটি জিনিস পাবেন না। একটা দোকান অবশ্য সাজেস্ট করতে পারি।"

"বলুন স্যার," একেনবাবু পকেট থেকে তড়িঘড়ি একটা ডায়েরি বের করে বললেন, "একটা পেন...।"

শৈলেন সাঁপুই নিজের পেনটা দিয়ে বললেন, "চন্দন জুয়েলার্স, জ্যাকসন হাইটসেই সেভেন্টিয়েথ স্ট্রিটের ওপর।"

"ঠিকানা?"

আমি বললাম, "ওটুকু জানলেই হবে। ইন্ডিয়ান দোকানগুলো সব পাশাপাশি।"

"এগজাক্টলি, তাড়াতাড়ি যান। দোকান হয়তো এখনও খোলা পেয়ে যাবেন। আমার নাম বলবেন, তাহলে সুপার কোয়ালিটির ভালো জিনিস দেবে।" বলে শৈলেন সাঁপুই উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বুঝতে পারলাম শৈলেন সাঁপুই আমাদের আর সময় দিতে চান না, আফটার অল নন পেয়িং কাস্টমার।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললাম, "অবিনাশকে মনে আছে আপনার?"

"বাঃ, মনে থাকবে না!"

"ও ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গেছে। কিন্তু ওর মামা হঠাৎ সুইসাইড করেছেন। আর করেছেন আবার প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে বেড়াতে এসে।"

"সে কী!" শৈলেন সাঁপুই খুব অবাক হলেন।

"খুব আননার্ভিং এক্সপিরিয়েন্স। প্রমথ তো ভীষণ আপসেট।"

"সে তো বুঝতেই পারছি, কবে ঘটল ব্যাপারটা — কালকেই তো প্রমথবাবুর সঙ্গে আমার কথা হল!"

"গতকালই সন্ধ্যেতে।"

শৈলেন সাঁপুই দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়লেন। "অবিনাশকে আমার কন্ডোলেন্স জানাবেন।"

"ফিরে এলে জানাব।"

বেরোবার পথে একেনবাবু রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলেন, একটা পলা অর্ডার করলে কালকে সেটা আনিয়ে দিতে পারবে কি না।

"কাল হবে না, শুক্রবার আমাদের অফিস বন্ধ থাকে। হাউ অ্যাবাউট স্যাটারডে?"

"না, থাক।"

গাড়িতে উঠে একেনবাবুকে বললাম, "জ্যাকসন হাইটস এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু দোকান এখনও খোলা থাকবে কিনা জানি না। চেষ্টা করে দেখব নাকি?"

“আপ টু ইউ স্যার? আপনার অসুবিধা না হলেই হল।”

“নো প্রবলেম,” বলে আমি কুইন্স বুলেভার্ডে টার্ন দিলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একেনবাবু বললেন, “মিস্টার সাঁপুইয়ের অফিসটা খুব ইম্প্রেসিভ।”

প্রশ্ন নয়, স্টেটমেন্ট। তাই জবাব দিলাম না।

“ওর ঘরের কার্পেটটা খেয়াল করেছিলেন স্যার। কাশ্মীরের তৈরি, দারুণ ইনট্রিকেট ডিজাইন। আমাদের দেশেই ওর দাম কম-সে-কম এক লাখ টাকা। এখানকার হিসেব অবশ্য জানি না।”

কার্পেটের দাম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, তাই চুপ করে রইলাম।

“পিতলের বুদ্ধমুর্তি হয় টিবেট অথবা নেপাল থেকে আনা। ওর দামও ধরুন হাজার দশেক হবে।”

“আপনি বসে বসে এত সব লক্ষ্য করেছেন!”

“কী করব স্যার। আমার চোখ চলে যায়।”

“আচ্ছা বলুন তো ওর হাতঘড়িটা কী ছিল?” ওই একটা জিনিসই আমি লক্ষ্য করেছিলাম হাত বাড়িয়ে যখন একেনবাবুকে পেন দিচ্ছিলেন। নিতান্ত ক'দিন আগে মেসিজে দামি ঘড়ির মধ্যে রোলেক্স এর ওই ব্র্যান্ডটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম বলেই মনে ছিল।

“আপনি এবার আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন স্যার?” একেনবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন।

“আহা, বলুনই না।”

“মনে হল স্যার রোলেক্স। সেদিনই তো ওই ব্র্যান্ডটা দেখলাম মেসিজে।”

“মাই গুডনেস, আপনি তো পেনটা নিতেই ব্যস্ত ছিলেন, তাও চোখে পড়েছে! আমি সত্যিই অবাক হলাম। আর কী কী দেখলেন, বলুন?”

“এবার আপনি স্যার ঠাট্টা করছেন।”

জ্যাকসন হাইটসে পৌঁছে দেখি জুয়েলারি স্টোরগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরব বলে গাড়ি ঘোরাচ্ছি, একেনবাবু বললেন, “আচ্ছা স্যার, মিস্টার প্যাটেল তো এদিকেই কোথাও থাকতেন, তাই না?”

“আপনি কী করে জানলেন?”

“প্রমথবাবু কাল বলছিলেন সেভেন্টিফিফথ স্ট্রিটে ওঁর অ্যাপার্টমেন্ট, তাই মনে হল।”

“ইউ আর রাইট। আর তিনটে স্ট্রিট পরেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে, সেখানে থাকতেন।”

“একবার ওখানে থামবেন?”

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কেন বলুন তো?”

“আমার মাথায় খটকা লেগেছে — সেটা ক্লিয়ার করে নিতাম।”

“কী খটকা?”

“চলুন না স্যার?”

আরও নিশ্চয় একেনবাবুকে খোঁচাতে পারতাম, কিন্তু খোঁচালাম না। মিস্টার প্যাটেলের বাড়িতে আমি আগে দু'-একবার গেছি। দূরে নয়, কয়েক মিনিটের পথ। আমার অবশ্য জানতে ইচ্ছে করছিল একেনবাবুর খটকাটা ঠিক কী? আর কেনই বা একেনবাবু সেটা সাসপেন্সে রাখতে চান! তবে জিনিসটা এতই মামুলি হবার সম্ভবনা, খুব উৎকণ্ঠিত বোধ করলাম না!

।। ৮।।

মিস্টার প্যাটেলের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটা বিশাল। সামনের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করতে করতে বললাম, "এবার বলুন তো আপনার খটকাটা ঠিক কী?"

একেনবাবু আমার প্রশ্ন শুনলেন কিনা কে জানে! দেখলাম মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ আমার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন,

"স্যার তাড়াতাড়ি নামুন, নইলে চান্স মিস করব।"

আমি আচমকা টান খেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী চান্স?"

একেনবাবু গলা নামিয়ে, "দেখছেন না স্যার, লোকটা এগোচ্ছে! আর দেরি নয় স্যার, চট করে নেমে পড়ুন স্যার, প্লিজ।"

কার কথা বলছেন উনি! আমি তো কোথাও কোনো সন্দেহজনক ক্যারেক্টার খুঁজে পেলাম না। থাকার মধ্যে শুধু একটা বেঁটে খাটো আমেরিকান সাহেব বাজারের ব্যাগ হাতে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দিকে যাচ্ছেন। এই ঠান্ডায় আমার একদম নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একেনবাবু এমন ছটফট করতে লাগলেন যে শেষে খানিকটা উত্যক্ত হয়ে নেমে পড়লাম। একেনবাবু আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে সাহেবের পিছু নিলেন।

সাহেব চাবি দিয়ে বিল্ডিংয়ের দরজাটা খুলতেই একেনবাবু টুক করে ঢুকে পড়লেন। তারপর এলিভেটর ধরে সোজা তিনতলা। আমি যে কেন ওঁর পেছন পেছন গেলাম নিজেই জানি না। এতক্ষণ সাহেব সামনে ছিল বলে একটা কথাও বলিনি। এলিভেটর থেকে বেরিয়েই আমি ধমকের সুরে বললাম, "আচ্ছা, আপনার মাথায় কী ঘুরছে বলুন তো?"

"এক্ষুণি ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার।" উনি হাঁটতে হাটতে বললেন, "আমাদের যেতে হবে তিনশো চার নম্বরে। তিনশো ... তিনশো দুই... এই তো তিনশো চার। দেখুন স্যার মিস্টার প্যাটেলের নামও লেখা আছে।"

আমি কেমন একটু কনফিউসড হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী করে জানলেন মিস্টার প্যাটেল কোন অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন?"

"বাঃ স্যার, আপনার মনে নেই — ওঁর ঠিকানা তো ওঁর স্যুটকেস দুটোর ওপরেই লেখা ছিল!"

"তা না হয় ছিল, কিন্তু কী করতে চান আপনি?"

"আমি একটু ঢুকবো স্যার।"

"ঢুকবেন মানে!" আমি ভীষণ ভয় পেয়ে বললাম, "সেটা তো ব্রেকিং অ্যান্ড এন্টারিং, ধরা পড়লে এদেশে কত বছরের জেল হবে জানেন?"

"স্যার, আমি যাব আর আসব। একদম ঘাবড়াবেন না। ভয় করলে আপনি বরং দাঁড়িয়ে থাকুন, নয় গাড়িতে গিয়ে বসুন।"

ভয় আমি পাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু একা হলওয়েতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা, বা নীচে গাড়িতে আধা-অন্ধকারে বসে থাকা, কোনোটাই খুব প্রীতিপ্রদ মনে হল না। একেনবাবু ইতিমধ্যেই পকেট থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার মত জিনিস বার করে চাবির মত সেটা দরজার লকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুট করে দরজাটা খুলে গেল। আমি দ্রুত গতিতে মনে মনে হিসাব করলাম — এ ধরনের বিল্ডিং-এ পেছনের জানলায় সব সময়ে একটা ফায়ার এস্কেপ থাকে। কেউ হঠাৎ এসে পড়লে সেখান দিয়ে

পালানো যেতে পারে। আমি শুধু চাপা গলায় বললাম, "হয় আপনি জানেন কী করছেন, নয় মশাই আপনি পুরোপুরি বেপরোয়া ক্রেজি! ধরা পড়লে দশ বছরের জেল --- খেয়াল আছে? এখনও সময় আছে, চলুন, কেটে পড়া যাক।"

একেনবাবু আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, "চুপ স্যার, আর কথা নয়। জাস্ট কয়েক মিনিট, তার বেশি লাগবে না। আর সাবধান, কোনো কিছু টাচ করবেন না। আপনি তো আবার গ্লাভস পরেন না।"

ঠিকই, প্রচণ্ড ঠান্ডা না হলে পড়ি না। একেনবাবু শীত কাতুরে, ঠান্ডায় বেরোলে সব সময়েই গ্লাভস পরে ফেলেন।

অ্যাপার্টমেন্টটা খুব ইমপ্রেসিভ। ওয়াল টু ওয়াল কারিস্তান কার্পেট, মার্বেল ফ্লোরের বাথরুম আর কিচেন, দামি কাউন্টার টপ, ফ্যান্সি কিচেন ক্যাবিনেট। এমনকী দরজা জানলাগুলোর ফিনিশও তাকিয়ে দেখার মতো! ঘরের আসবাবগুলো কিন্তু এই চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের সাথে খাপ খায় না। বাইরের ঘরে পুরোনো সস্তা একটা সোফাসেট আর ভাঙা কফি টেবিল — ব্যস! ভিসিটার্স ক্লজেটে কয়েকটা কোট আর ওভারকোট ঝোলানো। একেনবাবু সেগুলোর পকেট হাতড়ে বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুমে সিঙ্কের ওপর রাখা একটা টুথব্রাশ, সঙ্গে যে টুথপেস্টের টিউব, তাতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। মেডসিন ক্যাবিনেটে অ্যাসপিরিন, টাইলানল আর ওই জাতীয় কিছু ওষুধের বোতল।

বাথরুমের পাশে কিচেন। সেখানে ঢুকে একেনবাবু রেফ্রিজারেটর খুললেন।

দুধ, মাখন, অরেঞ্জ জুস, চীজ সব কিছুই চোখে পড়ল। এ ছাড়া প্লাস্টিকের কৌটোয় খাবার তৈরি করে রাখা। ভেজিটেবল ট্রেটাও ফাঁকা নয়, কিছু তরকারি পড়ে আছে। মিস্টার প্যাটেলের বেডরুমটা আমার বেডরুমের প্রায় দ্বিগুণ। বেডরুমের ফার্নিচার বলতে একটা ডাবল বেড, চেস্ট অফ ড্রয়ার্স আর নাইট টেবিল। একটা বড় আয়না দেওয়ালে আটকানো। নাইট টেবিলের ওপর একটা ফটো ফ্রেমে মিস্টার প্যাটেলের একটা ছবি, বৃদ্ধা এক মহিলার সাথে। বোধ হয় ওঁর মা। মাস্টার বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমটা মনে হল তেমন ব্যবহার হত না। দ্বিতীয় বেডরুমে কোন বেড নেই। বোঝাই যায় ওটা ছিল ওঁর অফিস। কাঠের ছোটো টেবিল, তার উপর কয়েকটা থ্রি-রিং বাইন্ডার সাজানো। একটা ট্রেতে 'জেমস ইন্ডিয়া' ছাপা চিঠির কাগজ। ডেস্ক ড্রয়ারে শ্রীমদভগবৎ গীতার ইংরেজি ট্রান্সলেশন আর কিছু অফিস স্টেশনারি।

আমি অধৈর্য হয়ে একেনবাবুর হাত ধরে টান দিয়ে চাপা স্বরে বললাম, "এবার চলুন।"

একেনবাবুর কৌতূহল বোধহয় ফুরিয়েছে। আমার সঙ্গে দরজার দিকে এগোলেন। হঠাৎ কী খেয়াল হল। দাঁড়িয়ে থেমে ক্লজেটের দরজাটা খুললেন। ক্লজেটের ওপরটা ফাঁকা, শুধু নিচে একটা লম্বা কার্ডবোর্ডের বাক্স খবরের কাগজে ভর্তি। কয়েকটা খবরের কাগজ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল অনেকগুলো বাঁধানো খাতা। প্রত্যেকটার ওপর তারিখ লেখা। সবচেয়ে পুরোনোটা হল ১৯৮১ সালের। একেনবাবু ১৮৮৯-৯০ লেখা খাতাটা তুলে পাতা ওলটালেন। খাতাগুলো মনে হল একাধারে ডায়েরি, ক্যালেন্ডার, অ্যাড্রেস বুক, সব কিছুই। সেটা বগলে নিয়ে বললেন, "চলুন স্যার, যাওয়া যাক।"

নীচে নেমে একেনবাবু মিস্টার প্যাটেলের মেলবক্সের ফুটো দিয়ে ভেতরে তাকালেন। তারপর আবার সেই স্ক্রু ড্রাইভার টাইপের জিনিসটা বার করেছেন দেখে, আমি একেনবাবুকে সাবধান করলাম, "মশাই, অন্যের মেলবক্সে হাত দেওয়া কিন্তু এদেশে ফেডারেল অফেন্স — অনেক বছরের জেল।"

একেনবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে টুক করে বাক্সটা খুলে ফেললেন। উনি যখন চিঠিগুলোতে চোখ বুলোচ্ছেন, একজন পার্কিং লট থেকে বিল্ডিংয়ের দিকে আসছে।

"হারি আপ। কেউ আসছে," বলেই আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে। এই প্রথম খেয়াল করলাম বুকটা কী ভীষণ ধুকপুক করছে!

একেনবাবু এলেন একটু বাদেই। দ্রুত গতিতে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গাড়িটা নামিয়ে এনে আমি একেনবাবুকে একচোট ঝাড়লাম।

"আপনি কী শুরু করেছেন বলুন তো! শখের গোয়েন্দাগিরি করে কি জেলে যেতে চান?"

"ধরা তো পড়িনি স্যার," একেনবাবু একটা মোক্ষম আর্গুমেন্ট দেবার চেষ্টা করলেন।

"এটা কোনো যুক্তি হল! আপনার জন্যে আজ আমরা ফেডারেল, স্টেট, কাউন্টি, সিটি — সবকটা পেনাল কোডই বোধহয় ভায়লেট করেছি। হোয়াট আই স্টিল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইজ ফর হোয়াট?"

"আপনি খুব রেগেছেন স্যার।"

"আলবাত রেগেছি। ইন্ডিয়াতে যেসব চলে, এখানে সেগুলো চলে না। পুলিশ একবার ধরলে, ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে কোনও কাজ হয়না। ইউ শুড আনডারস্ট্যান্ড দ্যাট।"

একেনবাবু বকুনি খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

এরকম ভাবে সাধারণত আমি কথা বলি না। নিজেরই খারাপ লাগল। বললাম, "আমার বিরক্তি লাগছে কেন জানেন — এই যে অনর্থক রিস্কটা নিলেন, কী হাতিঘোড়া দেখলেন ওখানে?"

"খুব কনফিউসিং স্যার।"

"কনফিউসিং?"

"হ্যাঁ স্যার। মিস্টার প্যাটেল প্রমথবাবুর কাছে আসার অন্তত দিন চারেক আগে বাড়ি ছেড়েছেন; সেটাই খুব কনফিউসিং।"

"আপনি সেটা বুঝলেন কী করে?"

"ফার্স্ট ক্লু স্যার, রেফ্রিজারেটর থেকে। ভেবে দেখুন, রেফ্রিজারেটরে যে পরিমাণ দুধ, কাঁচা সবজি আর খাবার দেখলাম, তা কখনোই দু'দিনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। অথচ মিস্টার প্যাটেলের আজকেই ইন্ডিয়া রওনা দেবার কথা ছিল।

যিনি এত কৃপণ, মানে বাড়ির জিনিসপত্রগুলো দেখে বলছি, তিনি হঠাৎ এত খাবার নষ্ট করে চলে যাবেন। চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না — তাই না স্যার?"

"দ্যাট্স ট্রু, উনি হয়তো খাবারগুলো কাউকে দিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিলেন।"

"আমারও সেটা একবার মনে হয়েছিল স্যার, সেইজন্যেই মেলবক্সটা খুললাম।

বাক্সে নিউ ইয়র্ক থেকে পোস্ট করা দুটো চিঠি ছিল, দুটোতেই ডেট স্ট্যাম্প ছিল ১৪ ফে ব্রুয়ারির, আজ ২০ তারিখ তাই না?"

নাঃ একেনবাবুর এলেম আছে মানতে হবে। তবু বললাম, "হয়তো আর কাউকে বলে গিয়েছিলেন, খাবারগুলো নিয়ে যেতে। চিঠিও হয়তো সেই নিয়ে যেত।"

"হতে সব কিছুই পারে। তবে খটকাটা লাগছে এইজন্য স্যার, উনি প্রমথবাবুকে বলেছিলেন, হিটিং কাজ করছিল না বলে উনি প্রমথবাবুর কাছে চলে এসেছেন। কিন্তু উনি বাড়ি ছেড়েছিলেন বেশ কয়েকদিন আগে। মিথ্যে বললেন কেন স্যার?"

এর উত্তর আমার জানা নেই।

"আরও একটা ব্যাপার কনফিউসিং স্যার।"

"কী বলুন তো?"
"এরকম একটা কঞ্জুস লোক, এত দামি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলেন কেন?"
মনে মনে ভাবলাম, রতনে রতন চেনে! যাই হোক এর উত্তরটা আমার জানা ছিল। বললাম, "এটা ভাড়া বাড়ি নয়, এগুলো সব কন্ডোমোনিয়াম, অর্থাৎ কেনা অ্যাপার্টমেন্ট। নিউ ইয়র্কে বাড়ির দাম যে হারে বাড়ছে বাড়ি কেনা একটা চমৎকার ইনভেস্টমেন্ট।"
"তাই বলুন স্যার। ভারি খটকা লাগছিল।"

।। ৯।।

আমরা বাড়ি পৌঁছলাম প্রায় ন'টা নাগাদ। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখি টেলিফোন আনসারিং মেশিনের মেসেজ লাইটটা জ্বলছে আর নিভছে, অর্থাৎ কেউ ফোন করে মেসেজ রেখেছে। মেসেজের বোতামটা টিপতেই প্রমথর গলা রেকর্ডিংয়ে শুনলাম 'সোয়া ন'টায় ফিরব। রান্না করিস না, একসঙ্গে পিৎজা খেতে যাব।"
একেনবাবুকে মেসেজটা দিয়ে আমি নোংরা জামাকাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে চাপাতে নীচে বেসমেন্টে গেলাম। ফিরে এসে দেখি একেনবাবু নিবিষ্ট মনে একটা চিঠি পড়ছেন। আমাকে দেখে চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"
টাইপ রাইটারে ছাপা সংক্ষিপ্ত চিঠি, নামধাম সম্বোধন কিছুরই বালাই নেই।

Mary owns one nice stone...
Sounds music to my ear!
I must have it, ... else Mary dies.

এ আবার কী ধরনের হেঁয়ালি?
"কোথায় পেলেন এটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"মিস্টার প্যাটেলের মেলবক্সে ছিল স্যার। খামটার উপর শুধু অ্যাপার্টমেন্ট নম্বরটা দেখে কিউরিয়াস হয়ে নিয়ে এসেছিলাম।"
"আমি তো এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। হু ইজ মেরি?"
"আমিও প্রথমে তাই চিন্তা করছিলাম স্যার। এখন মনে হচ্ছে মেরির কোন অস্তিত্বই নেই। মেরি সম্ভবত মিস্টার প্যাটেল।"
"সেটা কী করে বুঝলেন?"
"মেরির কাছে একটা পাথর আছে, চিঠিটা যে লিখেছে তাকে ওই পাথরটা পেতেই হবে। যদি না পায়, তাহলে মেরির মৃত্যু হবে। আর চিঠিটা ছিল মিস্টার প্যাটেলের মেলবক্সে। সুতরাং..."
"ও মাই গড! মিস্টার প্যাটেল যখন ডায়মন্ড মার্চেন্ট ছিলেন, স্টোন মানে নিশ্চয়ই একটা হিরে।"
"তাই তো মনে হয় স্যার। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন হিরের কথা চিঠিতে বলা হচ্ছে? আরো

একটা ক্লু মনে হয় এখানে আছে?”

“কী সেটা?”

“প্রথম লাইনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের লেটারগুলো পড়ুন স্যার।”

“এম ও ও এন... মুন। তার মানে মুনস্টোন?”

“একস্যাক্টলি স্যার। মিস্টার প্যাটেলের কাছে নিশ্চয় দামি কোনো মুনস্টোন ছিল, আর সেটারই কারও খুব দরকার হয়ে পড়েছিল।”

চিঠিটার আসল মানে যাই হোক না কেন, মানতে হবে একেনবাবুর কল্পনা করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু একেনবাবুর অ্যানালিসিস যদি ঠিক হয়, তাহলে আই মাস্ট হ্যাভ ইট... এলস মেরি ডাইজ, সর্বনাশ! তার মানে তো মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর সাথে এই চিঠির একটা যোগও থাকতে পারে! কিন্তু তা কী করে হয়? না সেটা অসম্ভব — মিস্টার প্যাটেল তো করেছেন আত্মহত্যা! তবু কেন জানি আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

“আপনার কি মনে হচ্ছে একেনবাবু, মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর সঙ্গে এই চিঠির কোনো যোগ আছে?”

একেনবাবু আমার প্রশ্নের উত্তরে দিলেন না। “আচ্ছা স্যার, আপনার কাছে বাইনোকুলার আছে কি?”

একেনবাবুর কথার পারস্পর্য নিয়ে আগে কখনো মাথা ঘামাইনি। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়! কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই একেনবাবুর গোয়েন্দাগিরির বহর দেখে হঠাৎ একটা শ্রদ্ধাএসে গিয়েছিল। এই প্রশ্নে সেটা একটু চিড় খেল।

“আছে, কেন বলুন তো?”

এমন সময় বাইরের দরজায় বেল বাজল। একেনবাবু আমাকে অবাক করে বললেন, “স্যার, আজকে মিস্টার প্যাটেলের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে আর কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এমনকী প্রমথবাবুর সঙ্গেও না, প্লিজ। ”

একেনবাবুর সেই সতর্কবাণীর কোনো অর্থ আমি পেলাম না। কিন্তু এখন প্রশ্ন তোলার সময় নেই। বললাম, ঠিক আছে।

বেল বাজাচ্ছিল প্রমথ। ঢুকেই তাড়া লাগাল, “চল চল খিদেতে পেট জ্বলছে।

খেতে খেতে তোদের একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলব।”

আমাদের রাস্তার মোড়ে টমির পিৎজা পার্লার। সেখানে একটা কর্ণার টেবিল ম্যানেজ করে দুটো বড় পিৎজার অর্ডার দিলাম।

প্রমথ বলল, একটা ফোন এসেছিল সন্ধ্যার সময় মিস্টার প্যাটেলের।”

“কার কাছ থেকে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“নাম তো বলল, স্যাম ফ্রম লং আইল্যান্ড।”

“তারপর?”

“মিস্টার প্যাটেল মারা গেছেন শুনেও ব্যাটা মানতে চায় না। বলল, ‘আমি কিরিট প্যাটেলের কথা বলছি, তাঁকে ফোনটা দিন।’ আমি বললাম, ‘আমিও তাঁর কথা বলছি।’ এই শুনে একটা কথাও না বলে লাইন ছেড়ে দিল।”

“ইন্টারেস্টিং!” আমি বললাম। “মিস্টার প্যাটেল তো তোকে বলেছিলেন খবরটা কাউকে না জানাতে, কিন্ত লোকটা অবভিয়াসলি জানত যে, মিস্টার প্যাটেলকে তোর নম্বরে পাওয়া যাবে।”

“মিস্টার প্যাটেলই নিশ্চয় নম্বরটা দিয়েছিলেন, কিংবা ব্রিজ শাহয়ের কাছ থেকে

পেয়েছে --- কে জানে!” প্রমথ বলল।

“আচ্ছা স্যার, শৈলেন সাঁপুই যদি আগে থেকেই জানতেন, আমি কী ভাবব বা বলব, তাহলে আপনি যখন মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর খবর দিলেন, তখন উনি আশ্চর্য হলেন কেন? সেটাও তো ওর জানা উচিত ছিল।”

প্রমথ ব্যাপারটা জানত না বলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি একেনবাবুকে বললাম, “আপনার ভক্তিতে একটু চোট লেগেছে মনে হচ্ছে। প্রশ্নটা এখন আমাকে না করে ওঁকে করলেই পারতেন।”

“তখন খেয়াল হয়নি স্যার।”

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, “কেসটা কী?”

তখন শৈলেন সাঁপুইয়ের গল্পটা করলাম।

“তোরা বুঝি ওখানেই কাটালি সন্ধ্যেটা?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

বলা উচিত ছিল, ‘না’। কিন্তু একেনবাবুর অনুরোধ রাখতে কিরিট প্যাটেলের অ্যাপার্টমেন্ট – অভিযানটা চেপে গেলাম, যদিও ‘হ্যাঁ’ বলতে নিজেকে খুব অপরাধী লাগল।

খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ি ফিরে সোফায় বসতেই বুঝলাম, কী ভীষণ টায়ার্ড হয়ে আছি! প্রমথ আজকেও উপরে শোবে বলে চলে এল। সোফায় শোবার প্ল্যান করছিল, কিন্ত একেনবাবু শুনলেন না। জোর করে নিজের ঘরে প্রমথকে পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে নীচে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে শুতে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ বই পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে বিছানায় চিৎপাত হলাম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রমথ নেই। নিশ্চয় সাত-সকালে এক্সপেরিমেন্ট ছিল, স্কুলে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে একেনবাবুকে ফোন করতে যাচ্ছি, এর মধ্যেই একেনবাবু সশরীরে উপস্থিত।

“আপনি নিশ্চয় টেলিপ্যাথি জানেন, এক্ষুণি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।”

একেনবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, কাঠের বাড়িতে এটাই স্যার সুবিধা, ওপরের তলায় কী হচ্ছে না হচ্ছে নীচের তলা থেকে দিব্যি বোঝা যায়। আপনি ঘুম থেকে ওপরে উঠে মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে এলেন, আর আমিও চলে এলাম।

“ভালো করেছেন। কিন্তু আজকে আপনাকে একটু উৎফুল্ল মনে হচ্ছে।”

“মর্নিংয়ে আমি সব সময়েই ফ্রেশ থাকি স্যার, তবে আজকে একটা বিশেষ কারণও আছে।” একেনবাবু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন।

“কারণটা কী জানতে পারি, না সেটা গোপনীয়?”

“কী যে বলেন স্যার, নিশ্চয় পারেন। নীচে চলুন, দেখাচ্ছি।”

“এই সক্কালবেলা কী আবিষ্কার করলেন?”

“আসুন না স্যার।”

নীচে যেতেই একেনবাবু আমার হাতে বাইনোকুলারটা ধরিয়ে দিয়ে কিচেনের জানলার সামনে গেলেন।

“সামনের বাড়ির জানালার একটু নীচে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখুন তো স্যার। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না!”

আমি বাইনোকুলারে চোখ রাখলাম। দূরের জানলাটা খুব কাছে এসে গেল। দেওয়ালের রংটা হালকা খয়েরি। জানালার ঠিক নীচে বৃষ্টির জলের জন্যই হবে বোধ হয়, বেশ কিছুটা অংশ কালচে হয়ে গেছে। সেই কালচে অংশের এক পাশে মনে হল একটা

ফুটোর মত কিছু। তাছাড়া কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ল না।

"কিছুই তো দেখলাম না, কী দেখব?" আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম।

একেনবাবু আমার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দেখে বোধহয় একটু হতাশ হলেন।

"নাঃ স্যার, আপনি একদম খেয়াল করছেন না! যাই হোক একটা মই যোগাড় করতে পারেন?"

"মই! মই দিয়ে কী করবেন?"

"কাছে গিয়ে একটু পরীক্ষা করতাম স্যার।"

"আপনি কি মশাই ক্ষেপে গেলেন! এই শীতে মই বেয়ে উঠতে গিয়ে কি হাত-পা ভাঙতে চান?"

"স্যার,আপনি ঠিক বুঝছেন না, ইট ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট।"

"কী এত ইমপর্ট্যান্ট?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আগে মইটা যোগাড় করুন স্যার, প্লিজ 'না' করবেন না।"

"আপনি তো মহা ঝামেলা পাকালেন, কোথায় পাব এখন মই!"

গজগজ করলাম বটে, কিন্তু লোকটা পুরোপুরি ক্ষ্যাপা নয়, সেটা এতদিনে বুঝে গেছি। একতলায় অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজারের কাছে একটা মই ছিল। সে সবে ঘুম থেকে উঠে কফি খাচ্ছিল। প্রথমে দিতে চাইছিল না। ওর ভয় পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে ওর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকব। অনেক তুইয়ে বুইয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করা গেল। অ্যালুমিনিয়ামের হালকা মই। একেনবাবু নিজেই কাঁধে করে নিয়ে পাশের বাড়ির জানলার ধারে লাগালেন। ভাগ্যিস ওই বাড়িতে কোনো ভাড়াটে নেই, নইলে মই লাগিয়ে জানালার দিকে কেউ উঠে আসছে দেখলে থানা-পুলিশ হত। আমি নীচ থেকে পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে মনে হল একেনবাবু পকেট থেকে কিছু একটা বের করে দেয়ালে খোঁচাখুচি করছেন।

এদিকে আমার ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে। বললাম, "কী মশাই, আপনার গবেষণা শেষ হল?"

"কাজ খতম স্যার," যেটা দিয়ে খোঁচাচ্ছিলেন, সেটা পকেটেঢুকিয়ে হাসি হাসি মুখে উনি নেমে এলেন।

"কী আবিষ্কার করলেন ওখানে?"

"মইটা ফেরত দিয়ে আসুন স্যার, বলছি।"

আর যে কোথাও ওঠার প্ল্যান করছেন না, তাতেই আমি খুশি। দ্বিরুক্তি না করে আমি অদৃশ্য হলাম।

মই জমা দিয়ে যখন ঘরে এলাম তখন দেখি একেনবাবু খাবার টেবিলে রাখা একটা রুমালের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছেন। দূর থেকে বুঝিনি, সামনে এসে দেখি রুমালের উপরে একটা বুলেট।

"এটা কোত্থেকে এল?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ওবাড়ির দেওয়াল থেকে।"

"ওবাড়ি মানে যেখানে মই দিয়ে উঠলেন?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি প্রায় ডেফিনিট এই গুলিটা মিস্টার প্যাটেলের রিভলভার থেকে বেরিয়েছিল।"

"সেটা কী করে বুঝলেন?"

"আপাতত বলব স্যার, সেটাই লজিক্যাল পসিবিলিটি। শিওর হতে গেলে ব্যালিস্টিক টেস্ট করতে হবে। "

আমি গুলিটাকে ভালো করে দেখলাম। তারপর বললাম, “লজিকটা কি ভালো করে বোঝাবেন?”

একেনবাবু মাথাটা একটু চুলকে বললেন, “তিনটে পয়েন্ট স্যার। এক নম্বর, এটা টোয়েন্টি টু ক্যালিবারের বুলেট। মিস্টার প্যাটেলের হাতে যে রিভলভারটা ছিল, সেটাও টোয়েন্টি টু ক্যালিবারের। দু’নম্বর হল, গুলিটা বার করতে গিয়ে দেখলাম ওটা একেবারে হরাইজেন্টালি দেওয়ালে ঢুকেছে। সেটা একমাত্র সম্ভব, কেউ যদি প্রমথবাবুর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গুলিটা ছোঁড়ে। ফাইনালি স্যার, গর্তের মুখটা একেবারে পরিষ্কার। অর্থাৎ গর্তটা অনেকদিনের নয়, নইলে এতদিনে সেখানে ধুলোবালি জমে যেত। এখন আমরা জানি, প্রমথবাবুর রিভলভার নেই, সুতরাং ওঁর পক্ষে...।”

একেনবাবুর বক্তৃতা থামিয়ে আমি বললাম, “বুঝলাম। গুলিটা মিস্টার প্যাটেলই ছুঁড়েছিলেন। একটা নয়, দু’টো গুলিই উনি ছুড়েছিলেন। কিন্তু তাতে হাতিঘোড়া হলটা কী?”

“বিগ ডিফারেন্স স্যার, ভেরি বিগ ডিফারেন্স! চিন্তা করুন মিস্টার প্যাটেল কী ভাবে নিজেকে মারার চেষ্টা করেছিলেন?”

“অফ কোর্স রিভলভার চালিয়ে, উই অল নো দ্যাট।”

“রাইট স্যার। রিভলভারটা কী ধরনের মনে আছে আপনার, মানে ব্যারেলের সাইজটা?”

“থাকবে না কেন, অর্ডিনারি ব্যারেল — ইঞ্চি চারেক লম্বা।”

“রাইট এগেইন স্যার। এবার বলুন, গুলিটা কোথায় লেগেছিল?”

“রগের পাশে।”

“ঠিকই মনে আছে আপনার। লাস্ট কোয়েশ্চন স্যার, রিভলভারের ট্রিগারে কোনো আঙুলের প্রিন্ট পাওয়া গেছে?”

“সে তো আপনাদের কাছেই শুনলাম, ইনডেক্স ফিঙ্গারের।”

“তথ্যে কোনো ভুল নেই স্যার, আমি নিজের কানে শুনেছি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে, আর সেখানেই হচ্ছে পাজল।”

“পাজল!”

“হ্যাঁ স্যার।”

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এতে পাজলের কী আছে?”

“বলছি স্যার। নর্মালি আমরা ইনডেক্স ফিঙ্গারটাই ট্রিগারের উপর রাখি।

কিন্তু এই সিচুয়েশনটা ডিফারেন্ট। মনে করুন রিভলভারের নলটা খাড়াভাবে রগের ওপর বসিয়ে আঙুল দিয়ে ট্রিগার টিপছেন।”

ডেমনস্ট্রেট করার জন্য একেনবাবু আমার কনুইটা তুলে কব্জিটা একটু বেঁকিয়ে ধরলেন।

“মনে রাখবেন স্যার, ব্যারেলটা চার ইঞ্চি লম্বা, ফায়ার করতে গেলে ট্রিগারে যথেষ্ট চাপ দেওয়া দরকার। কনুইটা আরেকটু উপরে তুলুন, আর একটুখানিই ব্যস। এবার কবজিটা আর একটু বেঁকান, জাস্ট রাইট, একদম কারেক্ট পজিশন। এবার বলুন স্যার, কী মনে হচ্ছে?”

“উঃ” আমি স্বীকার করলাম। “মাসলে ভীষণ টান পড়ছে!”

“রাইট স্যার। আর আপনি তো নর্মাল হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল। আপনারই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভেবে দেখুন আর্থ্রারাইটিসের রোগী মিস্টার প্যাটেলের কীরকম অবস্থা

হবে!”

“ওঁর আর্থারাইটিস ছিল, সেটা আবার কে বলল?”

“পিওর স্পেকুলেশন স্যার। দেখলেন না ওঁর বাড়িতে অ্যাসপিরিন, টাইলানল — ব্যথা কমানোর ওষুধের ছড়াছড়ি!”

“ওয়েট এ মিনিট, আপনি কি বলতে চান এভাবে নিজের রগে গুলি চালিয়ে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না?”

“তা তো বলিনি স্যার। স্বচ্ছন্দেই সেটা পারা যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে একটা নয় দু'টো হাত লাগে। ফর এ রাইট হ্যান্ডেড পার্সন, বাঁ হাতে রিভলভারের ব্যারেলটা ধরে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিতে হয়।”

আমি একেনবাবুর কথামতো দু'টো হাত ওপরে তুলে বুঝতে পারলাম নিঃসন্দেহে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক পজিশন।

‘যে কথা বলছিলাম স্যার। আমরা জানি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেটা পাওয়া গেছে, সেটা বুড়ো আঙুলের নয়। কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ঘটনা হল, ওঁর হাতে গান পাউডার পাওয়া গেছে। এটা একমাত্র সম্ভব যদি কেউ নিজের হাতে গুলি ছোঁড়ে।”

এবার আমি বুঝতে পারলাম একেনবাবু কোন দিকে এগোচ্ছেন। বললাম, “বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ মিস্টার প্যাটেলকে খুন করার পরে, আততায়ী ওঁর হাতে রিভলভারটা ধরিয়ে ইনডেক্স ফিঙ্গারটা ট্রিগারের ওপর রেখে তাতে চাপ দিয়ে আরেকটা গুলি চালিয়েছে, যাতে গান পাউডার হাতে লেগে থাকে এবং ট্রিগারেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়।”

“কারেক্ট স্যার। কিন্তু শুধু তাই নয়। গুলিটা যাতে কারো চোখে না পড়ে, সে ব্যবস্থাটা করা দরকার। সবচেয়ে সহজ উপায় জানালাটা খুলে তার ফাঁক দিয়ে গুলি চালানো। তাহলে গুলিটা বাইরে চলে যাবে বা অন্য কোনো বাড়ির দেওয়ালে লাগবে। সেদিনের ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র -বিদ্যুতের মাঝে কারো কিছু খেয়াল হবে না। ”

একেনবাবুর কথাগুলো মোটেই উপেক্ষা করার মতো নয়। পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বাট হু কুড হ্যাভ মার্ডারড হিম?”

প্রশ্নটা করার সময় আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল একেনবাবু দু'-একটা সাসপেক্ট ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

একেনবাবু মাথা নাড়লেন, “সেটাই তো স্যার সমস্যা। আই হ্যাভ নো ক্লু।”

।। ১০ ।।

সকালে বম্বশেলটি ফাটিয়ে একেনবাবু কেটেছেন, ফিরতে ওঁর সন্ধ্যে হবে বলে। আমার আজ মাত্র একটা ক্লাস। সেটা সেরে অফিসে এসে কাগজপত্রগুলো ব্রিফ- কেসে ঢোকাতে গিয়ে দেখি মিস্টার প্যাটেলের খাতাটা! নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে বেরোবার সময় অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ওটাকে ঢুকিয়ে ফেলেছিলাম! খাতাটা বের করে একটু পাতা ওলটালাম। প্রতি পাতার ওপরে হাতে লেখা একটা তারিখ। প্রথম তারিখ দেখলাম ১

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯। শেষ লেখা মাত্র কয়েকদিন আগের, ১০ ফেব্রুয়ারির। খুবই নীরস দিনপঞ্জী। ১ সেপ্টেম্বরের পাতায় লেখা:

> কাল সিডের বাড়িতে ব্রিজ খেলতে গিয়েছিলাম। আমি-সিড ভার্সাস সিদ্দিকি-কে.জি.। আমরা দু'টো রাবার জিতেছি। বাজি ধরে খেলা উচিত ছিল! সিড একটা বড়সড় কিছুর প্ল্যান করেছে। ঠিক কী বলল না। তবে ইট ইজ ভেরি ভেরি বিগ — ও নিজে সামলাতে পারবে না। হি নিডস হেল্প — আমায় দলে নিতে চায়। সিডের বাড়িতে এই শেষ ব্রিজ খেলা। এরপর অন্য কোথাও।
>
> গোপালরাজ বলেছে আমার চিঠি পায়নি। হি ইজ লায়িং।
>
> আজ ৯টায় কে.জি.র বাড়ি যাচ্ছি। একটা ভালো অপরচুনিটি আছে। মার্জিন নিয়ে সমস্যা হবে, কারণ কে.জি. পনেরো পার্সেন্ট চাচ্ছে!

অন্যান্য তারিখেও এরকমই এন্ট্রি। শেষ লেখাটা মাত্র এক লাইনের —

বিশ্বাস করতে পারছি না সিড এভাবে চলে গেল!

কোথায় গেল, কেন গেল? তার কোনো উল্লেখ নেই। সত্যি কথা বলতে কী, চাঞ্চল্যকর কিছুই চোখে পড়ল না, যা নিয়ে পরে অনুসন্ধান চালানো যায়। হঠাৎ খেয়াল করলাম ৮ সেপ্টেম্বর মিস্টার প্যাটেল কিছু লেখেননি। কিন্তু অবাক লাগল যখন দেখলাম যে, ১৫ সেপ্টেম্বরেও কোনো কিছু লেখা নেই। ইন্টারেস্টিং, পনেরো হচ্ছে আটের সাতদিন পরে। পনেরোর সাথে সাত যোগ করলে দাঁড়ায় বাইশ। আমি ২২ তারিখে কী লিখেছেন দেখতে গিয়ে দেখলাম যে, ওই তারিখেও কোনো এন্ট্রি নেই! ২৯ তারিখও শূন্য। ক্যালেন্ডারে দেখলাম, ৮ সেপ্টেম্বর হচ্ছে শুক্রবার। অর্থাৎ কোনো শুক্রবারই ডায়েরিতে কিছু লেখা হয়নি! এবার খাতাটাকে একটু ভালো ভাবে পরীক্ষা করলাম। আমেরিকাতে এ ধরনের খাতার খুব চল — রিং বাইন্ডার দেওয়া খাতা। রিং এর ভেতরে দেখলাম কাগজের কিছু — কিছু আঁশ তখনও লেগে। তার মানে কেউ খাতা থেকে কিছু কাগজ ছিঁড়েছে! কিন্তু কে এবং কেন? এক হতে পারে যে, ওই বিশেষ দিনগুলোতে এমন কিছু ঘটেছিল — যেটা কিরিট প্যাটেল আর কাউকে জানতে দিতে চাননি! কিন্ত তাই যদি হবে, তাহলে উনি সেগুলো লিখেছিলেন কেন? তবে কি আর কেউ কাগজগুলো ছিঁড়েছে? কিরিট প্যাটেলকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য, বা কোনোরকমের এভিডেন্স লুকোবার জন্য? কিন্তু সেক্ষেত্রে কাগজগুলো না ছিঁড়ে পুরো খাতাটা চুরি করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ হত!

তখনই আমার মনে সন্দেহটা এল। একজনই এগুলো ছিঁড়তে পারেন, এবং সম্ভবত সেইজন্যেই উনি মিস্টার প্যাটেলের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাহলে কি একেনবাবু...! আর আমি যত ভাবলাম, ততই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। মিস্টার প্যাটেলের বাড়ি গিয়ে একেনবাবু ভীষণভাবে কিছু একটা খুঁজছিলেন। ডায়েরিটা পাবার পরই মনে হল, যেন ওঁর কাজ শেষ হয়েছে। ওঁর পক্ষে খাতাটা গায়েব করা অসম্ভব, যেহেতু আমি সেটা দেখেছি। কিন্তু পাতাগুলো ছেঁড়া কিছুই কঠিন নয়। আমি যখন স্নান করছিলাম, তখনই হয়তো ছিঁড়েছেন! কিন্তু কেন? তার উত্তর অবশ্যই আমার জানা নেই।

তবে এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম যে, একেনবাবু লোকটি কে, কী করেন, কেন এদেশে এসেছেন — সে সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না। উনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু রনুর পরিচিত, গভর্নমেন্টে কিছু একটা করেন, এবং এদেশে কোনও কাজের সূত্রেই

এসেছেন। অথচ খতিয়ে দেখতে গেলে এই জানাটা এত সুপারফিসিয়াল যে, প্রায় কিছুই জানি না বলাটা অত্যুক্তি নয়। নিজের সম্পর্কে যে — কোনো কথাই অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে যান। এতদিন পর্যন্ত ওকে দেখে আমার মনে হত যে, উনি হলেন র‍্যান্ডাম কৌতূহল, আর অফুরন্ত অসংলগ্ন প্রশ্নের ঝুরি! ভদ্রলোকের মনন শক্তি বা বুদ্ধি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দূরে থাক, প্রায়ই মনে হয়েছে এরকম একটা গবেট লোক এতকাল করে খাচ্ছে কী করে! কিন্তু এই মুহূর্তে আমার যে চিন্তা, সেটা একেনবাবুর বুদ্ধি নিয়ে নয়। উনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, সে সম্পর্কে এখন আর আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। আমার চিন্তা হচ্ছে কেন সেই বুদ্ধিটাকে উনি কাউকে জানতে দিতে চান না? এটা মোটেই বিনয় নয়, এটা হল চতুরতা। এইভাবে বোকা সাজার পিছনে আসল মতলবটা কী? মিস্টার প্যাটেলের হত্যাকারীর সঙ্গে ওঁর কি কোনো কানেকশন আছে? পুলিশের কাছ থেকে এভিডেন্স লুকোবার জন্য কি উনি পাতা গুলো ছিঁড়েছেন? কেন উনি মিস্টার প্যাটেলের বাড়িতে আমাদের ওই অভিযানটা প্রমথকে জানাতে দিতে চাননি? উনি তদন্ত চালাবার ভান করে আমাকে নানান তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু পুলিশকে কোনো তথ্য জানাচ্ছেন না কেন?

আমি ঠিক করলাম প্রমথকে সব ঘটনা খুলে বলব। এব্যাপারে আমাদের একটা জয়েন্ট স্ট্র্যাটেজি দরকার। প্রমথর ল্যাব আমার অফিসের খুব কাছেই, দুটো বিল্ডিং পরে। কয়েক মিনিট লাগে মাত্র যেতে। প্রমথ ল্যাবেই ছিল। আমি প্রথমে মিস্টার প্যাটেলের বাড়িতে আমাদের অভিযানের কথাটা বললাম। তারপর একেনবাবুর রহস্যজনক আচরণ, প্লাস, প্রমথকে যে উনি এগুলো জানতে দিতে চান না, সেটা বললাম। প্রমথ প্রথমে হাঁ করে শুনছিল। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করল।

"হাসছিস কেন ওরকম," আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওকে ধমক লাগালাম।

"হাসছি একেনবাবুর খ্যাপামি, আর তোর বুদ্ধুমি দেখে!"

"তার মানে?"

"ক' দিন আগে একেনবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'স্যার, একটা কথা খুব প্রাইভেটলি বলছি।' আমি ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'একদম না। আমার পেট ভীষণ পাতলা। দেখতে না দেখতে হাজার লোককে বলে ফেলব।' আমার মনে হয় সেই শুনেই ভদ্রলোক একটু সতর্কতা নিয়েছেন। কিন্তু তোদের বলিহারি, এরকমভাবে কারোর বাড়িতে বেআইনি প্রবেশের শাস্তি কী জানিস?"

তা আর জানি না! কিন্তু আমার আসল চিন্তার এখনো সুরাহা হচ্ছে না। প্রমথকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, একেনবাবু ঠিক কী করেন বলে তোর ধারণা?"

"ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের লোক, সেটা আমি শিওর। ইনফ্যাক্ট গতকাল ইন্ডিয়া কনস্যুলেটের দিলীপ দোশি বলে একজনের সাথে আলাপ হল। সে একেনবাবুকে বেশ ভালভাবেই চেনে। ওর কথা শুনে মনে হল যে, উনি বেশ উঁচু পদেই কাজ করেন।"

"আর একটু ভালোভাবে খোঁজ নিতে পারিস?"

"তা পারি, কিন্তু তোর ওঁকে এত সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

আমি ডায়েরির ছেঁড়া পাতার কথাটা তখনও প্রমথকে বলিনি। সেটা বলতেই প্রমথ বলল, "তোর মুন্ডু! হোয়াই উইল হি ডু দ্যাট?"

"আই অ্যাম নট সিওর। মে বি কোনো এভিডেন্স সরিয়ে ফেলতে!"

"ওয়েল আই অ্যাম শিওর অফ ওয়ান থিং এন্ড দ্যাট'স ইউ আর অ্যান ইডিয়ট! পুলিশ কেস ক্লোজ করে দিয়েছে। উনি যদি সত্যিই দোষী হন, তাহলে তো ওঁর চুপ করে থাকার কথা। ডায়েরি চুরি করে তার পাতা ছেঁড়া — সেটা তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বার

করার মতো ব্যাপার হবে! তোর মাথায় আছে কি — অ্যাঁ? যাক সে কথা, এদিককার খবর শুনেছিস! অবিনাশ ইজ নাউ এ ভেরি রিচ ম্যান!”

“তার মানে?”

“ব্রিজ শাহ অবিনাশের অ্যাড্রেসটা ভেরিফাই করতে ফোন করেছিলেন, তখনই জানলাম।”

“কী জানলি?”

“মিস্টার প্যাটেলের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হচ্ছে অবিনাশ। আর গেস ওঁর এস্টেটের ভ্যালুয়েশনটা কত?”

“আই ডোন্ট নো! কত, চারশো... পাঁচশো...?”

“কুল ফাইভ মিনিয়ন ডলার্স!”

“ফাইভ মিলিয়ন!” আমি প্রচণ্ড অবাক হলাম। “লোকটার এত টাকা ছিল?”

“তুই তো একেবারে ভিরমি খাচ্ছিস! আরে বাপু, বিজনেস মানেই মানি।”

“অবিনাশ খবরটা জানে?”

“নট শিওর। অবিনাশের এক মামা আজ সকালে দেশ থেকে ফোন করেছিলেন অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে। এখনও এখানে আসেনি শুনে অবাক হলেন। কারণ অবিনাশ নাকি গত শনিবারে রাত্রে আমেরিকা রওনা দিয়েছে।”

“তা কী করে হয়! সেক্ষেত্রে তো ওর এখানে পৌঁছে যাবার কথা! অবশ্য ইউরোপে যদি স্টপ ওভার নেয় তাহলে অন্য কথা।”

“স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার হল যে, ও আমেরিকার ডিরেক্ট ফ্লাইটই ধরেছিল। সেক্ষেত্রে রবিবার দুপুরে, অর্থাৎ চারদিন আগেই ওর এখানে পৌঁছনোর কথা!”

আমি তখন প্রমথকে বললাম সকালবেলায় একেনবাবুর গুলি আবিষ্কারের ঘটনাটা, আর সেই সঙ্গে ওঁর মার্ডার থিওরিটা।

প্রমথ থ হয়ে শুনল! তারপর বলল “গড! এত গভীর গাড্ডা রে! তার মানে একজন সাসপেক্ট অন্তত আছে যার মিস্টার প্যাটেলকে মারার মোটিভ ছিল। আর সত্যই যদি চারদিন আগে ও এখানে এসে থাকে, তাহলে ওর অপরচুনিটিও ছিল।”

“আমাদের অবিনাশ মার্ডারার! দ্যাট্স ননসেন্স!” আমি বললাম।

প্রমথর এক্সপেরিমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। আমরা দু’জনে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরলাম। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা না করে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ প্রমথর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কারও গলা ভেসে এল। প্রথমে ভেবেছিলাম একেনবাবুর। কিন্তু তারপর খেয়াল হলো, ওঁর তো দেরি করে ফেরার কথা! আমাদের উচিত ছিল ওপরে গিয়ে পুলিশকে ফোন করা। কারণ ভেতরে কে আছে, লোকটা সশস্ত্র কিনা, কিছুই জানি না। কিন্তু প্রমথ গোঁয়ারের মত চাবি ঢুকিয়ে দুম করে দরজাটা খুলে ফেলল। দু’জনেই সবিস্ময়ে যাকে দেখলাম, সে হল অবিনাশ!

।। ১১ ।।

অবিনাশ ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। আর সোফায় বসে একটা অচেনা লোক চিমনির মত ধোঁয়া বের করে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিল। অবিনাশ আমাদের দেখে হাত নাড়ল। তারপর "ও.কে.,আজ রাতে তাহলে দেখা হবে, বাই," বলে ফোনটা ছেড়ে দিল।

ফোন নামাতেই প্রমথ চেঁচিয়ে উঠল, "হোয়াট দ্য হেল, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?"

উত্তরে অবিনাশ যেটা বলল, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। ও নাকি পাঁচ দিন আগে ওর আঙ্কল কিরিট প্যাটেলের কাছ থেকে খুব জরুরী একটা ফোন কল পায়, নেক্সট ফ্লাইটেই আমেরিকাতে চলে আসার জন্য। কেন, কিরিট প্যাটেল জানাতে চাননি। তবে গলার স্বর শুনে অবিনাশ অনুমান করেছিল যে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে নামতেই কিরিট প্যাটেল ওকে হল্যান্ড টানেলের পাশে যে 'হলিডে ইন' আছে, সেখানে নিয়ে যান। কিরিট প্যাটেল ওকে বলেন যে, কয়েকজন বিজনেস অ্যাসোসিয়েটের সঙ্গে ওঁর বড় রকমের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির মাত্রাটা এত চরমে পৌঁছেছে যে, উনি নিজের বাড়িতে খুব নিরাপদ বোধ করেননি। কাউকে না জানিয়ে 'হলিডে ইন'-এ বসে আছেন। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে থাকায় ওঁর বিজনেসের খুব ক্ষতি হচ্ছে। পরের ক'দিন কানেকটিকাট, নিউ জার্সি আর পেনসিলভানিয়ার বেশ কয়েকটা দোকানে ওঁর মাল ডেলিভারির ডেট। উনি সেটা মিস করতে চান না। এই ব্যবসায় একবার সুনাম নষ্ট হলে সেটা ফিরে পাওয়া কঠিন। আবার নিজেও মালগুলো নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন, লাখ লাখ টাকার জিনিস! তাই ওঁর অবিনাশের সাহায্য দরকার।

"কার সঙ্গে গন্ডগোলটা হয়েছিল সেটা বলেছিলেন?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"তুমি জানতে চাইলে না?"

"কী হবে জেনে!"

"হোয়াট ডু ইউ মিন কী হবে জেনে! এরকম একটা লাইফ থ্রেটনিং সিচুয়েশন দেখেও তুমি কিছু বললে না?"

"ওয়েল আই টোল্ড হিম, ইফ দেয়ার ইজ এ ফিয়ার ফর লাইফ, তাহলে ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।"

"উনি কী বললেন?"

"হি ওয়াজ ভেগ। এটুকু বুঝেছিলাম যে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। পুলিশে খবর দিলে সবাই ঝামেলায় পড়বে, আঙ্কলও বাদ যাবেন না!"

"তোমার কি মনে হয়েছিল ওর প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"নট রিয়েলি।"

"ওয়েট এ মিনিট," প্রমথ বলল, "তাই যদি হয়, তাহলে তুমি ওকে বললে কেন, ইফ দেয়ার ইজ এ ফিয়ার ফর লাইফ!"

"আই ডোন্ট নো। ইট ওয়াজ এ ওয়াইল্ড গেস!"

"ইউ আর জাস্ট অ্যাজ ভেগ অ্যাজ ইওর আঙ্কল," প্রমথ মন্তব্য করল।

অবিনাশ ঘাড় ঝাঁকাল, "কান্ট হেল্প ইট।"

প্রমথ আর অবিনাশের মধ্যে কমুউনিকেশনটা বরাবরই অত্যন্ত বাজে। তাই আমি একটু চেষ্টা করলাম, যদি আর দু'-একটা পয়েন্ট উদ্ধার করা যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী ধরনের ঝামেলা — সে সম্পর্কে কোনো হিন্ট পাওনি মিস্টার প্যাটেলের কাছ থেকে?"

“অল আই নো যে, একটা লোক ঝামেলাটা পাকিয়ে উধাও হওয়ায় আঙ্কলের ঘাড়ে দোষটা পড়েছিল। আঙ্কল জাস্ট নিডেড সাম টাইম টু গেট হিমসেল্ফ ক্লিয়ারড।”

“উনি এখানে এলেন কেন?” প্রমথ আবার প্রশ্ন করল। প্রমথর প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা বেশ অ্যাটাকিং। একবার মনে হল অবিনাশ চটে গিয়ে আর উত্তর দেবে না। কিন্তু ও মাথা ঠান্ডা রেখেই উত্তর দিল।

“হোটেল লবিতে হঠাৎ একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে আঙ্কলের দেখা হয়ে যায়। উনি ভয় পান যে, খবরটা ছড়িয়ে যাবে। তখন আমিই ওঁকে সাজেস্ট করি, অন্য হোটেলে না গিয়ে তোমাকে ফোন করতে।”

ওঁকে ফাঁসিয়ে যে উধাও হয়েছিল, তার নামটা উনি বলেছিলেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“না।”

“তুমি কখন জানলে যে, তোমার আঙ্কল মারা গেছেন?” প্রমথর প্রশ্ন।

“আজ সকালে, ‘ইন্ডিয়া অ্যাব্রড’ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্রিজ আঙ্কলকে ফোন করি। ব্রিজ আঙ্কলও আমার খোঁজ করছিলেন। উনি বললেন...।”

“ব্রিজ শাহর কথা বাদ দাও,” প্রমথ অবিনাশকে থামিয়ে দিল, “তুমি পুলিশকে এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছ?”

“কোন বিষয়ে?”

“তুমি যা এতক্ষণ আমাদের বললে!”

“না।”

“কেন?”

অবিনাশ একটু থতমত খেল। আমতা আমতা করে বলল, “আমি ব্রিজ আঙ্কলকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, ‘সেটা তোমার ডিসিশন’ তবে আনঅফিসিয়ালি তোমাকে বলি, যে চলে গেছে তাকে তো তুমি আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না সুতরাং এটা নিয়ে আর ঘাঁটিও না।”

“আর তুমিও সেটা দিব্যি মেনে নিলে!” বেশ ব্যঙ্গ করেই কথাটা বলল প্রমথ।

প্রমথর সঙ্গে অবিনাশের প্রায়ই খটাখটি লাগে, আমি তাতে সাধারণত মাথা ঘামাই না। কিন্তু আজ মনে হল, মিস্টার প্যাটেলের হত্যার সাথে অবিনাশ যদি জড়িত থাকে, তাহলে প্রমথর একটু সতর্ক হওয়া উচিত। ওয়ানস এ মার্ডারার ইজ অলওয়েজ এ মার্ডারার!

আমি প্রমথকে বললাম, “যাঃ, তার নিশ্চয়ই কোনো রিজন আছে।”

“সমাদ্দারকে সেটা কে বোঝাবে!” অবিনাশ আমার সমর্থন পেয়ে প্রমথকে ঠুকল। তারপর একটু চুপ করে থেকে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বলল, “আমি ব্রিজ আঙ্কলকে বলেওছিলাম যে, আমি পুলিশকে জানাতে চাই। তখন উনি বললেন কেন উনি আমার খোঁজ করছিলেন। আমার আঙ্কলের উইল অনুসারে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছি আমি। ‘এবারে ভেবে দ্যাখো’, উনি বললেন ‘তুমি এদেশে হঠাৎ চলে এসে কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা হোটেলে লুকিয়ে রইলে। আর তোমার আঙ্কল তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে মিস্টিরিয়াসলি মারা যাবার পর — পরই তুমি উদয় হলে। আমার তো মনে হয়, তুমিই হবে পুলিশের প্রাইম সাসপেক্ট।’

ব্যাপারটার গুরুত্ব তখন আমি প্রথম রিয়ালাইজ করলাম।”

প্রমথর মুখ দেখে বুঝলাম এই কথাটা আদায় করবার জন্য ও অবিনাশকে খোঁচাচ্ছিল। বলল, “এখন বুঝেছি, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা! ভাল কথা, তুমি কী করছিলে পরশু সন্ধ্যার

সময়?”

“পরশু!”

“হ্যাঁ, বুধবার সন্ধ্যায়, যখন তোমার আঙ্কল মারা যান! ”

“হোটেলে বসে টিভি দেখছিলাম।”

“একা?”

“কিন্তু এরকম প্রশ্ন করার অর্থ?”

“সিম্পল, শুধু দেখছিলাম, তোমার কোনো অ্যালিবাই ছিল কিনা!”

প্রমথটা মাঝে মাঝে ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়! কিন্তু অবিনাশকেও বলিহারি! মামার মৃত্যুর খবরে এতটুকু বৈকল্য নেই। প্রমথর কথার পিঠে বলল, “এটা তো আত্মহত্যা!”

“ওয়ান কুড নেভার বি শিওর,” আমি বললাম। “সাপোজ ইট ইজ এ মার্ডার। সেক্ষেত্রে যারা ওঁকে মার্ডার করেছে, তুমিও তো তাদের টার্গেট হতে পারো। তারা ভাবতে পারে যে, যেটা তারা খুঁজছে, সেটা এখন তোমার কাছে আছে!”

“আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, কে কী খুঁজছে?” অবিনাশ একটু যেন সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেলাম। শুধু বললাম, “তাও আমার মনে হয় তোমার পুলিশকে সব কিছু জানানো উচিত।”

অবিনাশ কোনো জবাব দিল না।

প্রমথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা তোমার আঙ্কল কি শুক্রবার-শুক্রবার কোথাও যেতেন?”

“আই ডোন্ট নো। হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?” এখন আর সন্দেহ নেই অবিনাশ বেশ সাসপিশাস।

আমি চট করে আর একটা প্রশ্ন করে আবহাওয়াটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম, “তোমার আঙ্কলকে স্যাম বলে একজন ফোন করেছিল। বিশেষ দরকারে মনে হল। তুমি তাকে চেন?”

উত্তরে ‘না’ বা ওই জাতীয় কিছু শুনব ভেবেছিলাম। কিন্তু অবিনাশ সোফায় বসা লোকটাকে দেখিয়ে বলল, “ইনিই হচ্ছেন স্যাম ওয়াকার।”

।। ১২।।

স্যাম ওয়াকার ভারতীয় ক্রিশ্চান, জাম্বিয়াতে মানুষ। শুধু নামে নয়, চেহারা দেখলেও পরিষ্কার বোঝা যাবে না যে স্যাম ভারতীয়। চুলগুলো কোঁকড়া-কোঁকড়া, ঠোঁটটা পুরু — মোটেও টিপিক্যাল ভারতীয় চেহারা নয়। বয়সে আমাদের থেকে বেশ কয়েক বছরের ছোটোই হবে মনে হল।

আমি স্যাম ওয়াকারকে প্রশ্ন করলাম, “মিস্টার প্যাটেলকে ধরার চেষ্টা করছিলেন কেন?”

স্যাম যে উত্তরটা দিলেন, সেটা একদমই আশা করিনি। বললেন, “একটা মুনস্টোনের

খোঁজে।"

কথাটা শুনে আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমি শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, "দেখুন, শুধু আপনি নন, একাধিক লোক এই মুনস্টোনটার ব্যাপারে গত কয়েকদিন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এটা এত কী মহামূল্য জিনিস আমাকে বলবেন?"

আরও অনেকে মুনস্টোনটার খোঁজ করছে জেনে স্যাম ভীষণ আশ্চর্য হলেন।

তবে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। যে মুনস্টোন নিয়ে এত গন্ডগোল, সেটা বহুদিন আগে এক জুলু প্রিন্সের কাছ থেকে স্যামের বাবা পান, মাস কয়েক আগে কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় স্যাম ওটা পাঁচ হাজার ডলারে কিরিট প্যাটেলকে বিক্রি করে দেন।

ক'দিন আগে নাটালের এক জেমস ডিলার হঠাৎ স্যামকে ফোন করে জানতে চায় ওই মুনস্টোনটা স্যামের কাছে আছে কিনা! তার জন্য ১৫ হাজার ডলার সে দিতে রাজি! ফোনটা পেয়েই স্যাম কিরিট প্যাটেলকে ফোন করেন। কিন্তু কিরিট প্যাটেল এর মধ্যেই ওটা কাউকে বেচে দিয়েছেন! স্যাম তখন ওকে নাটালের ডিলারের টাকার অঙ্কটা বলে। কিরিট প্যাটেল বলেন যে, টাকার অ্যামাউন্টটা আর কাউকে না জানাতে। উনি দু'-চার পয়সা বেশি দিয়ে আবার ওটা কেনার চেষ্টা করবেন। তারপর বিক্রি করে যে লাভটা হবে, ওঁরা দু'জন সেটা ভাগ করে নেবেন। এই হল ঘটনা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাকে মিস্টার প্যাটেল বলেছিলেন যে, কাকে ওটা বিক্রি করেছিলেন?"

স্যাম উত্তর দিলেন "না"।

"এখানকার এই ফোন নম্বরটা আপনাকে কে দিল?"

"মিস্টার প্যাটেল। আমাকে বুধবার ফোন করে বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে ফোন করতে। তার মধ্যেই খবরটা উনি পেয়ে যাবেন।"

ইট ইজ এ বিলিভেবল স্টোরি।

প্রমথ বলল, "সবই বুঝলাম। কিন্তু যেটা বুঝলাম না, সেটা হল, আপনি সেদিন ফোনটা আচমকা ছেড়ে দিলেন কেন?"

স্যাম ওয়াকার লজ্জা পেলেন। বললেন, "আপনি ফোনটা ধরেছিলেন বুঝি! আই অ্যাম সরি। মিস্টার প্যাটেল ডেড শুনে ভেবেছিলাম, কেউ নিশ্চয় প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে!"

অবিনাশ এই ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে কয়েকটা সোয়েটার আর কোট নিয়ে এসেছে দেখলাম। প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, তুমি ওগুলো নিয়ে কোথায় চললে?"

"ভাবছি কয়েকদিন হোটেলেই থাকব।"

"নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে হোটেলে থাকবে?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

অবিনাশ সোজাসুজি জবাব দিল না। তবে অনুমান করলাম, প্রমথ যে কারণে নিজের ঘরে থাকছে না, ওরও বোধহয় সেই একই কারণ। ভূতের ভয়েই সবাই গেল!

আমি ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলাম যে, গাড়ি করে ওকে পৌঁছে দেব কিনা। ও বলল মালপত্র ডেলিভারি করার জন্য ও এক সপ্তাহের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করেছে। সুতরাং যানবাহনের কোনো অসুবিধা নেই। বাঁচিয়েছে! এই শীতে আমার এতটুকু বেরোতে ইচ্ছে করছিল না।

একেনবাবু এলেন সেই সন্ধ্যায়। প্রমথটার কাণ্ড, একেনবাবু বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই বলল, "কী মশাই, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার দু'জন যে বেশ

গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছেন!"

আমি আর একেনবাবু দু'জনেই অপ্রস্তুত!

"ছি ছি, কী যে বলেন স্যার! হঠাৎ মাথায় খেয়াল চেপেছিল, আপনি হাসাহাসি করবেন বলে আর জানাইনি!" বলেই আমার দিকে একটা অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টি দিলেন।

"না জানিয়ে ভুল করেছেন," প্রমথ কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলল। "জানালে অনেকগুলো দরকারি তথ্য দিতে পারতাম। যেমন,..." এই বলে প্রমথ গড়গড় করে ব্রিজ শাহের ফোন থেকে শুরু করে অবিনাশের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া পর্যন্ত ডিটেলে আওড়ে গেল। তারপর একেনবাবুকে একটু খোঁচাল, "এবার বলুন পার্টনার বাছতে ভুল করেছেন কিনা?"

একেনবাবু দমবার পাত্র নন। বললেন, "আপনি আপনার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে এত ব্যস্ত থাকলে আমি কী করতে পারি স্যার?"

এরকম হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়েই এ ক'দিনের লুকোচুরির ব্যাপারটা চলে গেল। ভাগ্যিস প্রমথটা হড়বড় করে বলে ফেলেনি যে, আমি একেনবাবুকে সন্দেহ করছিলাম! তা হলে সত্যিই ভারি লজ্জায় পড়তে হত!

প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি যখন শিওর এটা মার্ডার, তাহলে পুলিশকে সেটা জানালে হয় না?"

একেনবাবু বললেন, "সেটা হবে স্যার খোদার ওপরে খোদকারি। তার আগে আর-একটু আঁটঘাট বাঁধা দরকার। মানে একজন সাসপেক্ট, কিছু এভিডেন্স।"

"অবিনাশ নিশ্চয় একজন সাসপেক্ট।" প্রমথ বলল।

"শিওর স্যার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, হি লুকস টু মাচ লাইক এ সাসপেক্ট।"

"তার মানে?"

"ভেবে দেখুন স্যার, অবিনাশবাবু যদি সত্যই খুন করতে চাইতেন, তা হলে এইভাবে লুকিয়ে এসে কোনো অ্যালিবাই ছাড়া খুন করা এবং তারপর হঠাৎ উদয় হওয়াটা মোটেই স্মার্ট মুভ নয়। "

"তা ঠিক, কিন্ত এও হতে পারে যে, ডিটেকটিভরা ঠিক আপনার মতোই ভাববে বলে অবিনাশ প্ল্যান করে এটা করেছিল?"

"আপনার সঙ্গে স্যার কথায় পেরে ওঠা মুশকিল। না, মেনে নিচ্ছি যে, অবিনাশবাবুকে আমরা বাদ দিতে পারি না। "

"হাউ অ্যাবাউট স্যাম ওয়াকার?" আমি প্রশ্ন তুললাম, যদিও আমার মন বলছিল লোকটা মোটেও ক্রিমিনাল টাইপের নয়।

"পসিবল," প্রমথ বলল, "ও হয়তো অবিনাশের পার্টনার ইন দ্য ক্রাইম।"

"ভালো কথা," আমি একেনবাবুকে বললাম, "আপনি মিস্টার প্যাটেলের ডায়েরিটা পড়েছেন?"

"ভালো করে নয় স্যার, তবে পাতা উলটেছি।"

"একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখলাম, শুক্রবারের সমস্ত এনট্রি ডায়েরি থেকে ছেঁড়া।"

"এক্সেলেন্ট অবজারভেশন স্যার। সেটা একটু অনুসন্ধান করার জন্য একবার কুইন্সে যাওয়া দরকার।"

"কুইন্সে?" আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"জাস্ট এ হাঞ্চ স্যার। ডায়েরির মধ্যে একটা পার্কিংয়ের টিকিট পেয়েছিলাম। সেটার উপরে পিঙ্ক এলিফ্যান্ট রেস্টুরেন্টের ছাপ, আর যে ডেটটা স্ট্যাম্প করা — সেটা হল

ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৯০, অর্থাৎ শুক্রবার। আমি আজ নিউ ইয়র্ক সিটির টেলিফোন গাইড থেকে দেখলাম, রেষ্টুরেন্টটা হচ্ছে কুইন্সে।"

"ওয়েট এ মিনিট, টিকিট তো পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করার সময় জমা দিতে হয়, সেটা ডায়েরির মধ্যে এল কী করে?"

একেনবাবুকে একটু হতভম্ব দেখে আমি পার্কিং ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা এক্সপ্লেইন করলাম। প্রাইভেট পার্কিং কোম্পানির সঙ্গে রেস্টুরেন্টের অনেক সময় ডিল থাকে খরিদ্দারদের কাছ থেকে কম পার্কিং ফি নেবার জন্য। সেইজন্যই বিল পে করার সময় ক্যাশিয়ারকে পার্কিং টিকিটটা দিলে সে তার ওপর রেস্টুরেন্টের ছাপ মেরে দেয়। পার্কিং অ্যাটেনডেন্ট সেই ছাপ দেখলে ডিসকাউন্ট দেয়। কিন্তু টিকিটটা পার্কিং অ্যাটেনডেন্টকেই জমা দিতে হয় — ওদের হিসাব রাখার জন্য।

"তাই নাকি স্যার! তাহলে তো আরও ওখানে যাওয়া দরকার।"

"কখন যেতে চান?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"শুভস্য শীঘ্রম স্যার। এখন যাওয়া যায় না?"

"অন্ধকার হয়ে আসছে, এখন যাবেন? কুইন্স এমনিতে খুব আনসেফ নয়, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আছে," আমি চিন্তিত ভাবেই বললাম।

"আজ যাওয়াই ভালো স্যার। কারণ আজও শুক্রবার, উই মে গেট সাম ক্লু কেন ডায়েরির পাতাগুলো ছেঁড়া হয়েছিল।"

প্রমথ বলল, "ইশশ, আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে! কিন্ত একবার ল্যাবে না গেলেই নয়। আর ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যেতে পারে।"

"তাহলে তো মুশকিল স্যার।"

"ঠিক আছে, আমি যেতে পারি," আমি বললাম।

।। ১৩।।

ফোনে ডিরেকশনটা নিয়ে নিয়েছিলাম। লাল-নীল লাইট দিয়ে 'পিঙ্ক এলিফ্যান্ট' নামটা নাকি বড় করে লেখা থাকবে — দূর থেকেই দেখা যাবে।

কুইন্স বুলেভার্ড দিয়ে জামাইকা অ্যাভিনিউয়ে বাঁ দিকে ঘুরে অল্প একটু এগিয়ে হান্ড্রেড ফর্টিএইট্থ স্ট্রিটের ডানদিকে। তারপর অনেকটা পথ পার হয়ে কয়েকবার ডানদিক বাঁদিক করার পর একটা সরু রাস্তায় ঢুকতেই সাইনটা দেখতে পেলাম। এই অঞ্চলের সব বাড়িগুলোরই জরাজীর্ণ অবস্থা। 'পিঙ্ক এলিফ্যান্ট' একটা চারতলা বাড়ির নীচের তলায়। পাশেই একটা পার্কিং লট। সেখানে গাড়ি পার্ক করে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

রেস্টুরেন্টের ইন্টিরিয়র যে ডেকোরেট করেছে সে রঙের খেলায় বিশ্বাসী। দেওয়ালের রঙ শকিং পিঙ্ক। সেটা না হয় মানা গেল — নামকরণের সার্থকতা তো রাখতে হবে। কিন্তু চেয়ারের গদিগুলো কি উৎকট লাল-নীল-হলুদ ফুলকাটা না হলে চলত না! টেবিল ক্লথগুলোও নানান রঙের — একটা আরেকটাকে টেক্কা দিচ্ছে। যাক সে কথা। রেস্টুরেন্টে ভিড় তেমন নেই। আজ শুক্রবার — ভিড়টা রাতের দিকেই মনে হয় বেশি হবে। ওয়েটার

আমাদের একটা টেবিলে বসাতে নিয়ে যাচ্ছিল, একেনবাবু তাকে থামিয়ে ম্যানেজারের খোঁজ করলেন।

দোকানের ম্যানেজার পোর্টারিকান, ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলে। নিজের পরিচয় দিল গঞ্জালেস বলে। একেনবাবু পকেট থেকে যেটা বার করলেন সেটা আমি দেখব ভাবিনি! মিস্টার প্যাটেলের বেডরুমে যে ফটোটা দেখেছিলাম সেটা! সেদিন কখন ওটা পকেটে পুরেছিলেন, খেয়ালও করিনি। ছবিটা দেখিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন যে, ওঁকে কেউ রেস্টুরেন্টে কোনোদিন দেখেছে কিনা।

গঞ্জালেস সতর্ক লোক। জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

আমি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। এমন কী একেনবাবুকে বলেও ছিলাম যে, সম্ভবত আমাদের কেউ কিছু বলবে না। একেনবাবু দেখলাম মোটেও দমলেন না।

বললেন, "গুড কোয়েশ্চন স্যার। আমি হচ্ছি ইনসিওরেন্স ইনভেস্টিগেটর, স্টোলেন প্রপার্টি নিয়ে ইনভেস্টিগেট করছি।"

একেনবাবুর গুলটা শুনে আমি অবাক। গঞ্জালেসও দেখলাম কেমন জানি কথাটা মেনে নিল। এমন সময় একটা খরিদ্দার এল বিল পে করতে। পয়সা গুনে ক্যাশ রেজিস্টারে রাখতে রাখতে গঞ্জালেস কোনোদিকে না তাকিয়েই বলল,

"হ্যাঁ, একে আমি দেখেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে একেনবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন, "ওঁর সঙ্গে আর কেউ আসতেন কি?"

"থ্যাঙ্ক ইউ এন্ড কাম এগেন," খরিদ্দারের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে একেনবাবুর চোখে চোখ রাখল গঞ্জালেস, "ম্যান, ইউ আস্ক টু মেনি কোয়েশ্চেনস!"

"ট্রুলি সরি স্যার," একেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "কিন্তু এই ভদ্রলোক দু'দিন আগেই খুন হয়েছেন। এই চুরির ব্যাপারটা আমি পুলিশ নাক গলাবার আগেই চুকিয়ে ফেলতে চাই।"

পুলিশের কথায় মনে হল একটু কাজ হল। গঞ্জালেস কয়েক মুহূর্ত কিছু একটা ভাবল। তারপর একটা লোককে হাতছানি দিয়ে ডেকে স্প্যানিশে কিছু একটা বলে, আমাদের বলল, "ফলো মি।"

আমি লোকটার মতিগতি খুব একটা আঁচ করতে পারছিলাম না। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, বিশ্বশ্রী টাইপের চেহারা। আমাকে আর একেনবাবুকে একহাতেই লোফালুফি করার ক্ষমতা রাখে! একেনবাবুকে দেখলাম গুটিগুটি পেছন পেছন চলছেন।

আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, "আসুন স্যার, ফলো করতে বলল তো!"

আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি, ঈশ্বর করুন, একেনবাবু যেন একজন ক্যারাটে এক্সপার্ট হন। গঞ্জালেস ব্যাটা গলিতে নিয়ে গিয়ে অ্যাটাক করলে নিমেষে কাবু করে দিতে পারেন!

দু'টো বাড়ির মাঝখানের সরু প্যাসেজ দিয়ে গঞ্জালেস যেখানে আমাদের নিয়ে এল, সেটা একটা ছোট্ট অফিস ঘর। ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল, কয়েকটা পুরোনো রেক্সিন মোড়া চেয়ার, আর একটা ভাঙাচোরা ফাইল ক্যাবিনেট! দেওয়ালটা অসম্ভব নোংরা, তবে তার বেশির ভাগই ফটো দিয়ে ঢাকা। নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বেসবল প্লেয়ারের সঙ্গে তোলা গঞ্জালেসের ছবি চতুর্দিকে ঝুলছে! লোকটা নিঃসন্দেহে বেসবল ফ্যান।

আমাদের চেয়ারে বসতে বলে গঞ্জালেস একটা চুরুট ধরালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ ওয়ান্ট টু নো?"

"আপনি এই লোকটা বা তার সঙ্গীদের সম্পর্কে যা জানেন তাই কাজে লাগবে।"

কথাটা শুনে গঞ্জালেস চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "ইউ নো, আই ডোন্ট লাইক ইউ।"

খেয়েছে রে! আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। একেনবাবুও দেখলাম বেশ থতমত খেয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা কিছু বলার আগেই গঞ্জালেস নিজেই আবার বলল, "বাট আই উইল টক, আই হ্যাভ নাথিং টু হাইড।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

"ছবিটা আর একবার দেখি।"

একেনবাবু ছবিটা বের করে দিলেন।

"ইয়েস, ঠিকই বলেছি আমি। এই লোকটা প্রত্যেক ফ্রাইডেতে আসত ওর কয়েকটা বন্ধুকে নিয়ে। সন্ধ্যা থেকে প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলত আর গল্পগুজব করত। তারপর ফিরে যেত, ব্যস। বাট আই অ্যাম টেলিং ইউ –নো মানি এক্সচেঞ্জ, নো গ্যাম্বলিং — ওসব এ রেস্টুরেন্টে চলে না।"

শেষের কথাটা না বললেও চলত। বুঝলাম লোকটা ঝামেলা এড়াতে চায়।

একেনবাবু বললেন, "আপনি আসতেন বললেন, লাস্ট ফ্রাইডেতে এসেছিলেন?"

"না, লাস্ট ফ্রাইডেতে আসেনি। দু'-সপ্তাহ আগে ওদের টেবিলে এত অসম্ভব চ্যাঁচামেচি আরম্ভ হয় যে, অন্যান্য খদ্দেররা কমপ্লেন করতে আরম্ভ করে। ওদের রেগুলার ওয়েটার ছিল জো। আমি জোকে বলি ওদের চুপ করতে বলতে। জো গিয়ে সেটা বলতেই একটা ইন্ডিয়ান জো-র কলার ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে।

আমি তখন ওদের সবাইকে চলে যেতে বলি। আমার সোজা কথা, ইউ ক্যান হ্যাভ ফান, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ বদার নো বডি। এনিথিং এলস?"

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ স্যার। শুধু আর একটু ট্রাবল দেব। আপনি কি জোকে একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন? ওনলি ফর এ ফিউ মিনিটস?"

"অলরাইট, কিন্ত বেশিক্ষণ নয়। আমি শর্ট হ্যান্ডেড। দুটো ওয়েটার আজ আসেনি!"

গঞ্জালেস আমাদের বসিয়ে রেখে চলে যাবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জো এল। বছর পঁচিশেক বয়স, ব্ল্যাক আমেরিক্যান। আমেরিকানদের তুলনায় ছোটোখাটো চেহারা — আমাদেরই সাইজ। ছেলেটা কথা বলতে খুব ভালবাসে। কিরিট প্যাটেলের ফটোটা দেখামাত্রই ও চিনতে পারল। জো-র কাছ থেকে মোটামুটি এটুকু জানা গেল, কিরিট প্যাটেলের সঙ্গে আরও জনা চারেক ছিল রেস্টুরেন্টের রেগুলার খদ্দের।

এছাড়া কিছু কিছু লোক মাঝে মধ্যে ওদের সঙ্গে এসে বসত। রেগুলারদের সঙ্গে একজন ছিল সিড, জো-র খুব ফেভারিট। শুধু ভাল টিপস্ দেওয়া নয়, জো-র সঙ্গে অনেক গল্পগুজব সে করত। শেষ দিনের ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল তাস খেলার পরে। দলের সবাই তখন চলে গেছে, কেবল তিনজন বাদে। সিড ছাড়া আর যে দু'জন ছিল, তারা রেগুলার না হলেও বেশ কয়েকবার জো তাদের দেখেছে। তাদের মধ্যে একজন আবার সেদিন খেলার হিসেব রাখছিল। ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে জো বুঝতে পারছিল। এমন সময় জো শুনতে পেল সিড বলছে, 'এটা একটা ডিলই নয়, আই ডিড অল দ্য ওয়ার্ক।' আরেকজনের গলা, 'বাট আইডিয়া ওয়াজ মাইন।' এর পরের কিছু কথাবার্তা জো শুনতে পায়নি। কিন্তু তারপর আবার সিডের একটা কথা কানে ভেসে আসে, 'আই হ্যাভ অ্যানাদার ইন্টারেস্টেড পার্টি। কার্ট হ্যাজ অলরেডি মেড মি অ্যান অফার।' 'আই ওয়ার্ন ইউ' অন্য দু'জনের একজন বলে, 'ডোন্ট গেট এনি থার্ড পার্টি ইনভলভড।'

এমন সময় আবার ব্যান্ড বাজতে শুরু হওয়াতে জো আর কিছু শুনতে পায়নি। এর একটু পরেই ম্যানেজার ওকে পাঠায় সবাইকে চুপ করাতে। জো গিয়ে দেখে, যে লোকটা খেলার হিসেব রাখছিল, সে সিডকে খুব শাসাচ্ছে। জো তাকে চুপ করতে বলায় আরএকজন যে ছিল, সে জো-র কলার চেপে বলে, 'ডোন্ট ইউ এভার টক টু আওয়ার বস লাইক দাট!' তখন ম্যানেজার এসে পুলিশের ভয় দেখাতেই সবাই হাওয়া হয়।

কিন্তু এর পর যে দুটো জিনিস জো-র কাছ থেকে পেলাম, সেটা খুব অপ্রত্যাশিত। প্রথমটা ছিল শেষ দিনে তাস খেলার পয়েন্টের হিসেব। ওটা পড়ে আছে দেখে জো তুলে রেখেছিল। ব্রিজ খেলার স্কোর আর তার নীচে চারটে নাম লেখা। সিড আর কার্টের পাশে চারটে প্লাস, কে.জি.আর জি -র পেছনে কিছু নেই। কিন্তু কাগজটা তার থেকে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। রিং বাইন্ডার থেকে ছেঁড়া কাগজ। ওপরে ইংরাজিতে লেখা, ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৮৯। দেখেই বুঝলাম এটা মিস্টার প্যাটেলের ডায়েরি থেকে নেওয়া কাগজ।

দ্বিতীয় প্রাপ্তি হল, জো-র ফেভারিট কাস্টমার, সিডের সঙ্গে তোলা জো-র একটা ফটো। ক্রিসমাসের ক'দিন আগে পার্টির সময় আর একজন ওয়েটার ফটোটা তুলেছিল। আজ শুক্রবার, তাই জো সঙ্গে করে এ দুটো জিনিস নিয়ে এসেছিল — ওরা যদি আসে, তাহলে দেবে বলে। সিডের মুখটা মনে হল চেনা চেনা, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

একেনবাবু জো-কে বস আর তার সঙ্গীর চেহারাটা বর্ণনা করতে বললেন। দু'জনেই নাকি বেঁটে আর মোটা। ওদের মধ্যে বসের খুব লম্বা চুল। আর দু'জনেই খুব ডার্ক। আমেরিকানরা অবশ্য আমাদের রঙের তফাত অনেক সময়েই বুঝতে পারে না। আমি জো-কে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, "বল তো আমাদের মধ্যে কে বেশি ফর্সা?" জো-র মতে আমরা দু'জনেই খুব কালো। অথচ একেনবাবু ফর্সা না হলেও, আমি ওঁর থেকে অন্তত দু'পোঁচ কালো!

অফিসঘর থেকে বেরোনোর মুখে নজর পড়ল, একটা ক্যাকটাস গাছ। ঢোকার মুখে কেন খেয়াল হয়নি জানি না। বেশ বড় লাল রাংতা জড়ানো একটা চিনেমাটির পটে বালি আর পাথরের ওপর গাছটাকে ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। আরও বেশি করে ওটা নজরে পড়ল, কারণ অফিসের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে গাছটা একটু বেমানান। আমরা দুজনেই গাছটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে জো বলল যে, গাছটা সিড সেদিন নিয়ে এসেছিল। কারোর জন্য বার্থ ডে গিফট, যাকে দেবার কথা ছিল সে আসেনি। নেক্সট উইকে যখন আসবে তাকে দেবে। এ ক'দিন জো ওটা রেস্টুরেন্টে রেখে দিলে ওটাকে আবার বয়ে নিয়ে আসতে হবে না। সেটাকেই জো অফিসে এনে রেখেছে। একেনবাবু বাংলায় আমাকে বললেন, ভারি চমৎকার গাছটা স্যার। চুরি করতে ইচ্ছে করছে! চুরি করার মতই বটে। প্রমথর খুব গর্ব ওর ক্যাকটাস নিয়ে, কিন্তু সেটা এর কাছে দাঁড়ায় না।

গাড়িতে উঠে আমি বললাম, "আপনি ব্রিজ শাহকে দেখেননি। লোকটার লম্বা লম্বা চুল, জো-র বর্ণনার সঙ্গে দিব্যি মিলে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি!"

একেনবাবু একটু অন্যমনস্ক। দেখলাম মন দিয়ে তাস খেলার স্কোরের কাগজটা দেখছেন।

"কী দেখছেন?"

"টাকা এক্সচেঞ্জ এখানে হয়তো হতো না, কিন্তু বাজি ধরেই খেলা হত।"

"ওই প্লাস সাইনগুলো দেখে বলছেন?"

"রাইট। মনে হচ্ছে ওগুলো থেকে পরে হিসেব করে টাকার লেনদেন হত। এই 'বস' -ই ছিল ব্যাঙ্কার।"

"সেই জন্যই কি শুক্রবারের পাতাগুলো মিসিং?"

"পসিবল স্যার। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ডায়েরিতে ফেব্রুয়ারি ১৬ তারিখের পাতাটা থাকা উচিত।"

"দেখতে হবে — যদি না জুয়োর আসরটা অন্য কোথাও বসে থাকে।"

একেনবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। এবার মনে হল উনি একটু চিন্তিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল, কী ভাবছেন?"

"নাঃ," একেনবাবু বললেন। "ব্যাপারটা বেশ ঘোরতর বলে মনে হচ্ছে স্যার।"

"কেন বলুন তো?"

একেনবাবু পকেট থেকে মিস্টার প্যাটেলের মেলবাক্স থেকে পাওয়া চিঠিটা বার করলেন। তারপর হিসেবের কাগজটা পাশাপাশি রাখলেন।

"অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ৩০৪-এ ৪-এর শুঁড়টা লক্ষ্য করুন স্যার, আর এই কাগজে লেখা ৪-গুলোর। খুব আনইউসুয়াল, আর হুবহু এক ধরনের — তাই না?"

"তার মানে তো ওই 'বস'- ই চিঠিটা লিখেছে," আমি বললাম। "তাহলে আমাদের কাজ, জো-র ফেভারিট কাস্টমার সিডকে খুঁজে বার করা।"

"সেটাই সমস্যা স্যার। সিডের ছবিটা আমি গত সপ্তাহে 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রড'-এ দেখেছি। লোকটা সহদেব ভারওয়ানি, সেই অ্যান্টিক ডিলার, যে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।"

।। ১৪।।

একেনবাবু ক'দিন হল সাতসকালে বেরোচ্ছেন বাড়ি থেকে, আর ফিরছেন সেই রাত করে। কারণ জানতে গিয়ে 'গভরমেন্টের চাকরি নচ্ছার স্যার,' এটুকু ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারিনি। সুতরাং ওঁর দিক থেকে তদন্তের কাজ কতটুকু এগোচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। এটুকু শুধু জানি, উনি এর মধ্যে ব্রিজ শাহকে একবার ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রিজ শাহ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি ব্যস্ত ছিলেন বলে। পরে অবশ্য ব্রিজ শাহ কল রিটার্ন করেছিলেন। একেনবাবু তাতে খুব ইমপ্রেসড। 'কথার দাম আছে বটে মিস্টার শাহ'র, প্রমথকে বলেছিলেন উনি। কিন্তু ইনফরমেশন বিশেষ কিছু পাননি। আর একটা ইন্টারেস্টিং খবর হল, কিরিট প্যাটেল ওঁর বন্ধু মহলে কার্ট নামে পরিচিত।

এখন বোধহয় একটা থিওরি খাড়া করা যায়। পিঙ্ক এলিফ্যান্টের জো যে কার্টের কথা উল্লেখ করেছিল, খুব সম্ভবত তিনিই হলেন কিরিট প্যাটেল। তাহলে কিরিট প্যাটেল যাকে মুনস্টোনটা বিক্রি করেছিলেন, সেই কি সিড অর্থাৎ সহদেব ভারওয়ানি? পরে আবার সেটাকেই সহদেবের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টা করছিলেন? এদিকে আবার 'বস'-ও ওটা কিনতে চেয়েছিল, আর সহদেব চেষ্টা করছিল কার থেকে বেশি পাওয়া যায়... শেষে সম্ভবত কিরিট প্যাটেলকেই মুনস্টোনটা বিক্রি করে। ফলে 'বস' যায় ক্ষেপে! কিন্ত

সেক্ষেত্রে জো যে কথাটা শুনেছে 'ইট ওয়াজ মাই আইডিয়া' — সেটার অর্থ কী? তাছাড়া টাইম স্কেলেও ঘটনাটা ফিট করে না। স্যাম ওয়াকার নাটালের ডিলারের ফোন পেয়েছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে। অবশ্য স্যাম যে সত্যি কথা বলছেন, তার কোনো মানে নেই। ইনফ্যাক্ট গত পরশু প্রমথ একটা দুর্দান্ত খবর এনেছে, যেটা শুনে একেনবাবু একেবারে সারপ্রাইজড।

প্রমথর ডিপার্টমেন্টে পোস্ট ডক করে তানজানিয়ার একটি ছেলে, ভিক্টর ডিসুজা। সে মিস্টার প্যাটেলের অনেক পুরোনো খবর জানে। মিস্টার প্যাটেল নাকি দশ বছর আগে তানজানিয়ায় থাকতেন। সেখানে ডেরিক ওয়াকার নামে এক মুনস্টোন মার্চেন্টের অ্যাসিট্যান্ট ছিলেন। কাজের সূত্রে ডেরিক ওয়াকার আর মিস্টার প্যাটেল একবার সাউথ আফ্রিকাতে যান। ফেরার পথে কালাহারি মরুভূমির পাশে ছোট একটা শহরে ডেরিকের মৃত্যু ঘটে রহস্যজনক ভাবে। বোৎসোয়ানার পুলিশ সন্দেহ করেছিল যে, মিস্টার প্যাটেলের এ ব্যাপারে কোনো হাত আছে। ওঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রমাণাভাবে উনি ছাড়া পান। স্বামীর মৃত্যুর পর ডেরিকের স্ত্রী প্রায় পাগলের মতো হয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁর বাবা এসে মেয়ে ও নাতিকে নিজের বাড়ি নিয়ে যান। ডেরিকের স্ত্রীর বাবা ছিলেন আফ্রিকার এক ট্রাইবাল চিফ। তাঁর ভয়ে মিস্টার প্যাটেল আফ্রিকা থেকে পালিয়ে আসেন।

গল্পটা শুনে প্রমথ ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করেছিল, ডেরিক ওয়াকারের স্ত্রী জাম্বিয়ার মেয়ে কিনা। ভিক্টর শুনে অবাক! বলেছিল, "রাইট। কিন্তু তুমি কী করে জানলে?"

"জাস্ট এ লাকি গেস," প্রমথ উত্তর দিয়েছিল।

মোট কথা থিংস আর লুকিং ভেরি সিরিয়াস। তার ওপর আমাদের শখের গোয়েন্দাগিরি-র খবরটাও মনে হচ্ছে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমার ধারণা সেটা প্রমথর দৌলতে। পেটে যদি একটা কথাও রাখতে পারে! গতকাল প্রমথ একটা চিঠি পেয়েছে, যেখানে লেখা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন কুড বি হ্যাজার্ডাস টু ইওর হেলথ!

চিঠিটা সম্ভবত জোক, কিন্তু সিরিয়াসও তো হতে পারে।

শনিবার সকালে একটু স্কুলে যেতে হয়েছিল। সেখানেই বসে বসে এইসব ভাবছিলাম। ভাবতে -ভাবতে কী হল জানি না, আমি হঠাৎ অন্য এক লাইনে চিন্তা শুরু করলাম! কিন্তু সেটা লেখার আগে একটা কথা বলে নিই। স্যাম ওয়াকারের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে কিন্তু মুনস্টোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা খটকা ছিল। একেনবাবুর কৃতিত্বটাকে আমি খাটো করছি না। কিরিট প্যাটেলকে লেখা চিঠিতে 'মুনস্টোন' কথাটা খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে একটা ব্রিলিয়ান্ট অবজারভেশন। কিন্তু চিঠির সেকেন্ড লাইন 'Sounds music to my ear' কথাটার কী অর্থ? একেনবাবু যে সিস্টেম ব্যবহার করে লাইন 'Mary owns one nice stone' থেকে মুনস্টোন শব্দটা আবিষ্কার করেছেন, সেই সিস্টেম, অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর তুলে সাজালে দ্বিতীয় লাইন থেকে পাওয়া যায় SMTME! কথাটার কোনও অর্থই হয় না! আমি অবশ্য নিজেও দ্বিতীয় লাইনটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, এবং বিভিন্ন সম্ভবনা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেছি। যেমন চিন্তা করেছি, Sounds কথাটায় ছ'টা অক্ষর। ইংরেজি অ্যালফাবেটের ষষ্ঠ অক্ষর হল, F... music- এ হচ্ছে পাঁচটা অক্ষর। অ্যালফাবেটের পঞ্চম অক্ষর হল, E... একই ভাবে to হবে, B... অর্থাৎ sounds music to কথাটা দিয়ে বোধহয় বোঝানো হচ্ছে FEB বা ফেব্রুয়ারি মাস! my আর ear- এ অক্ষরের সংখ্যা হচ্ছে, ২ আর ৩। পাশাপাশি সাজালে ২৩। পুরো লাইনটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি! তার মানে কি — মুনস্টোনটা

তেইশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে চাই, অন্যথায় মৃত্যু?

এই ইন্টারপ্রেটেশনে অববিয়াসলি ভুল আছে, কারণ মিস্টার প্যাটেল তেইশে ফেব্রুয়ারির বেশ কয়েকদিন আগেই মারা গেছেন। সুতরাং দ্বিতীয় লাইনটা কখনই ঠিক নয়। আর ফ্র্যাঙ্কলি, এ ধরনের হেঁয়ালি করে চিঠি দেবার অর্থই বা কী? হয়তো চিঠিটা একটা প্র্যাক্টিকাল জোক। 'মুনস্টোন' কথাটা আবিষ্কার হয়ে যাওয়াটা একেবারেই ফ্লুক। স্যাম ওয়াকার পিকচারে আসায় মুনস্টোনের অস্তিত্বটা অবশ্য এখন প্রমাণিত হয়েছে। এবং এটাও ঠিক, চিঠির প্রত্যেক লাইনই যে অর্থবহ হতে হবে — তার কোনো মানে নেই। একেনবাবু কুড ভেরি ওয়েল বি রাইট অন দ্য টার্গেট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হু ইজ দ্য মার্ডারার? এসব যেমন ভেবেছি, আবার এ ও ভেবেছি, সত্যি সত্যিই কি কেউ কিরিট প্যাটেলকে খুন করেছে? একেনবাবু অবশ্য বলেছেন, মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুটা সুইসাইড নয়, মার্ডার। কিন্তু নিউ ইয়র্ক পুলিশ কেন সেটা মনে করছে না? এটা কী সম্ভব যে, একেনবাবুর লজিকের মধ্যে কোন ফাঁক আছে?

আমি এ ক'দিন ধরে যা যা ঘটেছে সবটাই আবার তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খুব ক্রিটিক্যালি স্টাডি করেও আমি একেনবাবুর অ্যানালিসিসে কোনো খুঁত খুঁজে পেলাম না। আর তখনই আমি নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যানালিসিস শুরু করলাম। হয়তো চিঠিতে যেটা উল্লেখ হয়েছে সেটা মুনস্টোনই নয়। ভাল মুনস্টোনের দাম পাঁচ –দশ হাজার ডলার নিশ্চয় হতে পারে, কিন্তু সেটা এমন কিছু অমূল্য বস্তু নয় যার জন্য কাউকে খুন করার প্রয়োজন হবে। আর খুন করেই বা কী লাভ হল? উনি নিশ্চয় সেটা পকেটে করে নিয়ে ঘুরছিলেন না! ভেবে দেখতে গেলে চিঠিতে মুনস্টোন কথাটা কোথাও বলা হয়নি, বলা হয়েছে মেরির স্টোন। এর সঙ্গে ডেরিক ওয়াকারের কোনো যোগ থাকতে পারে কী? ডেরিকের স্ত্রীর নাম কী ছিল?... মেরি? কিরিট প্যাটেল ডেরিককে হত্যা করে যে মহামূল্য স্টোনটি আত্মসাৎ করেছিলেন সেটা সম্ভবত ছিল আফ্রিকার মহামূল্য কোনো পাথর! সেক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন, ডেরিকের পুত্র স্যাম ওয়াকার কি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন?

ভাবলাম প্রমথকে ফোন করে আমার কনক্লুশনটা বলি। কিন্তু ওকে পেলাম না।

।। ১৫ ।।

বাড়ি ফিরে দেখি প্রমথ মহা উৎসাহে ব্রাঞ্চের আয়োজন করছে। ব্রাঞ্চ মানে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একসঙ্গে। ছুটির দিনে সেটাই আমরা অনেক সময় করি। ওকে আমার অ্যানালিসিসের কথাটা বলতেই হেসে উড়িয়ে দিল। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করতে যাব, তখনই একটা ফোন। ফোন করেছেন শৈলেন সাঁপুই। জিজ্ঞেস করলেন, একেনবাবু পলা যোগাড় করতে পেরেছেন কিনা।

আমি বললাম, "যদ্দুর জানি, না।"

শৈলেন সাঁপুই জানালেন যে, ওঁর হাতে কিছু পলা এসেছে। উনি তার একটা একেনবাবুকে দিতে পারেন।

আমি বললাম সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু দামটা কীরকম পড়বে সেটা যদি বলেন,

তাহলে একেনবাবুকে জানিয়ে রাখব।”

শৈলেন সাঁপুই ওদিক থেকে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। “খেপেছেন নাকি! ভারি একটা পলা আপনার বন্ধুকে দেব, দামের কোনো প্রশ্নই নেই।”

শুধু দান করা নয়, তার ওপর বললেন যে, আমরা বাড়ি থাকলে পলাটা আজ রাত্রেই আমাদের বাড়িতে দিয়ে যেতে পারেন। আসলে শৈলেন সাঁপুই বিকেলে কোনো কাজে এদিকে আসছিলেন। সেই জন্যই অফারটা করলেন।

আমি ওঁকে ডিনার খেয়ে যেতে বললাম। উনি প্রথমে কিন্তু কিন্তু করছিলেন। আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যেই একেনবাবু উদয় হয়েছেন। ওঁকে শৈলেন সাঁপুইয়ের খবরটা দিলাম।

“কী আশ্চর্য স্যার!” একেনবাবু বললেন।

“কেন বলুন তো?”

“আজ সকালে হঠাৎ খেয়াল হল, ওঁর পেনটা আমি সেদিন ভুলে নিয়ে এসেছি। আসলে দেশে চিঠি লিখতে বসেছিলাম। পকেট থেকে পেন বার করতে গিয়ে দেখি ক্রস পেন। তখনই মনে পড়ল পেনটা ওর কাছ থেকে নিয়েছিলাম গয়নার দোকানের ঠিকানা লেখার জন্য। ফেরত দিতে ভুলে গেছি।”

“তা হলে সেই খোঁজেই আসছেন,” প্রমথ বলল। “আপনি দামি একটা ক্রস পেন এত সহজে হজম করে ফেলবেন ভেবেছেন!”

“আরে ছি ছি স্যার, কী যে বলেন!” একেনবাবু লজ্জা পেলেন।

তারপর বললেন, “তবে যাই বলুন স্যার, আমাদের দেশের তিন টাকার ডট পেন কিন্তু এর থেকে কিছুমাত্র খারাপ নয়। রাত্রে স্যার চিঠি লিখব কি — আদ্ধেক লেখাই পড়ছে না!”

“মিস্টার সাঁপুই তো দিব্যি লিখলেন সেদিন,” আমি বললাম।

“তা লিখেছিলেন, কিন্তু পুরো জায়গায় কালি পড়েনি। সংখ্যাটা শুধু পড়া যাচ্ছিল।”

“সেটা পেনের দোষ নয়, ইঙ্ক ড্রাই হয়ে গেছে।” আমি বললাম।

“ওসব স্যার আমেরিকাকে সাপোর্ট করবার জন্য আপনাদের অজুহাত।” কথাটা বলেই একেনবাবু, “খোল খোল দ্বার... ” সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কিচেন ক্যাবিনেট খুলে আচারের খোঁজ শুরু করলেন।

“আপনার মনটা খুব প্রফুল্ল দেখছি আজ,” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“এটা স্যার ঠিক বলেছেন। কাল মিস্টার দোশির সঙ্গে ব্রুস স্প্রিংস্টিনের রক কনসার্ট শুনতে গিয়েছিলাম। দুর্দান্ত মিউজিক স্যার। আর সেখানে বসে বসেই অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেল।”

“মিউজিক শুনতে শুনতে?”আমি ঠাট্টা করলাম।

“মিউজিককে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না স্যার। তানসেন মিউজিক দিয়ে আগুন ধরাতে পারতেন, আমি তো শুধু খুনি ধরছি।”

“সে কী মশাই আপনি ধরে ফেলেছেন কে খুনি?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“পুরোপুরি নয় স্যার। একটু একটু করে এগোচ্ছি। রাত্রে গান শোনার সময় একটু এগোলাম। এখন আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হয়তো আরেকটু এগিয়ে যাব।”

“আপনার ওই হেঁয়ালিগুলো রাখুন,” প্রমথ এবার বিরক্ত হয়ে বলল। কাকে সন্দেহ করছেন?

“দোহাই স্যার, আমাকে চাপ দেবেন না। ফাইন পয়েন্টগুলো এখনো ট্রাবল দিচ্ছে।

ভাল কথা আপনি একটা কাজ করতে পারেন?”

“কী কাজ?”

“আপনি অবিনাশবাবু, ব্রিজ শাহ, আর স্যাম ওয়াকারকে আজ ডিনার খেতে ডাকুন। মিস্টার সাঁপুই আসছেন ভাল হয়েছে, ওঁকেও আমার একটু দরকার। আপনি আর বাপিবাবু তো আছেনই।”

“সেরেছে, আপনি কি এরকুল পোয়ারো সাজবেন নাকি!” আমি বললাম।

“আরে ছি ছি স্যার, কার সঙ্গে কার তুলনা।”

“যাই করুন, আমাদের কিন্তু ডোবাবেন না। বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করেছি বলে এরা মানহানির মোকদ্দমা লাগিয়ে দিতে পারে।”

“বিশেষ করে অবিনাশ,” প্রমথ যোগ করল।

প্রমথ চাইলে ক্যান ডু ওয়ান্ডার! কী করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করল, এবং শুধু যোগাযোগ করা নয়, তাদের কী বুঝিয়ে অন্য সব কাজ ফেলে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে আসতে রাজি করাল — আই উইল নেভার নো!

যাই হোক, সবাই যখন আসছে, তখন কাজ হচ্ছে ঘরদোরগুলো একটু পরিষ্কার করে ডিনারের ব্যবস্থা করা। একেনবাবুর ইচ্ছে খাওয়া এবং মিটিং দুটোই নীচে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে হোক। আমি একটু আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু একেনবাবুর ঘ্যানঘ্যানানির কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানলাম।

প্রমথ আর একেনবাবু রান্নার ভার নিল, আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল অ্যাপার্টমেন্টটা একটু ভদ্রস্থ করা। এই ডিলে একেনবাবুর সবচেয়ে সুবিধা। প্রমথ কাউকে রান্না করতে দেবে না। একেনবাবু শুধু একটু ফাইফরমাস খাটবেন। আর আমার দায়িত্ব? প্রমথর নোংরা অগোছালো অ্যাপার্টমেন্ট যারা দেখেছে, তারাই বুঝবে কাজটা কী দুরূহ! ঘর গোছাচ্ছি, আর মনে-মনে একেনবাবুর মুন্ডুপাত করছি! এমন নাটকীয় ভাবে সবাইকে ডাকার অর্থটা কী? কী এমন হাতিঘোড়া উনি আবিষ্কার করেছেন ব্রুস স্প্রিংস্টিনের রক কনসার্ট শুনে আর চিঠি লিখতে লিখতে! আমি জানি, প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। মতলববাজ একেনবাবুর পেট থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না!

।। ১৬ ।।

সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি সবাই এসে হাজির। ব্রিজ শাহ এলেন সবার শেষে। একমাত্র উনিই আসবেন কিনা সন্দেহ ছিল, অনেক নাকি কাজের চাপ! তাই বোধহয় সারা মুখে অসন্তোষের ভাব!

প্রমথ একটা দুর্দান্ত ফ্রুট পাঞ্চ বানিয়েছিল। সেটা সার্ভ করার পর বলল, “আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমাদের একেনবাবু কিন্তু মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যু নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু তার রেজাল্টটা আমাদের এখনও বলেননি! আপনারা সবাই এলে নাকি বলবেন! এজন্যই স্পেশালি আপনাদের সবাইকে আজ ডেকেছি।”

ঘোষণাটা শোনা মাত্র সারা ঘর হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। অবিনাশ বলল, “আই ডোন্ট

আন্ডারসট্যান্ড! আঙ্কল সুইসাইড করেছেন — এ নিয়ে আর আলোচনার কী আছে?"

প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল, "কঠিন প্রশ্ন অবিনাশ। তবে সেটার উত্তর আমি দিতে পারব না, কিন্তু একেনবাবু বোধহয় পারবেন।"

অবিনাশ একেনবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতেই উনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন স্যার, এটা যদি সুইসাইডই হয় তা হলে আলোচনার কিছু নেই।"

"তা হলে প্রমথ কথাটা তুলছে কেন?" অবিনাশ একেনবাবুর হেঁয়ালিটা ধরতে না পেরে প্রশ্ন করল।

"কারণ স্যার, আমার ধারণা এটা সুইসাইড নয়।"

ব্রিজ শাহ এতক্ষণ বিরস মুখে পাঞ্চ খাচ্ছিলেন। বিরক্তি না চেপেই বললেন, "নো বডি কেয়ারস হোয়াট ইউ থিঙ্ক মিস্টার সেন! যেটা ম্যাটার করে, সেটা হল পুলিশের কী মত।"

"অতি অবশ্য স্যার," একেনবাবু ঘাড় নাড়লেন। "তবে কিনা পুলিশের মতামত তো সবসময় ঠিক নাও হতে পারে!"

তার মানে আপনার মতটাই সব সময়ে ঠিক!" ব্রিজ শাহর কথায় শ্লেষের ভাবটা সুস্পষ্ট।

"যেতে দিন মিস্টার শাহ," শৈলেন সাঁপুই স্মিত হেসে বললেন। "একেনবাবুর একটু ডিটেকটিভ সাজার শখ হয়েছে, সাজতে দিন না!"

"আমি কিন্তু ব্রিজ আঙ্কলের সঙ্গে একমত," অবিনাশ বলল, "ওঁর কোনও রাইট নেই মনগড়া কতগুলো থিওরি বলে আমাদের সময় নষ্ট করা!"

"দ্যাট্স এগজ্যাক্টলি মাই পয়েন্ট," ব্রিজ শাহ অবিনাশের সাপোর্ট পেয়ে গলাটা আরও চড়িয়ে একেনবাবুকে বললেন, "আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে পুলিশকে বলুন! খামোকা আমাদের সন্ধ্যেটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না!"

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি এমন সিরিয়াস হয়ে যাবে বুঝিনি। আমি খালি ভাবছি, একেনবাবু এখন কী করবেন! একেনবাবু কিন্তু একেবারেই উত্তেজিত হলেন না। খুব শান্ত ভাবে আমাকে আর প্রমথকে বললেন, "আসুন স্যার, ওভেন থেকে খাবার গুলো বার করি, ওঁদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে!"

একেনবাবুকে এরকম পিছপা হতে দেখে তো আমি অবাক! প্রমথও বলল, "সে কি! রেজাল্টটা তাহলে কখন জানব?"

একেনবাবু উদাসীন ভাবে বললেন, "আমার মনে হয় স্যার, মিস্টার প্যাটেল কে নিয়ে আলোচনায় ওদের একটা সমস্যা আছে। জোর করে কি কোনও ফল হবে?"

স্যাম ওয়াকার এসে পর্যন্ত নমস্কার, কেমন আছেন, ইত্যাদি ছাড়া আর একটা কথাও বলেননি। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন "মিস্টার সেন আমার কিন্তু আপনার কথা শুনতে আপত্তি নেই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। কিন্ত মিস্টার শাহ আর অবিনাশবাবুর যে আছে!"

প্রমথ এবার অবিনাশকে চেপে ধরল, "তোমার আপত্তির কারণটা কী অবিনাশ? তোমার কি ভয় পাবার কোনো কারণ আছে?"

অবিনাশ তাতে ভীষণ চটে গেল। "হোয়াট ড্যু ইউ মিন! ভয় পাব কেন, আমি কি খুন করেছি?"

“না করলে এত প্রবল আপত্তির তো কোনো কারণ আমি দেখছি না!”

অবিনাশের মুখ দেখে মনে হল, খুন যদি সত্যিই ওকে করতে হয়, তাহলে প্রমথকেই করবে!

ব্রিজ শাহ বললেন, “অলরাইট, লেট আস গেট ইট ওভার উইথ। আপনার যা বলার বলুন, কিন্তু মেক ইট শর্ট।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।”

আবহাওয়াটা একটু ঠান্ডা হয়েছে দেখে আমি খাবারগুলো আনতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অতিথি সৎকার করার কোনো উপায় আছে, প্রমথ আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল। শুধু তাই নয় নিজেও গ্যাঁট হয়ে বসল, “নিন মশাই, শুরু করুন।”

প্রমথ অনুমতি দিতেই একেনবাবু ঘাড়টা ঘষতে ঘষতে শুরু করলেন,

“আগে কয়েকটা ফ্যাক্ট আপনাদের সামনে রাখছি স্যার। মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর খবর অবিনাশবাবু জেনেছেন শুক্রবার, ‘ইন্ডিয়া অ্যাব্রড’ পড়ে। মিস্টার সাঁপুই জেনেছেন বৃহস্পতিবার, আমাদের কাছ থেকে। মিস্টার ওয়াকারও বৃহস্পতিবার খবরটা জেনেছেন, যদিও প্রমথবাবুর কাছে খবরটা শুনে উনি বিশ্বাস করেননি। আমি আর প্রমথবাবু জেনেছি বুধবার রাত্রে, বাপিবাবু আমাদের আধ ঘন্টা পরে। এখন পর্যন্ত যা বললাম, তাতে কি কোনো ভুল আছে স্যার?”

কেউ যখন প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না, তখন একেনবাবু বললেন, “এটার মানে স্যার, আমি এখনো পর্যন্ত ভুল কিছু বলিনি। শুধু যেটা আমার জানা নেই, মিস্টার শাহ কখন খবরটা পেয়েছিলেন। ”

“আমি জেনেছি বৃহস্পতিবার দুপুরে, পুলিশের কাছ থেকে,” ব্রিজ শাহ গম্ভীর মুখে বললেন।

“তাহলে আপনিও বুধবার নন।”

“দ্যাট্‌স কারেক্ট, কিন্তু আপনার বক্তব্যটা কী?” ব্রিজ শাহ একটু অসহিষ্ণুভাবে বললেন।

“বলতে চাচ্ছি যে স্যার, আমি, প্রমথবাবু, আর বাপিবাবু ছাড়া, আর কেউই এখানে মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর খবর বৃহস্পতিবারের আগে জানতেন না।”

“তাতে সমস্যাটা কী?”

ব্রিজ শাহর প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অবিনাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে একেনবাবু বললেন,“স্যার, প্রমথবাবু আর বাপিবাবুরর মুখে শুনেছি যে আপনি আপনার আঙ্কেলের হয়ে অনেক জায়গায় জিনিস ডেলিভারি করতে গিয়েছিলেন। কথাটা কি ঠিক?”

“হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।”

“কী করে গেলেন আপনি, মানে কীসে চড়ে?”

“একটা গাড়ি ভাড়া করেছিলাম।”

“গাড়িটা কবে ভাড়া নিয়েছিলেন স্যার?”

“বৃহস্পতিবার।”

“বৃহস্পতিবার! মানে আপনার আঙ্কল যেদিন মারা যান, তার পরের দিন?” একেনবাবু যেন বেশ আশ্চর্য!

“হোয়াই ডু ইউ লুক সো সারপ্রাইজড? আমি তখন জানতাম না যে, আঙ্কেল মারা গেছেন।”

“না, তা নয়। কিন্তু আপনি শিওর স্যার যে, বৃহস্পতিবারের পরে, মানে শুক্রবার গাড়ি

ভাড়া নেননি?”

অবিনাশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, “আপনি এরকম সিলি প্রশ্ন করছেন কেন? বৃহস্পতিবার সকালে আমি গাড়ি ভাড়া করে জিনিসগুলো ডেলিভারি করি। ইনফ্যাক্ট সেই গাড়িতেই শুক্রবার মিস্টার ওয়াকারকে সঙ্গে নিয়ে আমি এই বাড়িতে আসি। প্রমথ আর বাপির সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়। এই সিম্পল জিনিসটা আমার মনে থাকবে না!”

“আই সি, তার মানে স্যার, আপনি গাড়ি ভাড়া করেছেন বৃহস্পতিবার, আর শুক্রবারের আগে এখানে আসেননি। অ্যাম আই রাইট?”

“এলে নিশ্চয় বলতাম। এর মধ্যে এত গোলমেলে কী আছে?”

“না, না, স্যার, গোলমালের প্রশ্ন নয়। আই অ্যাম সরি, এবার ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে।”

অবিনাশ দেখলাম ব্রিজ শাহর দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল।

একেনবাবু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে কান চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন স্যার, আমাকে একটু বলবেন, কী ভাবে এদেশে গাড়ি ভাড়া করা যায়?”

অবিনাশ প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, “ডু আই হ্যাভ টু আনসার দিস?”

প্রমথ দেখলাম একটু অস্বস্তি বোধ করছে। আমার তো বাস্তবিকই লজ্জা লাগছে একেনবাবুর আর্গুমেন্টের বহর দেখে! প্রমথই দেখলাম শেষমেষ জবাব দিল, “গাড়ি ভাড়া করা এদেশে খুবই সিম্পল একেনবাবু। দরকার শুধু আপনার ড্রাইভার লাইসেন্স, আর ক্যাশ বা ক্রেডিট কার্ড।”

“ক্যাশ না হয় কোনোমতে যোগাড় করা গেল। কিন্তু ড্রাইভার্স লাইসেন্স ও দেখাতে হয় নাকি?”

“নিশ্চয়, নইলে আপনার হাতে গাড়ি ছেড়ে দেবে কেন!”

“তাহলে তো গাড়ি ভাড়া করাটা খুব সিম্পল নয় স্যার, কারণ লাইসেন্সটা তো লাগবে!”

ব্রিজ শাহ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, “ইজ দ্যাট এ বিগ ডিল?”

“ইট ইজ এ বিগ ডিল স্যার, ভেরি বিগ ডিল। কারণ আমি এখন সত্যিই কনফিউজড!”

“ফর হোয়াট?”

“কারণ স্যার অবিনাশবাবুর লাইসেন্সটা ছিল এই অ্যাপার্টমেন্টে। দেশে যাবার আগে পিক পকেট হবার ভয়ে উনি ওটা এখানে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেটা সমস্যা, সেটা হল স্যার উনি শুক্রবারের আগে এখানে আসেননি। অথচ গাড়ি ভাড়া করেছিলেন বৃহস্পতিবার। এবারে আপনিই বলুন, ব্যাপারটা কি কনফিউজিং নয়?”

ঘরে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। অবিনাশ আমার ঠিক পাশেই বসে। ওর হাতটা এত কাঁপছে যে, গেলাসের ভেতর পাঞ্চটা চলকে চলকে উঠছে! অবিনাশ যে ডাহা মিথ্যে বলেছে, তাতে সন্দেহ নেই!

একেনবাবু এবার অবিনাশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আপনি কিন্তু স্যার কনফিউসনটা রিজলভ করলেন না! আপনি কি এসেছিলেন বুধবার রাত্রে?”

অবিনাশ এবার মুখ খুলল। প্রায় কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ, আমি এসেছিলাম। কিন্তু... কিন্তু আমি আসার আগেই আঙ্কেল মারা গিয়েছিলেন! মিস্টার সেন, বিশ্বাস করুন, ইউ গট টু বি বিলিভ মি!"

একেনবাবু দেখলাম একেবারে নির্বিকার। বললেন, "আপনি কি স্যার একটু বলবেন এগজ্যাক্টলি কী ঘটেছিল?"

অবিনাশ ভীষণ ঘামছে। একটু একটু হাঁপাচ্ছেও। বলল, "আমি এসেছিলাম বুধবার রাত্রে। না এসে উপায় ছিল না। লাইসেন্স ছাড়া আমি একেবারে হোটেলের মধ্যে আটকা! যেসব জায়গায় আঙ্কেল আমাকে যেতে বলেছেন, গাড়ি ছাড়া সেসব জায়গায় যাওয়া ইমপ্র্যাক্টিক্যাল। তাই আমি আঙ্কলকে ফোন করেছিলাম, যদিও আঙ্কল কোনোরকম যোগাযোগ রাখতে আমাকে বারণ করেছিলেন। যাই হোক, আঙ্কল বলেছিলেন ন'টার আগেই আসতে, কারণ তারপরেই প্রমথ এসে যাবে। ঝড়বৃষ্টির জন্যে আমার ট্যাক্সি পেতে একটু দেরি হয়েছিল। আমি সোয়া ন'টা নাগাদ এসে পৌঁছই। আমার চাবি ছিল, তাই বেল না বাজিয়েই অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি।

কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে, সোজা নিজের ঘরে যাই। আমার লাইসেন্সটা ছিল নাইট টেবিলের ড্রয়ারে, সেটা তুলে নিই। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আঙ্কল বোধহয় বাথরুমে, কারণ বাথরুমের দরজাটা বন্ধ ছিল। আমার ঘর থেকে যখন বেরোচ্ছি, তখনই ডাইনিং টেবিলে বীভৎস দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ে! আই গট প্যানিকড, আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হোটেলে ফিরে যাই। ইট মে সাউন্ড অড, বাট দ্যাট এগজ্যাক্টলি হোয়াট আই ডিড।"

"তারপর স্যার কী করলেন?"

"তারপর? ওয়েল, সারারাত আমার প্রায় শকের মধ্যেই কাটে। সকাল হতে না হতেই আমি একটা গাড়ি ভাড়া করি। কেন করি, তার জবাব দিতে পারব না। সত্যি বলতে কী, আমার কী করা উচিত — কিছুই তখন ভেবে উঠতে পারছিলাম না! ও হ্যাঁ, রাস্তা থেকে ফোনে ব্রিজ আঙ্কলকে একবার ধরার চেষ্টা করি, কিন্তু ওঁকে অফিসে পাই না। তখন ঠিক করি, যতক্ষণ ব্রিজ আঙ্কলকে ধরতে না পারছি, ততক্ষণ আঙ্কলের কাজগুলো করে যাব। আমি হোটেলে ফিরে এসে মাল তুলে ডেলিভারি দিতে ফিলাডেলফিয়া যাই। সেখান থেকে ফিরে দুপুর নাগাদ আমি ব্রিজ আঙ্কলকে ধরতে পারি। ব্রিজ আঙ্কল আমাকে উপদেশ দেন, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে। কারণ আমিই হব ন্যাচারাল সাসপেক্ট — মোটিভ এবং অপরচুনিটি দুটোই আমার আছে বলে।"

"আর একটা প্রশ্ন স্যার, আপনি কি অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা বেরোবার আগে লক করে গেছিলেন?"

"আমার মনে নেই, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। শুধু মনে আছে দরজার নবটা, আমি রুমাল দিয়ে মুছেছিলাম। আমি জানতাম যে, পুলিশ ফিঙ্গার প্রিন্ট নেবে। আই ওয়াজ স্কেয়ার্ড।"

"আই সি," বলে একেনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে কয়েকটা টান দিলেন। তারপর ব্রিজ শাহকে প্রশ্ন করলেন, "মিস্টার প্যাটেলের এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর ওঁর সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, বুধবার উনি আমাকে ফোন করেছিলেন।" ব্রিজ শাহর মুখে কিন্তু সেই বিরক্তি ভাবটা নেই। বেশ ভেবেচিন্তে সতর্ক ভাবেই উত্তরটা দিলেন।

"কোনো বিশেষ কারণে কী?"

"ওয়েল," ব্রিজ শাহ একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, "আমার এক ক্লায়েন্টকে কিছুদিন আগে উনি একটা মুনস্টোন বিক্রি করেছিলেন, সেটা উনি আবার কিনে নিতে পারেন কিনা খোঁজ করতে।"

"খোঁজটা কি পেয়েছিলেন?"

"হ্যা, সেদিন বিকেলেই পেয়েছিলাম।"

"মিস্টার প্যাটেল কি সেটা জানতেন স্যার?"

"না, কিরিট ভাইকে সেটা জানানোর সুযোগ হয়নি।"

"আই সি। বৃহস্পতিবার সকালে আপনি কোথায় ছিলেন স্যার?"

"আমার অফিসে।"

"ভেরি পাজলিং স্যার!"

"কী পাজলিং?" ব্রিজ শাহর ভুরুটা কোচকালো।

"এই যে আপনার বৃহস্পতিবার মিস্টার প্যাটেলকে ফোন না করাটা! আমার কিন্তু ধারণা ছিল স্যার, আপনার কথার নড়চড় হয় না। এই তো দেখুন না, আপনি আমাকে সেদিন ফোন করবেন বলেছিলেন, একদম ঠিক ঠিক সময় করেছিলেন। আই ওয়াজ রিয়েলি ইমপ্রেসড স্যার। আমি প্রমথবাবু আর বাপিবাবুকে বলেওছি সেকথা। ঠিক কিনা?"

আমি আর প্রমথ নীরবে মাথা নাড়লাম।

"আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি কী বলছেন!" ব্রিজ শাহর গলাটা একটু যেন ভীত শোনাল।

"আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার।" একেনবাবু এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "মিস্টার প্যাটেল আপনার একজন পুরোনো ক্লায়েন্ট। তিনি আপনাকে বিশেষ করে বলেছিলেন বৃহস্পতিবার সকালে ফোন করতে। এতে কোনো ভুলচুক নেই স্যার — প্রমথবাবুর নিজের কানে শোনা। আপনি ইনফরমেশনটা যোগাড় করলেন, কিন্তু ফোন করলেন না। বলুন স্যার, এটা পাজলিং নয়?"

ব্রিজ শাহ একেবারে স্তম্ভিত! আমি ব্রিজ শাহর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছি একেনবাবু কী করে সূত্রগুলো একের পর এক সাজিয়ে এগোচ্ছেন!

একেনবাবু খুব শান্ত স্বরে বললেন, "স্যার, আপনার এই অস্বাভাবিক আচরণের শুধু একটাই উত্তর। আপনি জানতেন যে, মিস্টার প্যাটেল আর বেঁচে নেই। তার মানে, হয় আপনি বুধবার রাত্রে অবিনাশবাবুর মত এখানে এসেছিলেন, নয় ওঁর খুনের ব্যাপারে আপনার কোনো হাত ছিল।"

"অ্যাবসল্যুটলি নট, আই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ হিজ ডেথ! ব্রিজ শাহ প্রতিবাদ করে উঠলেন। তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে দিলেন, "হ্যাঁ, মুনস্টোনটা হাতে এসে যাওয়ায়, ওকে সেটা দিতে বুধবার রাত্রে এখানে আমি এসেছিলাম ঠিকই। বাট ইট ওয়াজ টু লেট। হি ওয়াজ অলরেডি ডেড!"

একেনবাবু সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে পাঞ্চের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কী জানি একটা প্রশ্ন ব্রিজ শাহকে করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি পাঞ্চটা গিলতে গিয়ে বিষম টিষম লেগে একাকার! বিষমের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই বাইরে হলঘরের ফায়ার অ্যালার্মটা বেজে উঠল। দরজার বাইরে থেকে বেশ কয়েকজনের চেঁচামেচি শুনলাম, 'ফায়ার, ফায়ার' বলে।

আমার দৃষ্টিবিভ্রম কিনা জানি না। মনে হল একটু ধোঁয়াও যেন দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে। আমি আর প্রমথ পাশাপাশি দেওয়াল ঘেঁসে বসে। প্রমথর পাশে একেনবাবু, তার পাশে অবিনাশ। সামনে লম্বা কফি টেবিল। আমাকে উঠতে গেলে তিনজনকে ডিঙিয়ে যেতে হয়।

আমি অবিনাশকে চিৎকার করে বললাম, "জানলা খোলো। অবিনাশ দেখলাম ঘাবড়ে পাথর হয়ে গেছে! স্যাম ওয়াকারের অবস্থাও তথৈবচ। প্রমথটা লাফিয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু একেনবাবু প্রমথকে জড়িয়ে ধরে, 'ব্যস্ত হবেন না' বলে এমন হইচই জুড়লেন যে, প্রমথ জানলার কাছে যাওয়া দূরে থাক কফি টেবিলের চৌহদ্দিও পার হতে পারল না! একেনবাবুর মাথা রহস্যসন্ধানের ব্যাপারে সাফ হলেও, এদেশে আগুন লাগলে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়িগুলোর কী দশা হয় সে সম্পর্কে ওঁর কোন ধারণাই নেই! আমি ওদের সবাইকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমায় দেখে অবিনাশও উঠল। ব্রিজ শাহ বাইরে ঘরের একটা জানালা নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করেছেন। মিস্টার সাঁপুই চট করে দৌড়ে গিয়ে কিচেনে ডাইনিং টেবিলের সামনের দরজাটা খুলে ফেলেছেন। মুশকিল হচ্ছে, ফায়ার এস্কেপটা বাইরের ঘরের জানালা দুটোর নীচে। কিচেনের জানলা দিয়ে ফায়ার এস্কেপে পৌছতে হলে প্রায় টারজানের মত লাফ দিতে লাগে। তেমন লাফ দেবার ক্ষমতা কারোরই নেই, তার ওপর বাইরে যা অন্ধকার! এই দুর্যোগে দেখলাম শৈলেন সাঁপুইয়ের মাথাই একমাত্র কাজ করছে। অবিনাশ বাইরের দরজা খুলতে যাচ্ছিল। শৈলেন সাঁপুই বাধা দিলেন, "দরজা খুলবেন না, আগুন ভেতরে ঢুকে পড়বে।" ব্রিজ শাহ তখনও বাইরের ঘরের জানলা খুলে উঠতে পারেননি দেখে আমি ঘরের অন্য জানালাটা খুলতে গেলাম। শৈলেন সাঁপুই চেঁচিয়ে বললেন, "ওগুলো জ্যাম, ছেড়ে দিন! একটা দড়ি যোগাড় করুন শিগগিরি!"

পরের মুহূর্তে যেটা ঘটল সেটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়! একেনবাবু মুখে আঙুল দিয়ে সিটি বাজালেন, আর দেখলাম বাইরের দরজা দিয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ঘরে ঢুকছেন!

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ভারী গলায় বললেন, এভরিথিং ইজ ওকে, আপনারা সবাই বসুন।

আমরা সবাই হতভম্ব! প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফায়ার অ্যালার্ম।"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট চোখ টিপে বললেন, "জাস্ট রিল্যাক্স, দেয়ার ইজ নো ফায়ার।"

বসলেই রিল্যাক্স হওয়া যায় নাকি! কিন্ত ক্যাপ্টেন একেবারে আঙুল নির্দেশ করে সবাইকে বসালেন। তারপর বললেন, "আপনার হয়তো ভাবছেন, কেন আমি এখানে হঠাৎ এলাম। কারণ হচ্ছে কতগুলো নতুন তথ্য আবিষ্কার হওয়ায় মিস্টার প্যাটেলের কেসটা আবার ওপেন করেছি।"

এতক্ষণ তদন্ত চলছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা পুলিশের কারবার ছিল সামনে হচ্ছিল শুধু ধাঁধার জট খোলা হচ্ছে। এই সিচুয়েশনটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি সিরিয়াস।

সবাই চুপ করে অপেক্ষা করছি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আর কী বলেন শোনার জন্য।

একেনবাবু দেখি চেয়ার থেকে চট করে উঠে কানে কানে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে কিছু একটা বলল। ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার হয়তো জানেন না এই কেসটার তদন্ত বেশ কিছুদিন যিনি চালাচ্ছেন, তিনি হলেন কোলকাতার গোয়েন্দা মিস্টার একেন্দ্রা সেন। নিউ ইয়র্কের পুলিশ কমিশনারের স্পেশাল ক্রাইম গ্রুপের উনি একজন ভিজিটিং মেম্বার। আমি এখানে শুধু মিস্টার সেনকে সাহায্য করতে এসেছি।" তারপর একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন

স্টুয়ার্ট বললেন, "ইট ইজ অল ইওরস একেন্ড্রা।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। জাস্ট ফর ইয়োর ইনফরমেশন," একেনবাবু ব্রিজ শাহ আর অবিনাশকে দেখিয়ে ক্যাপ্টেনকে বললেন, মিস্টার শাহ আর অবিনাশবাবু স্বীকার করেছেন যে, বুধবার রাত্রে, অর্থাৎ মিস্টার প্যাটেল যে রাত্রে মারা যান, ওঁরা এখানে এসেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই নাকি মিস্টার প্যাটেলকে মৃত অবস্থায় দেখেন। যে কারণেই হোক ওঁরা পুলিশকে খবরটা জানাননি!"

"আই সি!"

ব্রিজ শাহ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন। "প্লিজ প্রসিড একেন্ড্রা।"

একেনবাবু শুরু করলেন, এই কেসটাতে একটা জিনিস আমার খুব পাজলিং লাগছিল, সেটা হল এই মুনস্টোনের ব্যাপারটা। মিস্টার ওয়াকার মিস্টার প্যাটেলকে একটা মুনস্টোন বিক্রি করেছিলেন। সেটা আবার উনি কিনে নিতে চাইছিলেন। এ পর্যন্ত অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। মুনস্টোনটা হাত বদল হবে, আর সেই সুযোগে কয়েকজন ব্যবসায়ী লাভবান হবে, এটাই তো ব্যাবসার নিয়ম। কিন্তু এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তির উদয় হল। এই তৃতীয় ব্যক্তির মুনস্টোনটা এত ভীষণভাবে দরকার যে, সেটা না পেলে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে –সেটার ইঙ্গিত দিতেও সে পিছপা নয়! আমি বলছি যে স্যার এই চিঠিটার কথা।"

একেনবাবু ওঁর সার্টের পকেট থেকে মিস্টার প্যাটেলের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া চিঠিটা দেখালেন।

চিঠিটা একটু সাংকেতিক।

"Mary owns one nice stone
Sounds music to my ear!
i must have it, else Mary dies.

"প্রথমে পড়ে একটু উদ্ভট লাগলেও, একটু খুটিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে, প্রথম লাইনে মুনস্টোনের কথা বলা হচ্ছে। Mary owns one nice stone — প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো দেখুন স্যার। এম ও ও এন, তারপর স্টোন, অর্থাৎ মুনস্টোন। ঠিক কি না স্যার? আর শেষটা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। মুনস্টোনটা না পেলে পত্রলেখক খুন করার হুমকি দিচ্ছেন!

"যাই হোক স্যার, এই চিঠিটা কিন্তু খুব পাজলড করল। মুনস্টোন এমন কী মূল্যবান জিনিস হতে প্যারে, যার জন্য কেউ এমন চিঠি লিখবে! মিস্টার ওয়াকারের কাছে শুনলাম, নাটালের এক ডিলার এর জন্য পনেরো হাজার ডলার দিতে রাজি। আমার কাছে সে টাকার অঙ্কটা বিরাট মনে হলেও নিউ ইয়র্কের বিজনেসম্যানদের কাছে তো নয়। ইতিমধ্যে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। সেটা হল, পিঙ্ক এলিফ্যান্টে মিস্টার প্যাটেল যাদের সঙ্গে তাস খেলতেন, সেই দলে যিনি বস বলে পরিচিত — তিনিই এই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। ইন্টারেস্টিংলি স্যার, এই চিঠি পাঠানোর অল্প আগে পিঙ্ক এলিফ্যান্ট রেস্টুরেন্টে এই বসের সঙ্গে সিড বলে একজনের কথা কাটাকাটি হয়। এই সিডকে আমি উদ্ধার করি ওখানকার ওয়েটারের দেখানো একটা ছবি থেকে। সিড হলেন সহদেব ভারওয়ানি। আমি ধরে নিচ্ছি স্যার, আপনারা সবাই সহদেব ভারওয়ানি কে চেনেন?"

স্যাম ওয়াকার বললেন, "ভারওয়ানি, মানে যিনি অ্যান্টিক ডিলার ছিলেন?"

"রাইট স্যার। এই সহদেব বসের বদলে কার্টের সঙ্গে ডিল করবেন হুমকি দেন। কার্ট হলেন মিস্টার কিরিট প্যাটেল। তার ফলটা আপনারা সবাই জানেন। এঁদের দু'জনের কেউই আর বেঁচে নেই। প্রশ্ন হল এরা দু'জনেই কি প্রাণ দিলেন ১৫ হাজার ডলারের মুনস্টোনের জন্য। ইট ডাজ নট মেক সেন্স — অ্যাবসল্যুটলি নো সেন্স! তার থেকেও বড় কথা হোয়াই সাচ সিক্রেসি? একটা মুনস্টোনের জন্য এরকম এমন একটা সাংকেতিক চিঠি লেখার কী দরকার? আর এমন কী অমূল্য জিনিস ওটা যার জন্য প্রাণের ভয় দেখানো হচ্ছে? তারপর আমি রিয়ালাইজ করলাম পিঙ্ক এলিফ্যান্টের ঘটনার সঙ্গে নাটালের সেই মুনস্টোনের কোনো যোগ নেই, কারণ স্যাম ওয়াকারকে মিস্টার প্যাটেল বুধবার ফোন করে বলেছিলেন বৃহস্পতিবার বিকেলে এই অ্যাপার্টমেন্টের নম্বরে ফোন করতে। তার মধ্যে তিনি মুনস্টোনের খবরটা দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এই মুনস্টোনের সঙ্গে মিস্টার ভারওয়ানির যোগ থাকতে পারে না, কারণ এর বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি মারা গেছেন। তাহলে চিঠির মুনস্টোনটা কী?

"আসলে কনফিউশনটা হল, একটা নয় স্যার, এই কেসে দু' দুটো মুনস্টোন জড়িত! একটা মূল্যবান, কিন্তু আর একটা প্রায় অমূল্য! প্রথমটার কথা এখানে আমরা সবাই জানি, কিন্তু দ্বিতীয়টা কী? দ্যাট ওয়াজ মাই পাজল স্যার। আর সেটাই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে গেল, ব্রুস স্প্রিংস্টিনের রক কনসার্ট শুনতে গিয়ে। হঠাৎ খেয়াল হল, আরে, রক আর স্টোন তো একই জিনিস! সাংকেতিক চিঠিটিতে কিন্তু হিন্ট-ও ছিল, মিউজিক টু মাই ইয়ার! না মুনস্টোন নয়, চিঠিতে লেখা হয়েছিল মুনরকের কথা। হ্যা স্যার, মুনরক! যার জন্য পৃথিবীর বড় বড় কালেক্টররা লক্ষ লক্ষ ডলার দিতে দ্বিধা করবে না!"

"মানে স্মিথসোনিয়ানের সেই চুরি?" প্রমথ সবিস্ময়ে বলল।

"আই থিঙ্ক সো স্যার। আমার ধারণা সহদেব ভারওয়ানিই সেটা করেছিলেন, আর চুরি করার আইডিয়াটা দিয়েছিলেন বস। এ নিয়ে বসের সঙ্গে আগেই একটা ডিল হয়েছিল। গোল পাকাল কাজটা সেরে সহদেব যখন অরিজিনাল ডিলের ডবল টাকা চাইলেন। না পেলে বসকে বিক্রি না করে মিস্টার প্যাটেলকে বিক্রি করবেন — এমন ইঙ্গিত দিলেন। সহদেব প্রাণ দিলেন বসকে অমান্য করার জন্য। যেটা জোর দিয়ে বলতে পারব না, সেটা হল মিস্টার প্যাটেলকে কেন মারা হল! হয়তো বস ভেবেছিলেন যে মিস্টার প্যাটেলের কাছে মুনরকগুলো আছে; অথবা সন্দেহ করেছিলেন মিস্টার প্যাটেল নোজ টু মাচ অ্যাবাউট হিজ ইনভলভমেন্ট ইন দ্য ক্রাইম। আমার ধারণা মিস্টার সাঁপুই সেটা আমার থেকে ভালো বলতে পারবেন। ঠিক কিনা স্যার?" শৈলেন সাঁপুইয়ের দিকে তাকিয়ে একেনবাবু তার বক্তব্য শেষ করলেন।

শৈলেন সাঁপুইয়ের মুখ দেখলাম একেবারে পাথরের মতো। দাঁত চেপে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "ইউ আর এ ফুল একেনবাবু। ইউ হ্যাভ নো প্রুফ!"

"আই মে বি এ ফুল স্যার, কিন্তু হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টরা প্রমাণ করতে পারবেন, চিঠিতে অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর ৩০৪-টা আপনার নিজের হাতের লেখা।" চিঠিটা দেখিয়ে একেনবাবু বললেন।

"তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ওই চিঠিটা যদি আমি লিখেও থাকি, সো হোয়াট? আপনার কি প্রুফ আছে যে, আমি এখানে এসে মিস্টার প্যাটেলকে খুন করেছি! আমি আবার আপনাকে বলছি, আপনার কোনো প্রমাণই নেই!"

"আই অ্যাডমিট স্যার, আমার আগে ছিল না।" একেনবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে

বললেন। "কিন্তু এখন স্যার আছে।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছি একেনবাবুর পরের কথাগুলো শোনার জন্য।

"মিস্টার সাঁপুই, আপনি একটু আগে ফায়ার অ্যালার্ম শুনে আপনার চেয়ারের একদম পাশে দু'-দুটো জানলা থাকা সত্ত্বেও, অত দূরে গিয়ে কিচেনের জানলাটা খুললেন কেন? সেটা কি খুব আনইউজুয়াল নয় স্যার — হাতের ডগায় দু'-দুটো জানালা ছেড়ে দূরের জানলাটা গিয়ে খোলা! শুধু তাই নয় স্যার, আপনি বাপিবাবুকে বললেন, ওগুলো, মানে বাইরের ঘরের জানলাগুলো, সব জ্যাম! আপনি কী করে সেটা জানলেন স্যার? আপনি তো ওগুলো খোলার কোনো চেষ্টাই করেননি! যদি না স্যার, ক'দিন আগে আপনি সে চেষ্টা করে থাকেন। আমি বলি স্যার, বুধবার রাত্রে কী হয়েছিল। কোনো একটা ছুতোয় ও দুটো জানলা আপনি খুলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু খুলতে পারেননি। কিচেনের জানলাটা খুলল। তাই মিস্টার প্যাটেলকে ডাইনিং টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ওঁকে হত্যা করলেন। তারপর কিচেনের জানলা খুলে, ওঁর হাতে রিভলভারটা ধরিয়ে দিয়ে বাইরে একটা গুলি ছুঁড়লেন, যাতে হাতে বারুদের গুঁড়ো দেখে সবাই সুইসাইড বলে মনে করে। আমি কি খুব ভুল বলেছি স্যার?"

"ইট ইজ অ্যা ট্র্যাপ!" শৈলেন সাঁপুই মুখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনাদের হোল ফায়ার বিজনেস ইজ এ ট্র্যাপ!"

"ইউ আর রাইট স্যার," একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে স্বীকার করলেন।

"এন্ড এ রিয়েল গুড ওয়ান," ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট শৈলেন সাঁপুইয়ের হাতে হাতকড়া লাগাতে লাগাতে বললেন।

।। ১৭ ।।

আমি একেনবাবুকে বললাম, "আপনি যে মশাই লুকিয়ে লুকিয়ে এত তদন্ত চালাচ্ছেন, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি! কবে আপনাকে দায়িত্বটা দেওয়া হল?"

"প্রথম দিন থেকেই স্যার। মনে আছে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আমাকে আলাদা জেরা করতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন?"

"নিশ্চয় মনে আছে। কিন্তু তখন কী আর বুঝেছি কেন! ভালো কথা, হঠাৎ শৈলেন সাঁপুইকে সন্দেহ করলেন কেন?"

"শৈলেন সাঁপুই এমনিতেই একটা শেডি ক্যারেক্টার স্যার। আপনি তো ওর অফিসের বহর দেখেছেন। বলুন তো, একটা লোক শুধু অ্যাস্ট্রোলজি করে এত টাকা রোজকার করে কী করে? তবে এই কেসে, আমার প্রথম খটকাটা লেগেছিল স্যার, আপনি যখন মিস্টার প্যাটেলের মৃত্যুর খবরটা ওঁকে জানালেন। এমনিতে উনি ভাব দেখান যে, পাস্ট ফিউচার সব কিছুই ওনার জানা, অর্থাৎ না জেনেও জানার ভান করেন। ওঁর উচিত ছিল খবরটা শুনে সবজান্তার মতো দুঃখ প্রকাশ করা। কিন্তু গিল্টি কনশাস যাবে কোথায়! জেনে- না-জানার ভান করতে গিয়ে একটু বেশি বেশি আশ্চর্য ভাব দেখাচ্ছিলেন!"

"তাই থেকেই!"

"আসলে স্যার, আমি সবাইকেই সন্দেহ করি, তারপরে এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘটনাগুলো মেলাতে থাকি। আমি চিন্তা করছিলাম এই 'বস' লোকটি কে হতে পারে? যিনি এই 'বস' তিনিই সম্ভবত মিস্টার ভারওয়ানিকে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে মেরেছেন। মিস্টার ভারওয়ানি তাকে ডিঙিয়ে কার্ট অথাৎ মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে ডিল করছেন — সেটা উনি সহ্য করতে পারেননি। এইবার মেলান স্যার। মিস্টার সাঁপুইয়ের গাড়ির বাম্পার হরিণের ধাক্কায় ড্যামেজ হয়েছে। সত্যি সত্যি কী হরিণের ধাক্কায় না মিস্টার ভারওয়ানিকে ধাক্কা দেবার ফল? ইনি ঐ বাম্পার সারানো নিয়ে ইন্সিওরেন্সের সঙ্গেও ডিল করেননি — পাছে নানান প্রশ্ন ওঠে। তারপর দেখুন মিস্টার সাঁপুইয়ের অফিস শুক্রবার বন্ধ থাকে, সুতরাং তার পক্ষে নিয়মিত পিঙ্ক এলিফ্যান্টে যাওয়াতে কোনো অসুবিধাই নেই। কিন্তু আসল ক্লু পেলাম স্যার, ক্রস পেনটা থেকে। ক্রস পেনটায় লিখতে গিয়ে দেখি লেখা ভাল পড়ছে না। তখন মনে হল, মিস্টার সাঁপুই প্রথম দিন যে কাগজটা দিয়ে ভেলকি দেখিয়েছিলেন, সেটা একটু পরীক্ষা করি। ঠিক যা ভেবেছি! ইংরেজি চারের শুড়টা ছিল ঠিকই, কিন্তু কালি ভালো মতো পড়েনি বলে, সেদিন রাত্রে অল্প আলোয় খেয়াল করিনি। দিনের আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ল বল পয়েন্টের আঁচড়টা। তখন নিঃসন্দেহ হলাম স্যার — বস আর মিস্টার সাঁপুই একই লোক।

"এদিকে মিস্টার প্যাটেল অদৃশ্য হয়েছেন। মুনরকগুলো হয়তো এখন মিস্টার প্যাটেলের কাছে। তার থেকেও চিন্তার কথা, মুনরক চুরিতে ওঁর ভূমিকাটা কী — সেটাও হয়তো মিস্টার প্যাটেল জেনে ফেলেছেন! একটা ভুমিকা যে ওঁর ছিল সেটা তো আমরা জো-র কাছেই শুনেছি। আমার বিশ্বাস উনি চান্স নিতে চাননি। মুনরক পাওয়া যাক না যাক, মিস্টার প্যাটেলকে সরাতে হবে। এখন মিস্টার প্যাটেল যে এখানে লুকিয়ে আছেন, সে খবরটা তিনি কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন? মাত্র গুটিকয়েক লোকই সেটা জানতেন। সেই খবরটা জানতেই মনে হয় অবিনাশকে ফোন করেছিলেন। অবিনাশকে পাননি, কিন্তু খবরটা পেয়ে যান। প্রমথবাবুই একটু মজা করে মিস্টার প্যাটেলকে যে এখানে পাওয়া যাবে ওঁকে জানিয়ে দেন।"

"মাই গড! আমি তো কল্পনাও করিনি...!" প্রথমত যে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ভাবছে সেটা ওর গলার স্বরে স্পষ্ট।

"আপনি ওঁর মতলব জানবেন কী করে স্যার? ওটা নিয়ে একদম ভাববেন না, ভুলে যান!"

"সবই বুঝলাম," আমি বললাম, "কিন্তু মুনরকগুলো গেল কোথায়?"

"সব স্যার স্মিথসোনিয়ানে ফিরে গেছে। সহদেব বিপদ হতে পারে বুঝে ওঁর ক্যাকটাস গাছের পাথরের সঙ্গে ওগুলো মিশিয়ে টবটা জো-র কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। এক্সেলেন্ট মুভ স্যার। সকলের চোখের সামনে, আবার সকলের চোখের বাইরে! যেই ধরতে পারলাম ব্যাপারটা মুনরক নিয়ে, তখনই ক্যাকটাস গাছের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল!"

"আপনি মশাই মহা ধড়িবাজ লোক!" আমি বললাম।

"কেন স্যার?"

"সেদিন তো শৈলেন সাঁপুইয়ের ম্যাজিক দেখে খুব আহা, বাহা, করছিলেন। ওটা যে ভাঁওতা, ফিউচার প্রেডিকশনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা তো ওকে একবারও বলেননি!"

একেনবাবু উত্তরে একটু লাজুক হাসলেন।

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

ম্যানহাটানে ম্যানহান্ট

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১ ।।

সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিচেনে খুটখাট আওয়াজ শুনে। বুঝলাম প্রমথ আর একেনবাবু যথারীতি ওপরে উঠে এসে ব্রেকফাস্ট নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন! এটা আমাদের প্রায় ডেইলি রুটিন। ব্রেকফাস্টটা আমার অ্যাপার্টমেন্টেই হয়, আর ডিনারটা নীচে প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে। অবশ্য শুধু প্রমথর অ্যাপার্টমেন্টে বলাটা আর ঠিক নয়। অবিনাশ চলে যাওয়ার পর একেনবাবু বেশ পাকাপাকি ভাবেই প্রমথর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টটা শেয়ার করছেন। আসলে গত বছর উনি গেস্ট হিসাবে আমার কাছে এক মাসের মতো ছিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যানহাটানে বিখ্যাত 'মুনস্টোন মিস্ট্রি' সলভ করে ওঁর একটা ফিল্ড হয়ে গেল যে, তার জোরেই এবার একটা ফুলব্রাইট স্কলারশিপ ম্যানেজ করে পুরোপুরি দু'বছরের মেয়াদে এখানে এসেছেন। আমাদের নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতেই ক্রিমিনোলজির ওপর রিসার্চ করছেন।

হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখি ফ্রেঞ্চ টোস্ট তৈরি হচ্ছে। খুন্তি হাতে ব্যস্ত একেনবাবু। মুখে আবার একখাবলা দাড়ি, চুলগুলো উসকোখুসকো, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, সেটাও আবার বিচ্ছিরিভাবে কোঁচকানো। পাশে দাঁড়িয়ে প্রমথ। হাত-পা নেড়ে প্রচন্ড ভাবে একেনবাবুকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছে! 'আর একটু ভাজুন,' 'ব্যস, আর নয়, এবার উলটে দিন,' 'তেল বেশি গরম হয়ে গেছে, হিটটা একটু কমান,' এইসব আর কি। একেনবাবু অনুগত শিষ্যের মত সেগুলো শুনছেন, আর গুরুকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, 'কেমন হচ্ছে স্যার,' 'বেশি ভেজে ফেলছি না তো,' ইত্যাদি।

ব্রেকফাস্টের মেইন কোর্সটা দেখেই আমার মেজাজ বিগড়োল। ফ্রেঞ্চ টোস্ট কথাটা শুনতেই শুধু গালভরা। আসলে ওটা হল প্লেন এন্ড সিম্পল ডিম-পাঁউরুটি ভাজা- নো পেঁয়াজকুচি, নো কাঁচালঙ্কা, নো কিচ্ছু! সায়েবরা আবার এগুলোই খায় মিষ্টি- মিষ্টি মেপল সিরাপের সঙ্গে! কী ডেডলি কম্বিনেশন!

আমি প্রমথকে বললাম, "কী রে একটু পেঁয়াজ দিতে পারলি না?"

"ফ্রেঞ্চ টোস্টে!" প্রমথ চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই একটা ইডিয়ট!"

"ফ্রেঞ্চ টোস্টের দরকার কী ছিল, আমাদের দেশি মতে করলেই তো পারতিস!"

"শুনছেন বাপিটার কথা," প্রমথ একেনবাবুকে বলল, "এদিকে উনি উঠতে বসতে আমেরিকানদের তেল দেন, শুধু খাবার সময় হলেই ভেতো বাঙালি।"

"চুপ কর স্টুপিড, আমি মোটেও আমেরিকানদের তেল দিই না!" আমি প্রতিবাদ করলাম।

"থাক, আর নিজের সাফাই গাইতে হবে না। কষ্ট করে ব্রেকফাস্টটা খা। রাত্রে তো ফুল কোর্স বাঙালি খাবার জুটবেই।"

"তার মানে?"

"এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিলি?" শ্যামলদার বাড়ি আমাদের নেমন্তন্ন না?

প্রমথর কথায় মনে পড়ে গেল। সত্যিই তো, শ্যামলদা আমাদের সবাইকে আজ ডিনারে ডেকেছেন। সাধারণত এরকম একটা সম্ভাবনায় আমি প্রচণ্ড উৎফুল্ল হই। কিন্তু আজকে হতে পারলাম না। অবশ্য তার কারণ শ্যামলদা বা রীনা বৌদি নন। ওঁরা দুজনেই অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ লায়ন - হার্টেড লোক, যখন তখন আমাদের জুলুম সহ্য করেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মরুভূমিতে বাঙালি ওয়েসিস বলতে যদি কিছু থাকে — সেটা হল ওঁদেরই বাড়ি! কিন্তু ইদানীং সেখানে ঢোকার জন্য একটা বাড়াবাড়ি রকমের মাসুল দিতে হচ্ছে। মাসুলটা হল, বেন্টুমাসির বাক্যবাণে জর্জরিত হওয়া! বেন্টুমাসি হলেন আমার দূরসম্পর্কের মাসি, শ্যামলদার মা। মাস তিনেকের জন্য ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছেন। না, গুরুজনদের নিন্দা করতে নেই আমি জানি। আসলে সব কিছুই হচ্ছে রিলেটিভ। বলতে কি, যে বিশেষ কারণে আমি বেন্টুমাসিকে সদা সর্বদা এড়াতে চাই, পুলিশের চাকরিতে ঠিক তার জন্যই লোকে রেগুলার প্রমোশন পেয়ে যায়! আমি ওঁর জেরা করার অসাধারণ ক্ষমতাটার কথা বলছি। মায়ের কাছে শুনেছি যে, ওঁর জেরার কাছে উত্যক্ত হয়ে বেন্টুমেসো নাকি একদিন প্রায় সন্ন্যাসীই হয়ে যাচ্ছিলেন! বাস্তবিকই, অত্যন্ত ডেঞ্জারাস মহিলা আমার এই বেন্টুমাসি! এদেশে এসে শুধু প্রথম ক'দিন একটু ড্যাম্প মেরে ছিলেন। এখন আবার ফুল ফর্মে। তার ওপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এখানকার ভারতীয়দের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে উনি নাকি দারুণ দারুণ সব ভ্রমণকাহিনি লিখতেন! সেই স্টাইলেই একটু রং-টং ফলিয়ে একটা ভ্রমণ-কাম-উপন্যাস লিখে ফেলবেন, সেটাই হচ্ছে প্ল্যান! তার জন্য অবশ্য অনেক রসদ চাই। ফলে সামনে একবার পড়লেই হল! চেপে ধরে পেটের কথা মুচড়ে মুচড়ে টেনে বার করবেন!

শ্যামলদার বাড়ি খুব দূরে নয়, জার্সি সিটিতে। হল্যান্ড টানেল পার হওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিট। আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ। বাইরের ঘরে লেজিবয় চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন বেন্টুমাসি। চুলে একটু একটু পাক ধরায় মুখটা আজকাল যেন আরও ভারিক্কি দেখায়। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় লাগানো। নাকের ঠিক নীচেই রোঁয়া রোঁয়া এত লোম যে, হঠাৎ গোঁফ বলে ভুল হতে পারে! আর তার বাঁ দিক ঘেঁসে কিসমিস সাইজের একটা আঁচিল। সাহেবদের দেশে এসেছেন বলেই বোধহয় শাড়ির ওপর একটা হাউসকোট চড়িয়েছেন! এমনিতেই উনি দশাসই, তার উপর বেঢপ সাইজের হাউসকোট, দেখে মনে হচ্ছে ছোটখাটো একটা পাহাড়!

"এই যে তোরা সব এসে গেছিস!" বেন্টুমাসি আমাকে আর প্রমথকে দেখে সোফা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কই, তোদের গোয়েন্দাবন্ধুটি কোথায়?"

"একেনবাবু গাড়িতে কী যেন ফেলে এসেছেন, সেটা নিয়ে আসছেন।" কথাটা বলেই আমি সুট করে কিচেনে গা-ঢাকা দিলাম।

রীনা বৌদি রান্নাঘরে ফিশফ্রাই করছিলেন। মুখ টিপে হেসে বললেন, "কী, মাকে বেশ এড়িয়ে এলেন যে!"

এরকম হাতেনাতে ধরা পড়ে যাব বুঝিনি! আমতা-আমতা করে বললাম, "না, না, বৌদি, আসলে ভাবলাম আপনার যদি কোনো হেল্প — মানে যোগান-টোগান দেয়ার দরকার পড়ে, সেইজন্যই ...।"

"বুঝেছি, বুঝেছি," রীনা বৌদি আমাকে থামিয়ে বললেন, "কিন্তু কোনো সাহায্যের দরকার নেই ভাই। বসে গল্প করুন, তাহলেই সাহায্য হবে!"

"থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি।" বলে রান্নাঘরের সঙ্গে ব্রেকফাস্টের যে জায়গাটা সেখানেই জাঁকিয়ে বসলাম।

রীনা বৌদি ফ্রাই ওলটাতে ওলটাতে বললেন, "মা আজ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন।"

"কেন বলুন তো?"

"একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন, তাই নিয়ে খুব উত্তেজিত! সকাল থেকে অনেক গবেষণা চলছে।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না রীনা বৌদি ঠাট্টা করছেন কিনা। তাই দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেন্টুমাসি কী বলছেন শুনবার চেষ্টা করতেই একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল!

"এই বাপি, রান্নাঘরে কী করছিস পেটুক কোথাকার! এদিকে আয়!"

এই ডাক কখনোই উপেক্ষা করা যায় না। গুটিগুটি সোফায় গিয়ে বসলাম। বেন্টুমাসি ইতিমধ্যে ওঁর পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন, "বুঝলে একেন, একেবারে জলজ্যান্ত মার্ডার!"

মার্ডার কী করে জলজ্যান্ত হয়, সেটা অবশ্য বুঝলাম না। একেনবাবু কিন্তু অম্লান বদনে বললেন, "তাই নাকি ম্যাডাম, কী সর্বনাশ!"

"তোমার এই ম্যাডাম, ম্যাডাম ছাড় তো! মুখ দিয়ে কি মাসিমা কথাটা বেরোয় না?"

"না ম্যাডাম, মানে মাসিমা, নিশ্চয়ই বেরোয়।"

"তাহলে, সেটাই বলবে। ম্যাডাম কথাটা শুনলেই আমার গা জ্বলে! হ্যাঁ কী জানি বললে... সর্বনাশ .... সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! একেই বলে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা! যে তোকে এতদিন খাওয়াল, পরাল তাকেই কিনা শেষে খুন করলি!"

"কার কথা বলছ বেন্টুমাসি?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কার আবার, সাহানিদের বাড়িতে বেড়াতে এসে যিনি খুন হলেন, তাঁর সার্ভেন্টের কথা বলছি।"

কারোর উপর খুব না চটলে বেন্টুমাসি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু সাহানি বলতে কার কথা বলছেন, ধরতে পারলাম না।

"কোন সাহানির কথা বলছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ক'টা সাহানি আছে তোদের এমুলুকে," বেন্টুমাসি আমাকে ধমক দিলেন, "অরুণ আর অশোক ছাড়া?"

অরুণ বা অশোক কাউকেই আমি চিনি না। তবে শ্যামলদার কাছে ওদের গল্প অনেক শুনেছি। বড় ভাই অশোক আই.বি.এম বা ওরকম কোনো একটা বড় কোম্পানিতে কাজ করে, আর অরুণের একটা বিজনেস আছে। নিউ ইয়র্ক সিটির লাগোয়া হোয়াইট প্লেইন্স শহরে ওরা থাকে। শ্যামলদারাও আগে ওখানে থাকত। তাই এখনও খুব যাতায়াত আছে।

"কী বলছো তুমি, সাহানিদের গেস্টকে তাঁর কাজের লোকটা খুন করেছে?"

"না করেনি," বিরক্ত হয়ে বেন্টুমাসি বললেন, "আমি তোদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছি!"

"তা বলছি না। কিন্তু এটা যে মার্ডার সেটা তুমি জানলে কী করে! পুলিশ কি তাই বলছে?"

"আরে রাখ তোদের পুলিশ!" আমাকে এক ধমক দিলেন বেন্টুমাসি।

"আমাদের কি চোখ-কান নেই! আচ্ছা বল তো একেন, সার্ভেন্টটা যদি নির্দোষই হবে,

তা হলে মনিব মরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্স–প্যাঁটরা নিয়ে হাওয়া হল কেন?”

একেনবাবু দেখলাম প্রশ্নটা দিব্যি পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ভদ্রলোক মরলেন কী করে ম্যাডা... মাসিমা?”

শ্যামলদা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। রান্নাঘর থেকে রীনা বৌদির ডাক শুনে উঠতে উঠতে বললেন, “ন্যাচারাল কজ। পিওর অ্যান্ড সিম্পল হার্ট অ্যাটাক।”

শ্যামলদার এই কথায় আমার আর সন্দেহ রইল না যে, বেন্টুমাসি তিল থেকে তাল করছেন!

“তোর তো সেই এক কথা,” পুত্রকে নস্যাৎ করলেন বেন্টুমাসি। “সবই যদি নর্মাল হবে, তাহলে অমন চুরিটা হবে কেন?”

শ্যামলদা ঘর থেকে বেরোবার আগে মাকে আড়াল করে আমার দিকে চোখটা একটু টিপে চলে গেলেন। অর্থাৎ ‘মার কথাগুলোকে গুরুত্ব দিস না।’

প্রমথ একটু ভারিক্কি চালে বলল, “আমার মনে হয়, এটা দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার। মানে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু, আর চাকরের চুরিটা। এ দুটো মিক্স করা উচিত হবে না। বিশেষ করে ডেথটা যখন ন্যাচারাল।”

“তুই তো দেখছি তোর শ্যামলদার মতো কথা বলছিস! ধর, লোকটার খুব হার্টের ব্যামো ছিল, আর গন্ডায় গন্ডায় বড়ি গিলতে হতো। এবার ধর, ওই সার্ভেন্টটা ফন্দি করে আসল বড়ির বদলে ভেজাল কিছু দিয়ে দিল। তাহলে কী হবে, লোকটা হার্ট অ্যাটাকে মরবে না?”

বেন্টুমাসি যে এরকম বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করবে, সেটা আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে প্রমথটা হচ্ছে গোঁয়ার। বলল, “না বেন্টুমাসি, ইট ডাজ নট মেক সেন্স। সেটা হবে, কিলিং এ গুজ দ্যাট লেইজ গোল্ডেন এগস। যে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে – তাকে মারা মানে তো রুইনিং ওয়ানস স্টেডি সোর্স অফ ইনকাম!”

“থামা তো বাপু তোর ইংরেজি কচাকচি! কচু বুঝেছিস!”

প্রমথ তাও ছাড়ে না। বলল, “কেন কচু বুঝব? মারার কী মোটিভ থাকতে পারে?”

বেন্টুমাসি হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন। “নাহ তোর মাথায়ও দেখছি বাপির মতোই গোবর! খামোখা কি মেরেছে! যেই জানতে পেরেছে যে, মনিবের ব্যাগ হিরে জহরতে ভর্তি, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বিষ তুলে দিয়েছে!”

“বিষ?”

“ওই হল। মরণাপন্ন হার্টের রুগিকে ওষুধ না দেওয়া, আর বিষ তুলে দেওয়ার মধ্যে তফাত কোথায়?”

“পুলিশে মিসিং রিপোর্টটা করা হয়েছে তো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“তা কী আর হয়নি। কিন্তু এখানকার পুলিশগুলো সব অকম্মার ঢেঁকি! প্রতিদিন টিভিতে দেখিস না, গণ্ডায় গণ্ডায় লোক খুন হচ্ছে। ধরতে পারছে কাউকে? সে জন্যই একেনের ওপর খোঁজার ভারটা আমি দিতে চাই। সার্ভেন্টটাকে ধরতে পারলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী একেন চুপ করে আছ যে?” বেন্টুমাসি প্রশ্ন করলেন।

“কিছু না মাসিমা, একটু ভাবছিলাম। ” এবার খুব সতর্ক হয়ে ‘মাসিমা’ বললেন একেনবাবু। বেন্টুমাসি বলে কথা!

“শুধু ভাবলে চলবে না, কাজে লেগে যাও। আর কোনো কেস আছে নাকি তোমার হাতে?”

"না, তা ঠিক নেই।"

"কেন বাপু, কেউ আর ডাকছে না তোমায়?"

"আসলে আমি এবার এখানে এসেছি শুধু রিসার্চ করতে, সেইজন্যই...।"

"এটা আবার কী রকম কথা বললে! গোয়েন্দারা যদি শুধু গবেষণা করেই কাটায়, তাহলে খুনে বদমাশদের ধরবে কে?"

"তা তো বটেই," একেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে একটু হাসলেন।

"ব্যস, তাহলে আর কী, কাজ শুরু করে দাও।"

"তা করব। আসলে সময়েরই যা একটু অভাব, মানে...।"

"ঘুম থেকে কখন ওঠো?"

"আজ্ঞে?"

"জিজ্ঞেস করছি, ঘুম ভাঙে কখন?"

"এই সাতটা নাগাদ।"

"কখন শুতে যাও?"

"শুতে শুতে প্রায় এগারোটা হয়।"

"বল কী, এই ছেলে ছোকরা বয়সে আট ঘন্টা ধরে ঘুমোচ্ছ! রাত্রি বারোটায় শোবে, ভোর পাঁচটায় উঠবে। যাও, তিন ঘন্টা তোমার একস্ট্রা সময় করে দিলাম, খুঁজে বের করো ব্যাটাকে। আর এই বাপি আর প্রমথটাকেও কাজে লাগাও। এইসব করে যদি ওদের বুদ্ধিটা একটু খোলে!"

প্রমথটার কী স্পর্ধা, বলে কিনা, "বাপিকে বলছ বলো বেন্টুমাসি, কিন্তু আমাকে গালমন্দ করছ কেন?"

বেন্টুমাসি সেই ছেলেবেলার মতো চটাস করে প্রমথর মাথায় চাঁটা মারলেন, "চুপ কর! তোকে দেখছি সেই এইটুকুন থেকে। তারপর শুধু লম্বাতেই বেড়েছিস, বুদ্ধিতে আর বাড় হয়নি!"

এমন সময় শ্যামলদা ঘরে ঢুকে বলল, "মা, তোমার যা বলার শেষ হয়েছে?"

প্রমথ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অনেকক্ষণ, কেন বল তো শ্যামলদা?"

"আরে একটা দুর্দান্ত ফ্রিজার কিনেছি, তোদের দেখাব।"

ফ্রিজার দেখার আমার এতটুকু উৎসাহ নেই, কিন্তু বেন্টুমাসির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি বললাম, "তাই নাকি? ওয়ান্ডারফুল, চলো চলো!"

বেন্টুমাসি স্বগতোক্তি করলেন, "মোলো যা, বরফকল কখনো দেখিসনি আগে?"

সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নামতে নামতে শ্যামলদা বললেন মায়ের কাছে বসে বোর হচ্ছিস বলে নিয়ে এলাম। তবে ফ্রিজারটা খুব ভাল দাঁওয়ে পেয়েছি। লেস দ্যান থ্রি হানড্রেড!"

শ্যামলদা ভুল বলেননি। থার্টি টু কিউবিক ফিটের একটা বিশাল ফ্রিজার!

"এত বড় ফ্রিজার দিয়ে করবে কী, এর মধ্যে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে!" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আরে বুদ্ধিটা সেদিন অশোক সাহানি দিল। মাছ-মাংস বা ফ্রোজেন খাবার সস্তায় পেলেই একগাদা কিনে ফ্রিজারে ঢুকিয়ে ফেলব, তারপর মাসের পর মাস খাব! ইনফ্যাক্ট, ও ক্যালকুলেট করে দেখাল, দেড় বছরের মধ্যে ফ্রিজাররের দাম উঠে আসবে!"

"নাহ, তোমাদের বাড়ি আর আসব না।" প্রমথ নাক সিঁটকে বলল, "এলেই ছ-মাসের পুরোনো মাছ খাইয়ে দেবে।"

"স্টুপিডামো করিস না!" শ্যামলদা ধমক দিলেন। "সুপারমার্কেট থেকে যখন মাছ কিনিস, তখন কি তোর জন্য নদী থেকে ওগুলো ফ্রেশ তুলে আনে? জায়ান্ট ফ্রিজারে ওগুলো যেসব স্টোর করা থাকে, সেটা জানিস না!"

একেনবাবু এতক্ষণ ফ্রিজারটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্যামলদার কথাগুলো শুনছিলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে ওঁর অনুকরণীয় ভঙ্গীতে মন্তব্য করলেন, "দিস কানট্রি ইস ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার।"

খাবার সময় আমরা আবার বেন্টুমাসির খপ্পরে পড়লাম। ফলে রীনা বৌদির দুর্দান্ত রান্না যে একটু প্রাণভরে উপভোগ করব, তা আর হয়ে উঠল না। ওঁর মাথায় এখন রহস্যের পোকা ঢুকেছে, সেটাকে তাড়াবে কে? ঘুরিয়ে– ফিরিয়ে সেই এককথা! যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম অন্তত কুড়ি বার বললেন বেন্টুমাসি, পাছে একেনবাবু ভুলে যান। অথচ নামটা এমন কিছু কমপ্লিকেটেড নয়, শ্যাম মিরচন্দানি। আর সার্ভেন্টটার নাম হল গোভিন্দ। সাধে কি আর শ্যামলদার ওখানে যেতে চাই না!

বিকেলে ফেরার পথে একেনবাবু হঠাৎ বললেন, "একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং স্যার, এদেশে মেডসার্ভেন্ট দেখেছি। কিন্তু কারো বাড়িতে কখনও সার্ভেন্ট দেখিনি।"

"তার কারণ মশাই অতি সিম্পল," প্রমথ বলল। "এখানে আপনি শুধু চেনেন আমাদের বন্ধুদের। হাই সোসাইটিতে যান না, বাটলার, সার্ভেন্ট, গর্ভনার, কুক সব কিছুই পাবেন।"

আমি বললাম, "একেনবাবুর অবজার্ভেশনে কিন্তু কোনো ভুল নেই এখানকার অনেক বড়োলোক ইন্ডিয়ান দেশ থেকে মহিলাদের নিয়ে আসেন বাড়ির কাজ করার জন্য। কিন্তু কাজের লোক কেউ এনেছেন বলে শুনিনি। আই ওয়ান্ডার হোয়াই!"

এ নিয়ে অবশ্য আর কোনো কথা হল না। যথারীতি একেনবাবুর চিন্তা ইতিমধ্যে অন্যদিকে চলে গেছে। বললেন, "যাই বলুন স্যার, আপনার বেন্টুমাসি কিন্তু খুব ফোর্সফুল মহিলা।"

প্রমথ বলল, "এত ভদ্রতা করছেন কেন মশাই, বলুন না জাঁহাবাজ!"

"ছি, ছি, কী যে বলেন স্যার, বাপিবাবুর মাসি!"

"আমারও তো পাড়াতুতো মাসি তা বলে মুখে এক পেটে একের মধ্যে আমি নেই।"

।। ২।।

একেনবাবু বেন্টুমাসিকে ভালোভাবে চেনেন না। নইলে সেদিন ফিরে এসেই গোভিন্দ সন্ধানে তৎপর হতেন। কোনো কিছু একবার মাথায় চাপলে সেটা চট করে ভুলে যাবার লোক, আর যেই হোক, আমার বেন্টুমাসি অন্তত নন! দু'দিনও পার হয়নি, সাত সক্কালে ওনার ফোন! সাধারণত এই সময়ে আমি ঘুমে অচেতন, নিতান্ত আজ সরস্বতী পুজো বলে অ্যালার্ম দিয়ে উঠেছি। ফোনে তুলতেই, 'কী খবর,' 'কেমন আছিস' – কিচ্ছু নয়। আমাকে সোজা জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, একেন হদিশ পেল কিছু, কোনো সাড়া-শব্দ নেই

তোদের?”

ভাগ্যিস একেনবাবু সামনেই বসে ছিলেন, আমি তাড়াহুড়ো করে একেনবাবুর হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিলাম। তারপর ঝাড়া পাঁচ মিনিট একেনবাবুর তরফ থেকে শুধু “হ্যাঁ” “তাই নাকি,” “আচ্ছা,” আর “না” ছাড়া – আর কিছু কানে এল না!

ফোনটা নামিয়ে একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “মাসিমা স্যার, আমাদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন!”

প্রমথ বলল “দাঁড়ান, দাঁড়ান, এর মধ্যে আবার ‘আমাদের’ কথাটা এল কোত্থেকে? খোঁজার ভার তো আপনার ওপর মশাই? ”

আমি বললাম, “চুপ কর, ওঁকে আর জ্বালাস না। আচ্ছা সত্যিই, লোকটা গেল কোথায় বলুন তো?”

“নো আইডিয়া স্যার। গতকাল আমি ইনস্পেকটর লান্ডিকে ফোন করেছিলাম।”

“সে আবার কে?” একেনবাবুকে থামিয়ে প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“হোয়াইট প্লেইন্স পুলিশের লোক। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের অফিসে একবার ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেই সূত্রেই ...।”

“ও হরি! তার মানে আপনি এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় নন! আমাদের আড়ালে-আবডালে অনেক কিছু চালিয়ে যাচ্ছেন!” প্রমথ ঠেস দিয়ে বলল।

“কী মুশকিল স্যার,” একেনবাবু আমাকে সাক্ষী মানলেন, “প্রমথবাবু এদিকে বলবেন টিমে নেই, আবার খেলতে না ডাকলে রাগ করবেন!”

“সত্যি,” আমি প্রমথকে বললাম, “তুই গাছেরও খাবি, তলারও কুড়োবি — সেটা তো চলে না!”

“তুই চুপ কর, আর ওকালতি করতে হবে না!” প্রমথ আমাকে ধমকে একেনবাবুকে হুকুম করল, “বলুন, যা বলছিলেন।”

“ও হ্যাঁ, স্যার, ইন্সপেক্টর লান্ডির কথা। উনিই গোভিন্দ জসনানির কেসটা হ্যান্ডেল করছেন।”

“গোভিন্দ জসনানি! বাঃ, এই তো একটা নতুন তথ্য!”

“কী নতুন তথ্য স্যার?”

“এই যে পদবীটা বললেন, ‘জসনানি’ — সেইটে। এদ্দিন পর্যন্ত তো লোকটা ছিলেন সার্ভেন্ট গোভিন্দ! ঠিক আছে, চালিয়ে যান।”

“বলার বিশেষ কিছুই নেই স্যার। পুলিশের কোনো ধারণাই নেই যে, লোকটা কোথায়!”

“ব্যাপারটা সত্যিই খুব স্ট্রেঞ্জ,” আমি বললাম। “হঠাৎ এভাবে একজনের হাওয়ায় উবে যাওয়া!”

“হাওয়ায় উবে যাবে কেন,” প্রমথ বলল, “নিশ্চয়ই কারো বাড়িতে আছে, বা কাছাকাছি কোনো হোটেলে গিয়ে উঠেছে! এই ঠান্ডায় তো আর কারোর পক্ষে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়!”

“হোটেলে কখনোই ওঠেনি,” আমি বললাম। “তাহলে পুলিশ খবর পেত।”

“সেক্ষেত্রে অ্যানসার ইজ সিম্পল। লোকটা পরিচিত কারোর বাড়িতে উঠেছে। সুতরাং কাজ হচ্ছে চেনা-জানা সবাইকে ফোন করে খোঁজ নেওয়া। কী মশাই, ওরকম ভুরু কুঁচকে বসে আছেন কেন? কিছু ভুল বলছি?” প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞসে করল।

“কী যে বলেন স্যার, ভুল বলবেন কেন? আমি আসলে একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।”

"আঃ, একটু ঝেড়ে কাশুন না! কী অন্য কথা?"

"মাসিমা একটু আগে বললেন যে, চেনা -পরিচিত কারোর কাছ থেকেই নাকি কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তাই উনি ভাবছেন যে, কোনো আমেরিকানের বাড়িতে গিয়ে হয়তো উঠেছে। আপনাদের কী মনে হয় স্যার?"

"আই ডাউট ইট," আমি বললাম। "অন্য জায়গার কথা বলতে পারব না, তবে নিউ ইয়র্কের কেউই কোনও অচেনা লোককে বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেবে না! কাজ দেওয়া তো দূরের কথা!"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম। তবে কিনা স্যার, আপনার হচ্ছেন এখানকার ভেটারেন লোক, এদের স্বভাবচরিত্র আপনারাই জানবেন বেশি।"

"তা হলে লোকটা গেল কোথায়?" প্রমথ খানিকটা আত্মগত ভাবেই প্রশ্নটা করল।

"দ্য অ্যানসার টু দ্যাট পাজল উইল হ্যাভ টু ওয়েট। এখন যা, চানটান করে রেডি হয়ে নে। পুজোয় যাবি না!"

"ওই যাঃ, আপনাদের তো বলাই হয়নি স্যার! পুজোর কথায় মনে পড়ল। মাসিমা বললেন, আজ হোয়াইট প্লেইন্সেও সরস্বতী পুজো। সেখানে যদি যাই, তা হলে অরুণ, অশোক, মানে মিস্টার সাহানিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আমাদের কথা মাসিমা ওঁদের বলেছেন। ওঁরাও স্যার খুব উৎসুক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে।"

"শুধু এই বলেছেন, না ওখানে যাবার হুকুম দিয়েছেন?" প্রমথ চোখ দুটো কুঁচকে প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

"তা একরকম প্রায় হুকুমই স্যার।" একেনবাবু ধরা পরে স্বীকার করলেন। "কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি একটু কনফিউসড।"

"কী ব্যাপারে?"

"মাসিমা বললেন যে, জার্সি সিটিতে নাকি নেক্সট উইকে পুজো। সেটা কী করে হয়?"

"তার কারণ খুব সিম্পল মশাই, আমেরিকাতে দেশের মতো অত লগ্ন-ফগ্ন বিচার করে পুজো হয় না। পুজো করতে হলে করতে হবে উইকএন্ডে, সে আপনাদের পাঁজি যাই বলুক না কেন।"

প্রমথর কথা শুনে একেনবাবু হাঁ হয়ে আছেন দেখে আমি আবার যোগ করলাম, "শুধু তাই নয়, সব জায়গায় পুজো যদি একদিনে হয়ে যায়, তা হলে তো এক উইকএন্ডেই সব কিছু ফুরিয়ে গেল! ঘুরেঘুরে আমরা আনন্দ করব কী করে!"

"দিস ইস অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং!" একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন।

সাধারণত আমরা ব্রুকলিনের একটা পুজোতে যাই। নিউ ইয়র্ক আর তার আশপাশ নিয়ে দুর্গাপুজোই হয় প্রায় গোটা দশেক। সরস্বতী পুজো তো অগুনতি! ভক্তি থাকলে অবশ্য যে কোনো পুজোয় গিয়ে অঞ্জলি দিলেই হয়। তবে আমি আর প্রমথ দু'জনেই হলাম অ্যাগনস্টিক। এইসব পুজোয়-ফুজোয় আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের পুজোয় যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিওর অ্যান্ড সিম্পল আড্ডা মারা! সেটা আবার চেনাপরিচিত জায়গায় না গেলে হয়ে ওঠে না। সুতরাং আমার কাছে হোয়াইট প্লেইন্সে যাওয়াটা আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন, গেলে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড বোর হব! বিশেষ করে আমার বেন্টুমাসি যেখানে থাকবেন! তার ওপর গতকাল প্রচণ্ড বরফ পড়েছে। রাস্তাঘাট এর মধ্যে কতটা পরিষ্কার করেছে কে জানে! ক'দিন তবু টেম্পারেচারটা ফ্রিজিং পয়েন্টের ওপরে ছিল।

কিন্তু আজ যা ঠান্ডা, রোদ্দুরেও বরফ গলবে না — এখন অ্যাকসিডেন্ট না হলেই বাঁচি! একেনবাবু অবশ্য আমাকে উৎসাহিত করার জন্য একটা বাড়তি আকর্ষণের কথা বললেন,

"ওখানে শুনলাম ভালো কালচারাল প্রোগ্রাম হয় স্যার।"

একেনবাবু আমেরিকাতে নতুন বলে ঠিক জানেন না যে, এখানকার বাঙালিদের কালচারাল সাইডটা আবার বড্ড উইক। ভালো প্রোগ্রাম মানে দু'-চারটে আনট্যালেন্টেড নাছোড়বান্দা গাইয়ে হারমোনিয়ামে প্যাঁ -পোঁ করে নর্মাল লোককেও পাগল করে ছেড়ে দেবে! কিন্তু আমার ওজর আপত্তি কেউই বিশেষ কানে তুলল না। প্রমথ যে প্রমথ, সেও দেখলাম হোয়াইট প্লেইন্সের দিকে ঝুঁকে বসেছে! আমি একা আর কত বাধা দেব! পুজোটা হচ্ছে হোয়াইট প্লেইন্সের একটা জুনিয়র হাই স্কুলে। প্রমথ ফোন করে শ্যামলদার কাছ থেকে ঠিকানা আর ডিরেকশনটা নিয়ে নিল।

।। ৩।।

স্কুলের হলঘরটা বিশাল। তার একদিকে পুজোর জায়গা, অন্যদিকে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবারের আয়োজন। আমাদের টাইমিংটা একেবারে পারফেক্ট, ভোগ বিতরণটা সবে শুরু হয়েছে! প্রত্যেক পাড়ার পুজোর স্ট্রং পয়েন্ট হল ভোগের নাম করে খাবারের দেদার আয়োজন! গরম গরম পাতলা অতি সুস্বাদু খিচুড়ি। তার সঙ্গে তিন রকমের তরকারি আর ভেজিটেবল চপ। গ্র্যান্ড ফিনালি হল পাঁপড়, চাটনি, দই আর দু'রকমের মিষ্টি দিয়ে। অবশ্য এবারের আয়োজনটা নাকি একটু বেশিই! সেটা শুনলাম ওখানকার এক কর্মকর্তা সুধীর শিকদারের কাছ থেকে। লোকটাকে শ্যামলদার বাড়িতে আগে কয়েকবার দেখেছি। চোখে পিচুটি কুমড়োপটাস টাইপের হাইলি আনহাইজিনিক অ্যান্ড আনহেলদি চেহারা। লোকটা অসম্ভব কথা বলে, তার ওপর মুখ দিয়ে থুতু ছেটায়! বিশ্বশুদ্ধু এত লোক থাকতে আমার ওপর হঠাৎ এত কেন সদয় হল, ভগবান জানেন! ঝাড়া পঁচিশ মিনিট হলের কোণে আমাকে কবজা করে অফুরন্ত বকলেন! ভাগ্যিস একেনবাবু এসে সাহানিদের খোঁজ করলেন! সাহানিদের কথা উঠতেই শিকদারমশাই বললেন, "চেনেন নাকি ওঁদের? কী স্যাড ব্যাপার বলুন তো! বাড়ির গেস্ট ডেড, আর আঙ্কল মিসিং!"

আমি বললাম, "আঙ্কল মিসিং মানে? আমি তো শুনেছিলাম মিসিং পার্সন হল গেস্ট ভ দ্রলোকের কাজের লোক!"

"ওয়েল," বলে শিকদারমশাই আমার ঠিক মুখের সামনে একগাদা জার্ম স্প্রে করে নোংরা রুমালে সশব্দে নাকটা ঝাড়লেন।

আমি জার্মগুলো এড়ানোর জন্য দম চেপে দাঁড়িয়ে আছি, সেই ফাঁকে পাশ থেকে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন। "কী 'ওয়েল' স্যার?"

"আসলে," শিকদারমশাই চারিদিকে একবার চট করে তাকিয়ে নিয়ে খুব মাই ডিয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "মিসিং ম্যান ঠিক ভৃত্য নন। আই মিন নট অ্যান অর্ডিনারি সার্ভেন্ট। ওঁর আসল পরিচয় হল উনি সাহানিদের এক দূর সম্পর্কের কাকা। সাহানিরা অবশ্য এটা কাউকে বলে না। এনিওয়ে হি ইজ অলসো শ্যাম মিরচন্দানি, মানে যে ভদ্রলোক মারা

গেছেন, তাঁর গ্রামেরই লোক এবং মিরচন্দানির বন্ধুও। মিরচন্দানির সঙ্গে সাহানিদের পরিচয় এই কাকার সূত্রেই।"

"দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান। আপনি বলছেন ছেলেবেলার বন্ধু, কিন্তু তাঁকে দিয়ে মিস্টার মিরচন্দানি গৃহ ভৃত্যের কাজ করাচ্ছিলেন!"

"এই তো আপনাদের নিয়ে মুশকিল, আপনার বড্ড বেশি সেন্টিমেন্টাল। এ জব ইজ এ জব। শ্যাম মিরচন্দানির সাতকূলে কেউ নেই। ভদ্রলোক কিছুদিন আগে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে ফুলটাইম লোক রাখার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। কিছুদিন প্রাইভেট নার্স রেখেছিলেন। কিন্তু এখানে প্রাইভেট নার্স রাখতে হলে যে কী খরচ সেটা তো জানেনই। তাই বুদ্ধি করে দেশ থেকে গরীব বন্ধুকে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ফ্রেন্ড কাম ফ্রেন্ড, হেল্পার কাম হেল্পার! বন্ধুকে মাইনেপত্র কী দিতেন অবশ্য জানি না, বাট আই বেট, যাই দিতেন না কেন – তাতে ওঁরও লাভ, ওঁর বন্ধুরও লাভ!"

সুধীর শিকদার হাঁড়ির এত খবর পেলেন কোত্থেকে কে জানে! আমরা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে, শিকদারমশাই বললেন, "যাক, এসব আবার কাউকে বলবেন না যেন! সাহানি ব্রাদার্স হচ্ছেন আমাদের পুজোর একজন বড় পেট্রন। শুধু শুধু চটিয়ে দিলে, বুঝতেই তো পারছেন ... কী মিন করছি!"

"তা বেশ পারছি স্যার," একেনবাবু বললেন, "থাক ওসব কথা। তবে একটা কথা স্যার, অবাঙালিরা সরস্বতী পুজোয় চাঁদা দিচ্ছে, শুনতেও ভালো লাগে!"

"না, তা ওঁরা দেন। মানুষের ভালো পয়েন্ট দেখলে, সেটা না বলার পাত্র এই সুধীর শিকদার নয়। দোষ দেখলে দোষ বলব, গুণ দেখলে গুণ।"

"সেটা হল মহৎ লোকের লক্ষণ স্যার।" বুঝলাম একেনবাবু একটু তেল দিলেন। তারপর বললেন, "ভালো কথা, কে জানি বলছিলেন যে, এখানকার ফুডের ইনচার্জ হলেন আপনি? যাই বলুন স্যার, আপনাদের এখানে ভোগের আয়োজনটা কিন্তু সত্যিই প্রচণ্ড!"

"ভাল লেগেছে?" শিকদারমশাই খুব খুশি হয়ে প্রশ্নটা করলেন।

"যেমন ভ্যারাইটি স্যার, তেমনি রান্নার কোয়ালিটি।" একেনবাবু শিকদারমশাইয়ের আত্মতৃপ্তিটা বলতে গেলে প্রায় চরমে তুলে দিলেন।

"কোয়ালিটির জন্য দায়ী এই শর্মা," নিজেকে দেখালেন শিকদারমশাই। "বুঝলেন মশাই, সারা বছরে এই একদিনই আমি রাঁধি। কিন্তু যখন রাঁধি, তখন চারশো লোকের জন্য রাঁধি! একটু পানবাহার চলবে নাকি?" পাঞ্জাবির পকেট থেকে টিনের একটা দোমড়ানো কৌটো বার করলেন সুধীর শিকদার।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!" একেনবাবু এক টিপ পানবাহার মুখে পুরে বললেন, "এখন একটু স্নাফ পাওয়া গেলেই সোনায় সোহাগা হত!"

"স্নাফ!"

"হ্যাঁ স্যার স্নাফ, মানে নস্যি।"

"অ্যাঁ, আপনিও নস্যিরসিক!" শিকদারমশাই এমন ভাবে একেনবাবুর দিকে তাকালেন, যেন বহুদিন বাদে ভাগ্যচক্রে হঠাৎ ট্যুইন ব্রাদারকে আবিষ্কার করেছেন! "তাহলে একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। আনলিমিটেড নস্যি সাপ্লাই একেবারে গ্যারান্টিড! আই কান্ট গিভ ইউ নাউ। গিন্নী নস্যির ডিবে নিয়ে বেরোলেই বড্ড চ্যাঁচামেচি করে! তাই তো একটু আগে সুট করে বাড়ি গিয়ে একটিপ নিয়ে এলাম।" তারপর আমার মুখের সামনে মুখ এনে বললেন, "আপনিও আসুন না মশাই, শেয়ার দ্য এক্সপিরিয়ান্স!"

কী ডিসগাস্টিং! মনেমনে ভাবলাম। মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, "না আমি নস্যি নিই

না।”

আমার গলার সুরে নিশ্চয় বিরক্তির ভাবটা স্পষ্ট ছিল। শিকদারমশাই তাতে একটু দমে যাচ্ছেন দেখেই বোধহয় একেনবাবু বেশ গদগদ স্বরে আবার বলে উঠলেন, “যাই বলুন স্যার, প্রতি বছর চারশো লোকের জন্য এত ভ্যারাইটি রান্না, তাও আবার এরকম দারুণ স্বাদ বজায় রাখা! ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার।”

শিকদারমশাই একেনবাবুর দিকে দারুণ অ্যাপ্রিশিয়েটিভ চোখে তাকালেন। ভাবটা, গুণীকে গুণী না চিনিলে, আর কে চিনিবে! তারপর বললেন, “হ্যাঁ, চারশোটা বরাবরই চারশো। তবে কিনা মিথ্যে বলব না, এত ভ্যারাইটি প্রতি বছর হয় না। এবারেরটা হল কমপ্লিমেন্ট অফ গ্রেট সাহানি ব্রাদার্স। ওরাই...”

শিকদারমশাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা কমবয়েসি ছেলে এসে ওঁকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল। শিকদারমশাই সামনে থেকে যেতে না যেতেই শুনলাম কেউ চাপা গলায় বলছে, “ফ্রো-জে-ন ফুড!”

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি প্রমথ। ও যে কখন এসেছে, টেরই পাইনি।

“ফ্রোজেন ফুড! কী বলতে চাচ্ছিস তুই?” আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“এই পুজোয় সাহানিদের কনট্রিবিউশন! ফ্রিজারে বোধহয় পচছিল, তাই সুযোগ বুঝে ডাম্প করেছে এখানে।”

“আপনি কী করে জানলেন স্যার?”

“কেন মশাই, আপনিই কি একা গোয়েন্দা এখানে! আমাদের চোখ-কান নেই?” তারপর বলল, “কয়েকটা ছেলে বলাবলি করছিল, কানে এল। অবশ্য আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। তরকারিগুলো কেমন যেন জল জল লাগছিল, তাই না?”

জল জল না মুণ্ডু! প্রমথটার ফ্রোজেন জিনিসের প্রতি একটা ভয় আছে। সব সময় বাজার থেকে ফ্রেশ ভেজিটেবল কিনবে। ফ্রেশ না পেলে ক্যানড। কিন্তু ফ্রোজেন কখনোই কিনবে না! লোকে বরং ক্যানড ফুডের ব্যাপারে সাবধান হয় — বচুলিজমের জন্য! কিন্তু কে কাকে বোঝায়!

“এই বাপি বিচ্ছুর মতো ওখানে লুকিয়ে আছিস কেন — এদিকে আয়!” বেন্টুমাসি উদাত্ত গলায় হলের অন্য প্রান্ত থেকে ডাক দিলেন।

আমি বিচ্ছু নই, লুকিয়েও নেই। তাছাড়া আমি একা নই, আরও দু’জন — একেনবাবু ও প্রমথ আমার পাশে দাঁড়িয়ে। তবু সম্বোধনটা শুধু আমাকে কেন করা হল বুঝলাম না! তবে কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল, যখন দেখলাম হলভর্তি লোক বেন্টুমাসির এই বিচ্ছু বোনপোর দিকে তাকিয়ে আছে!

“কী ব্যাপার, চ্যাঁচামেচি করছ কেন?” বেন্টুমাসির সামনে গিয়ে একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্নটা করলাম।

বেন্টুমাসি আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একেনবাবুকে বললেন, “এই যে একেন, এ হচ্ছে অশোক, আর এ হল অরুণ। এরা তোমার কথা খুব ভালো করে জানে।”

“এঁরা?” অশোক আমাদের দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন।

“ও হ্যাঁ,” এবার আমাদের কথা মনে পড়ল বেন্টুমাসির। “এই অকালকুষ্মাণ্ড হতভাগা হচ্ছে আমার বোনপো বাপি, আর এটা হল ওর যোগ্য সহচর প্রমথ।”

এরকম একটা ইনট্রোডাকশনের পর কার না দিল খুশ হয়!

।। ৪ ।।

অশোক অরুণ কারও চেহারাই টিপিক্যাল ভারতীয় নয়। ওঁদের মধ্যে অশোকের রঙ একটু চাপা। অরুণকে অন্য কোথাও দেখলে আমি নির্ঘাত ইটালিয়ান আমেরিকান বলে ভুল করে বসতাম! শুধু চেহারা নয়, ওঁদের হাবভাবটাও বেশ সাহেবি। আসলে ওঁরা সিন্ধি। তবে কোলকাতায় বড় হয়েছেন বলে দু'জনেই খুব ভালো বাংলা জানেন। কথোপকথন তাই বাংলাতেই হল। প্রাইভেসির জন্য হলঘরে দাঁড়িয়ে না থেকে, একটা ক্লাসরুম খোলা দেখে সেখানে সবাই ঢুকলাম। ক্লাসরুমটা নিশ্চয় কিন্ডারগার্ডেনের বাচ্চাদের। ঘরের একপাশে বাক্সভর্তি খেলনা, দেয়াল জুড়ে কাঁচা হাতে আঁকা অজস্র ছবি, আর চেয়ারগুলোরও যা সাইজ, তাতে আমরা কেন, টিঙটিঙে একেনবাবুও আঁটবেন কিনা সন্দেহ!

"বসে পড় সবাই," বেন্টুমাসি আমাদের ওপর হুকুম জারি করে নিজে অবশ্য টিচারের চেয়ারটা দখল করলেন।

"এগুলোতে আবার বসা যায় নাকি, এত ছোটো!" বিড়বিড় করে এরকম কিছু বলে প্রমথ আবার একটা কমপ্লেন পেশ করার চেষ্টা করেছিল। বেন্টুমাসি পুরোপুরি সেটা উপেক্ষা করলেন।

কী আর করা, অগত্যা অনেক কসরত করে বাচ্চা চেয়ারগুলোতেই কোনোমতে সবাই বসলাম। বলা বাহুল্য, সমস্ত ব্যাপারটাতে বেন্টুমাসির উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। অশোক বা অরুণ কেউই মনে হল না আলোচনায় খুব একটা উৎসুক। তাতে অবশ্য তারা নিস্তার পেল না। বেন্টুমাসি অর্ডার করলেন, "অশোক, একেনকে বিস্তারিত বল, তোমাদের গেস্ট কবে এসেছিলেন, কী করে মারা গেলেন, কখন তোমাদের সন্দেহ হল, যা যা মনে আছে। কোনো কিছু বাদ দিও না। ডিটেকটিভদের সব কিছু জানা দরকার।"

অশোক বেচারা আমতা আমতা করে বলল, "তা বলছি আন্টি। তবে কিনা এটা একেবারেই পিওর সন্দেহ। মানে বলতে চাইছি, হয়তো পুরোপুরি ভুল সন্দেহই।"

সাক্ষী প্রথমেই বিগড়োচ্ছে দেখে বেন্টুমাসি ধমক দিলেন, "আঃ, সন্দেহ ভুল না ঠিক, সেটা তো একেন বিচার করবে। তুমি শুধু বলে যাও কী কী ঘটেছিল!"

অশোক আমাদের দিকে একটু অসহায় ভাবে তাকিয়ে শুরু করলেন, "দিন দশেক আগে শ্যাম আঙ্কল, মানে মিস্টার মিরচন্দানি, আমাদের বাড়ি আসেন। সঙ্গে ওঁর পার্সোনাল অ্যাটেনডেন্ট।"

"মিস্টার মিরচন্দানি কি স্যার আপনার কাকা হন?"

"না, না, আমরা ওঁকে আঙ্কল বলে ডাকি, কারণ উনি আমার কাকার পরিচিত বলে। নো রিলেশন।"

"মিরচন্দানি কোথায় থাকতেন একেনকে বলো।" বেন্টুমাসি অশোককে বললেন।

"ও হ্যাঁ, সান ফ্রানসিস্কোতে।"

"আরেকটু বিশদ করে বলো। একা, না ফ্যামিলি নিয়ে? ছেলেপুলে ক'টা? এসব ডিটেলস না বললে চলবে কেন!"

"রাইট আন্টি।" অশোক সসম্ভ্রমে বলল। "হ্যাঁ মিস্টার সেন, মানে উনি একাই থাকতেন। ওঁর স্ত্রী মারা যান শুনেছি প্রায় আট বছর আগে, নিঃসন্তান অবস্থায়।

এখানে ওঁর আপনজন বলতে শুধু বন্ধুবান্ধব।"

"ওঁর এই পার্সোনাল অ্যাটেনডেন্টটি কোথাকার স্যার?" এবার একেনবাবুর প্রশ্ন।

"উনি শ্যাম আঙ্কলের গ্রামের লোক। বছর পাঁচেক আগে শ্যাম আঙ্কল খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁকে দেশ থেকে আনিয়ে নেন। হেল্পার কাম সঙ্গী হিসেবে কাজ করার জন্য।"

"আপনারা এই হেল্পারটিকে আগে চিনতেন?"

প্রশ্নটাতে অশোক একটু হতচকিত হয়ে বললেন, "মানে হ্যাঁ, গোভিন্দ আঙ্কলকেও আমরা চিনতাম। আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ওঁর পাশের গ্রামে।"

"তারপর স্যার?"

"শ্যাম আঙ্কল নিউ ইয়র্কে আসার আগে আমাদের ফোন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দু'জনের স্ত্রীই দেশে বেড়াতে গেছেন শুনে, প্রথমে আমাদের বাড়িতে এসে উঠতে চাননি। আমরাই জোরজার করে আসতে রাজি করাই।"

"এই দেখো, উনি এসেছিলেন কী করতে, সেটাই তো বলছ না!" মনে হল বেন্টুমাসির উত্তরটা জানা। তবু আমাদের খাতিরেই যেন অশোককে প্রশ্ন করলেন, "উনি কি বেড়াতে এসেছিলেন?"

"নো, ইট ওয়াজ এ বিজনেস ট্রিপ।"

"তা কী ধরনের বিজনেস সেটা না বললে একেন বুঝবে কী করে!" বেন্টুমাসির সদা-সতর্ক দৃষ্টি, অশোক সূক্ষ্ম কোনো পয়েন্ট যাতে না মিস করে!

"মানে, আসলে আই অ্যাম নট শিওর। উনি এসব নিয়ে খুব একটা কথা বলতেন না। তবে আমার ধারণা প্রেশাস স্টোনের ব্যাবসা।"

"মানে হিরে-জহরতের কারবার! পাছে একেনবাবু প্রেশাস স্টোন কথাটার মানে ধরতে না পারেন, তাই বেন্টুমাসি বিশদ করে দিলেন! "

"এবার ওঁর মারা যাবার ব্যাপারটা বল।" বেন্টুমাসির নেক্সট হুকুম।

"ওয়েল, আজ থেকে ঠিক ছ'দিন আগে ম্যানহাটানে একটা কাজ সেরে ফিরেই উনি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমাদের বাড়ির একদম কাছেই আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের অফিস। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেকে আনে। ইট ওয়াজ এ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি মারা যান।"

"এসব যখন ঘটছে স্যার, তখন মিস্টার জসনানি কোথায়?"

"উনি বাইরে ছিলেন। শ্যাম আঙ্কল ম্যানহাটান থেকে ফিরেই ওঁকে একটা প্যাকেজ কাউকে ডেলিভারি করতে পাঠান।"

"কাকে পাঠান জানেন স্যার?"

"তা তো বলতে পারব না।"

"কখন ফেরেন উনি?"

"টাইমটা বলতে পারব না। আমরা দু'জনেই তখন অ্যাট এ স্টেট অফ ডেইজ! আমাদের মানসিক অবস্থা দেখে ডক্টর রাসেল, মানে আমাদের ফিজিশিয়ান, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে, সিটি অথরিটির পারমিশন নিয়ে একটা ফিউনারেল হোমের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করতে। আমরা যখন শ্যাম আঙ্কলের পরিচিত এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের ফোন করার চেষ্টা করছি, তখন গোভিন্দ আঙ্কল বাড়িতে ঢোকেন।"

"উনি কীভাবে রিয়্যাক্ট করেছিলেন স্যার?" উনিও কি আপনাদের মতই শকড হয়েছিলেন?

"আমার তো তাই মনে হয়েছিল। অ্যাট লিস্ট দ্যাট্স হোয়াট উই ফেল্ট। উনি শ্যাম

আঙ্কলের বিছানায় বসে ভীষণ কাঁদছিলেন! ”

“তারপর?”

“আমি আর অরুণ ওঁকে একা রেখে, লিভিংরুমে বসে ফোন-টোনগুলো করতে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে গোভিন্দ আঙ্কল লিভিংরুমে আমাদের কাছে এসে বসেন। ইতিমধ্যেই উনি অনেকটা সামলে উঠেছেন। আমাদের বলেন যে, উনি সান ফ্রানসিস্কোতে কতগুলো লং ডিস্টেন্স কল করতে চান। আমাদের কোনো অসুবিধা আছে নাকি। এটা আবার কোনো কথা হল! আমি বলি, নিশ্চয়। তারপর আমরা দু’জনে ওঁকে লিভিং রুমে রেখে, আমাদের অন্য ফোনটা ব্যবহার করার জন্য ওপরে যাই।”

“কখন আপনার খেয়াল হল স্যার যে, মিস্টার জসনানি অদৃশ্য হয়েছেন?”

“যখন খবর পেয়ে লোকজন আসতে শুরু করে তখন। অরুণই প্রথম নোটিস করে।”

“দ্যাট্স কারেক্ট,” অরুণ সায় দিল। “আমার খেয়াল হয় এই কারণে যে, শ্যাম আঙ্কলের পায়ের কাছে একটা স্যামসোনাইট ব্রিফকেস ছিল। ইন ফ্যাক্ট ম্যানহাটানে যাবার সময় ওই ব্রিফকেসটা উনি আমার কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিলেন। ব্রিফকেসটা খুলে শ্যাম আঙ্কল যখন গোভিন্দ আঙ্কলকে প্যাকেজটা দিচ্ছিলেন, তখন আমার চোখে পড়ে ব্রিফকেসটা ক্যাশ টাকায় ভর্তি। তাই লোকজন আসার আগে আমি ভাবলাম ব্রিফকেসটা সরিয়ে একটা সেফ জায়গায় রেখে দেব। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে নেই। আমি ভাবলাম গোভিন্দ আঙ্কল বোধহয় বুদ্ধি করে ওটা সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু গোভিন্দ আঙ্কলকেও কোথাও খুঁজে পেলাম না। তখনও আমি বুঝিনি যে হি লেফট ফর গুড। কারণ ওঁর সুটকেস, জামাকাপড় সব কিছুই ওঁর ঘরে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে!”

“কত টাকা ওই ব্রিফকেসে ছিল বলে তোমার মনে হয় অরুণ?” বেন্টুমাসির প্রশ্ন।

“ঠিক বলতে পারব না মাসিমা। আমি শুধু কয়েক পলকের জন্যই দেখেছিলাম। তবে মনে হয়েছিল যে একশো ডলারের নোটে ভর্তি ওটা। ইন ফ্যাক্ট আমি শ্যাম আঙ্কলকে বলেছিলাম যে, হি শুড নেভার ক্যারি সো মাচ ক্যাশ ইন ম্যানহাটান।”

“একেই বলে ভবিতব্য!” বেন্টুমাসি মন্তব্য করলেন, “ম্যানহাটানে সাত গুণ্ডা কিছু করতে পারল না। মরলি তুই ঘরের শত্রু বিভীষণের হাতে!”

অশোক কাঁচুমাচু মুখে বলল, “ওঁর ডেথটা কিন্তু নর্মাল হার্ট অ্যাটাকে মাসিমা।”

“সেটা বাপু তোমাদের ভালোমানুষের বিচার! একেনের ওপর ভার ছেড়ে দাও।

দেখবে কেমন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়!”

“ভালো কথা স্যার,” একেনবাবুর অরুণকে প্রশ্ন করলেন, “উনি আপনার ব্রিফকেসটা নিতে গেলেন কেন?”

“সেদিন সকালেই ওঁর ব্রিফকেসের হিঞ্জটা ভেঙে গিয়েছিল। গোভিন্দ আঙ্কল দোকানে গিয়েছিলেন একটা নতুন ব্রিফকেস কিনতে। কিন্তু ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, আমারটা নিয়েই উনি চলে যান।”

“আরেকটা কথা স্যার, মিস্টার জসনানির আত্মীয়স্বজন এদেশে কেউ আছেন কি?”

“নট দ্যাট আই নো অফ। তবে লং আইল্যান্ডে ওঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই থাকেন। তাঁর কাছে খোঁজ করা হয়েছিল। তিনি কিছুই জানেন না।”

“ওঁর ফোন নম্বর-টম্বরগুলো একেনকে দিয়ে দিও।” বেন্টুমাসি অশোককে বললেন।

“এক্ষুণি তো আমার কাছে নেই মাসিমা। আপনার ফোন নম্বরটা দিন মিস্টার সেন, আমি ফোন করে পরে আপনাকে জানিয়ে দেব।”

"ফোনের কোনো দরকার নেই স্যার। বরং আমিই একসময় আসব। সেই সময় ওঁর সুটকেস –টুটকেসগুলোও একটু ঘেঁটে দেখব, যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায়।"

"শিওর, এনি টাইম।" অশোক বললেন।

"এনি টাইমের আবার দরকার কী বাপু, আজই যাও না!" বেন্টুমাসি একেনবাবুকে বললেন।

"আজ একটু অসুবিধা আছে মাসিমা। আমরা এখান থেকে কানেক্টিকাটে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। কাল সকালে আসুন না," একেনবাবুকে বললেন অরুণ।

"ঠিক আছে স্যার, কালই আসব।" কথাটা বলে একেনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী স্যার, কোনো অসুবিধা আছে?"

"নট অ্যাট অল।" আমি উত্তর দিলাম।

ইতিমধ্যে শ্যামলদা ঘরে ঢুকেছেন। অরুণ শ্যামলদাকে দেখে বললেন, "শ্যামলভাই, কিংস সুপারমার্কেটে গোয়িং আউট অফ বিজনেস সেল চলছে। ফ্যান্টাস্টিক বার্গেন। খুব ভাল শাকসবজি পাওয়া যায় ওখানে। অজস্র ভ্যারাইটি। কিন্তু আজকেই লাস্ট দিন।"

"তাই নাকি, তাহলে তো যেতে হয়!"

আমি শ্যামলদার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে। শ্যামলদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, যাবি আমার সঙ্গে?"

আমি তো এক পায়ে খাড়া, এনি প্লেস অ্যাওয়ে ফ্রম বেন্টুমাসি! প্রমথ আর একেনবাবুও দেখলাম গুটিগুটি সঙ্গ নিয়েছেন!

কিংস সুপারমার্কেট স্কুল বিল্ডিং থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে। চকচকে ঝকঝকে বিশাল মার্কেট। এরকম একটা বিজনেস কী করে ফেল করে কে জানে! অবশ্য এদেশে যা কম্পিটিশান! দোকানটা লোকে গিজগিজ করছে, কী ভিড়, কী ভীড়! হবে নাই বা কেন। থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট অফ নর্মাল প্রাইসে সব কিছু বিক্রি হচ্ছে! শ্যামলদা তো প্রায় আড়াইশো ডলারের ফ্রোজেন ফুডই কিনলেন। তারপর আমাকে বললেন, "দেখলি এক চালেই ফ্রিজারের দাম অনেকটাই তুলে নিলাম। এগুলোর নর্মাল প্রাইস অন্তত চারশো ডলার, ঠিক কিনা?"

নাঃ, সাহানি ব্রাদার্স খুব একটা ভুল বলেনি! আমার অ্যাপার্টমেন্টটা আরেকটু বড় হলে, আমিও একটা বড় দেখে ফ্রিজার কিনতাম!

।। ৫ ।।

পরদিন দুপুর নাগাদ সাহানিদের বাড়ি গেলাম। একেনবাবুর অবশ্য সাতসকালেই ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার আর প্রমথর জন্য পেরে ওঠেননি! আসলে একেনবাবু এখনও এগুলো ঠিক বোঝেন না। এদেশে হুট করে কারুর বাড়িতে কেউ গিয়ে হাজির হয় না। যাবার আগে অন্তত একটা ফোন করে জেনে নেয় কখন গেলে সুবিধা হবে। অবশ্য মনে হবে, সেটা আবার কী হাতিঘোড়া ব্যাপার? ফোন তো যখন খুশি করা যায়!

কিন্তু সেটাই ঠিক যায় না। আসলে শুক্র-শনিবার এখানে অনেকেই লেট নাইট করে শোয়। সুতরাং, আটটা-ন'টায় ফোন করা মানে ডেফিনেটলি তার কাঁচা ঘুম ভাঙানো! উইকেন্ডে তাই দশটা-এগারোটার আগে সাধারণত কেউ কাউকে ফোন করে না — নিতান্ত দায় না পড়লে।

যাক সে কথা। সাহানিদের বাড়িটা হল হোয়াইট প্লেইন্সের একেবারে নর্থ এন্ডে। উঁচু টিলার ওপরে একটা কাল-ডি-স্যাক, তারই একেবারে শেষের বাড়িটা হচ্ছে ওদের। বাড়ির ঠিক পেছন থেকেই শুরু হয়েছে ঢাল। জমিটা ওখানে এত ঢালু যে, পেছনের ডেকবারান্দাটাকে ঠ্যাকা দিতে হয়েছে উঁচু-উঁচু কাঠের গুঁড়ি দিয়ে। বাড়ির পেছন থেকে শুরু করে ঢালের নীচ পর্যন্ত পুরোটাই মেপেল, স্প্রুস, আর ডগউডের জঙ্গল। হরিণের পাল এসে প্রায়ই নাকি ওখানে খেলে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ভালুকও দেখা যায়। একবার নাকি একটা ভালুক একবারে ডেকের ওপর উঠে এসেছিল। খবরটা অশোক দিলেন, আমাদের সবাইকে ডেকটা দেখাতে এনে। ডেকটা অবশ্য দেখারই মতো। যেমন বিশাল, তেমনই শক্তপোক্ত। তবে সুরক্ষিত বিশেষ নয়। হরিণ ইজ ওকে। কিন্তু চিড়িয়াখানার বাইরে ভালুকগুষ্টির সঙ্গে মোলাকাত করার ইচ্ছে আমার এতটুকু নেই! আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতেও লোকে খুঁজে খুজে এই ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি করে কেন?

এমন সময় প্রমথ ডেকের রেলিংটা ধরে ঝুঁকে আমাকে বলল, "বুঝলি এই বারান্দা থেকে কেউ যদি লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! গড়াতে গড়াতে একদম ভ্যানিশ হয়ে যাবে!"

নিশ্চয়ই নির্দোষ উক্তি। কিন্তু কেন জানি না, আমার হঠাৎ গোভিন্দ জসনানির কথা মনে এল। এটা কী সম্ভব যে, উনি শোক সামলাতে না পেরে সেদিন এই ডেক থেকেই নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন?

আমার মনের কথাটা অরুণ টের পেলেন কিনা জানি না, হঠাৎ নিজের থেকেই বললেন,"পুলিশ এই জঙ্গলটা বেশ ভালো করে খুঁজেছে, যদি কোনো কারণে মিস্টার জসনানি সুইসাইড করে থাকেন, এই ভেবে।"

"ধরে নিচ্ছি স্যার, তারা কিছুই পায়নি," একেনবাবু বললেন।

"না, কিচ্ছু না।" উত্তর দিলেন অরুণ।

এমন সময় একটা দমক হাওয়া এসে সবারই হাড় কাঁপিয়ে দিল।

"চলুন স্যার, ভেতরে যাওয়া যাক," একেনবাবু বললেন। "বড্ড ঠান্ডা বাইরে।"

ভেতরে ঢুকে আমরা ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসলাম। ডেকের সঙ্গে লাগোয়া এই ঘরটা হল সাহানিদের ফ্যামিলি রুম। খেয়াল করলাম, এই ঘরের কার্পেটের অবস্থাটা অন্যান্য ঘরের তুলনায় খানিকটা জরাজীর্ণ। অর্থাৎ আড্ডা দেবার জন্য এ ঘরটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। যদিও বসার ঘরের কোনো কমতি বাড়িটাতে নেই। একটা বিশাল লিভিং রুম তো আছেই, তার ওপর বেশ ভদ্র সাইজের একটা ডেন, এবং বেসমেন্টে একটা রিক্রিয়েশন রুম! আমার অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং-

কাম-কিচেন-কাম-ডাইনিং এর ব্যাপার এটা নয়! প্রমথটা অবশ্য হিংসুটে! এর ফাঁকেই ফিসফিস করে আমাকে বলল, "শুধু টাকা থাকলেই হয় না রে, টেস্ট থাকা চাই। দেয়ালের ছবিগুলো দেখেছিস, নো কালচার!"

প্রমথর কথাটা নির্দয় হলেও, অসত্য খুব একটা নয়। আমি ওদের এটিজারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই যেখানকার কোনো জিনিস ওখানে রাখা নেই। কিন্তু একের ওপর একটা জিনিস চাপিয়ে ঠাসাঠাসি করে জগাখিচুড়ি করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে শুধু একেনবাবুই দেখলাম মুগ্ধ। বললেন, "কী কালেকশন স্যার আপনাদের, একেবারে অ্যামেজিং, সত্যিই স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং!"

এই স্তুতিবাক্যটার জন্যই বোধহয় চায়ের সঙ্গে বড় গুলাবজামুনগুলো উনিই পেলেন! এটা অবশ্য প্রমথর অবজার্ভেশন। আমি নিজে সাইজের কোনো তফাৎ ধরতে পারিনি! তবে এটা ঠিক যে, সাহানি ব্রাদার্স একেনবাবুকেই খাতিরটা বেশি করছিলেন। করবেন নাই-বা কে, বেন্টুমাসি আমার আর প্রমথর যে ইনট্রোডাকশনটা গতকাল দিয়েছেন, তাঁতে ওরা যে আমাদের খেতে দিচ্ছেন, সেটাই যথেষ্ট!

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ওপরে গেস্ট রুমে গিয়ে মিস্টার জসনানির বাক্সপত্রগুলো ঘাঁটলাম। ইন্টারেস্টিং বলতে কিছুই পাওয়া গেল না। বেশ কিছু জামাকাপড়, সান ফ্রানসিস্কোতে ফিরে যাবার রিটার্ন টিকিট, কয়েকটা ম্যাগাজিন, পানবাহারের দু'টো কৌটো, আর একটা ডায়েরি। ডায়েরিটার পাতা উলটে দেখলাম তাতে ডেইলি এনট্রি বলতে প্রায় কিছুই নেই। থাকার মধ্যে অনেকগুলো লোকের ফোন নম্বর আছে। এরিয়া কোড দেখে বুঝলাম যে, সেই লোকগুলোর বেশিরভাগই বে-এরিয়া, মানে সান ফ্রানসিস্কো, বা তার আশেপাশে কোথাও থাকে। অরুণ জানালেন যে, এদের সকলের সঙ্গেই পুলিশ যোগাযোগ করেছে, কিন্তু কেউই মিস্টার জসনানির কোনো হদিশ দিতে পারেনি।

"এদেশের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা স্যার। একজন অর্ডিনারি মিসিং ওল্ড ম্যানের জন্য পুলিশ কত খোঁজখবর করছে!" একেনবাবু মন্তব্য করলেন।

অশোক বললেন, "আসলে কেসটা এখন আর ঠিক অর্ডিনারি নয়। পুলিশ জানে যে, গোভিন্দ আঙ্কল প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন।"

"তাই নাকি স্যার! মিলিয়ন ডলারের কথাটা তো আগে শুনিনি?"

"কাল রাত্রেই আমরা পুলিশের কাছে শুনলাম। শ্যাম আঙ্কল যার সঙ্গে বিজনেস করতে এসেছিলেন, তাঁকে পুলিশ খুঁজে বার করেছে। তিনিই পুলিশকে টাকার অঙ্কটা বলেছেন।"

অরুণ যোগ করলেন, "আমি অবশ্য তাতে আশ্চর্য হইনি। দ্যাট ব্রিফকেস ওয়াস ফুল অফ ডলার বিল্‌স!"

"মিলিয়ন ডলার্স! মানে তো প্রায় ছ'-কোটি টাকা! অত টাকা ব্রিফকেসের মধ্যে? একেবারে আনবিলিভেবল স্যার!"

"কেন?" প্রমথ বলল। "এক মিলিয়ন ডলার মানে এক হাজার ডলারের এক হাজারটা নোট। বড় ব্রিফকেসও লাগবে না, একটা ছোট ব্রিফকেসেই দিব্যি এঁটে যাবে!"

"না, না, তা বলছি না। আসলে টাকার অঙ্কটা স্যার মাথা ঘুরিয়ে দেয়!", বলে একেনবাবু সাহানি ব্রাদার্সকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভালো কথা স্যার, মিস্টার জসনানির কি কোনো ফটো আপনাদের কাছে আছে?"

"খুব রিসেন্ট ফটোই আছে। ক'দিন আগের তোলা।" বলে অরুণ পাশের ঘর থেকে ফটোম্যাটের একটা খাম নিয়ে এলেন। সেখান থেকে একটা ফটো বার করে আমার হাতে দিলেন।

চশমা-চোখে সৌম্য চেহারার এক ভদ্রলোক বসে-বসে বই পড়ছেন। চুলগুলো সব পাকা। ফটোতে অবশ্য বয়সটা সব সময় বোঝা যায় না। তাও আন্দাজ করলাম ষাটের কোঠায় প্রায় হবে।

"এই যে আরেকটা ফটো।"

এই ফটোটাতে মিস্টার জসনানি গাড়ির ড্রাইভার্স সিটে বসে আছেন। পাশে অশোক।

"গোভিন্দ আঙ্কল গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসতেন। আই মিন বাসেন। আই অ্যাম সরি, আই ডোন্ট নো হোয়াট আই অ্যাম সেইং!"

"তাতে কী হয়েছে স্যার। আমরা তো কেউই জানি না, উনি বেঁচে আছেন না নেই!"

হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ হল। আচ্ছা, মিস্টার জসনানি কি একটা ফলস পাসপোর্ট জোগাড় করে ইন্ডিয়াতে চলে যেতে পারেন? এরকম একটা সৌম্য চেহারার লোককে কে সন্দেহ করবে?

একেনবাবুর অ্যাটেনশন ইতিমধ্যে ছবি থেকে ক্যামেরায় চলে গেছে। অরুণের কী ক্যামেরা, তার কত দাম, কোথায় ভাল ক্যামেরা সস্তায় পাওয়া যায় ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন। উনিও বহুদিন ধরে একটা ক্যামেরার খোঁজ করছেন, কিন্তু আমি বা প্রমথ কেউই ও বিষয়ে কিছু জানি না। অরুণ বুঝলাম, ক্যামেরার একজন সমঝদার! সুতরাং একেনবাবুকে আর পায় কে! আমি আর প্রমথ বোর হচ্ছি দেখে অশোক আমাদের নীচে বেসমেন্টে ওঁদের রিক্রিয়েশন, সংক্ষেপে রেকরুমে নিয়ে গেলেন।

রেক রুমটা ঠিক আলাদা নয়। ওপেন বেসমেন্টের কিছুটা অংশ কার্পেট দিয়ে ঢেকে, আর সাইড প্যানেল লাগিয়ে একটা আলাদা অস্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। বেসমেন্টের অন্য দিকটা রেকরুম থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। সেখানে সারা বাড়িতে গরম জল সাপ্লাই করার জন্য বিশাল ওয়াটার হিটার, সেন্ট্রাল হিটিংয়ের ফার্নেস। এছাড়া ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ার, ফ্রিজার, সব সারি সারি করে সাজানো। রেক রুমের একপাশে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল, অন্য দিকে বসার জায়গা, আর একটা বইয়ের আলমারি।

প্রমথটা দুর্দান্ত বিলিয়ার্ড খেলে। ওঁর সঙ্গে খেলার কোনো অর্থ হয় না। আর কিছু না পেলে হয়তো খেলতেই হত, কিন্তু লাকিলি বুক শেলফে সময় কাটানোর কয়েকটা ভালো রসদ পেয়ে গেলাম। মডার্ন পেইন্টিংয়ের ওপর কতগুলো চমৎকার বই। প্রমথ আর অশোক এখন যত খুশি বিলিয়ার্ড খেলুক, আই ডোন্ট কেয়ার!

বইগুলো ফ্যাসিনেটিং, কিন্তু পাতা ওলটাবার বেশি সময় পেলাম না কারণ, খানিক বাদেই একেনবাবু নেমে এলেন। কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে ধপ করে আমার পাশে বসে বললেন, "দেখেছেন স্যার, ওঁদের ফ্রিজারটাও শ্যামলবাবুর বাড়ির মত।"

দেখছেন আমি বই পড়ছি, কিন্তু তাতে একেনবাবুর বকবকানি কিছু আটকাল না! আমি বই থেকে চোখ না সরিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

"ওয়াশিং মেশিনটা ডিফারেন্ট কোম্পানির স্যার, এটা হল হট পয়েন্টের তৈরি। শ্যামলবাবুদেরটা বোধহয় জি.ই -র, তাই না?"

হু কেয়ার্স! আমি মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু মুখ ফসকে বলে ফেললাম, "জি.ই. আর হট পয়েন্ট একই কোম্পানির প্রোডাক্ট। শুধু লেবেলটাই আলাদা।"

"সেটা কী করে হয় স্যার? এক কোম্পানির জিনিস হলে দুটো আলাদা নাম কেন?"

"কেন হবে না," আমি বললাম। "ক্যাডিলাক, বিউইক, শেভ্রলে — এই নামে তো হরেক রকমের গাড়ি রাস্তায় দেখতে পান। কিন্তু সবগুলোর পেরেন্ট কোম্পানি হচ্ছে জেনারেল মোটরস, এটা জানেন না?"

একেনবাবু আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, "নাউ ইট মেকস সেন্স স্যার।"

"হোয়াট মেকস সেন্স?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কাল খবরে শুনছিলাম যে, জেনারেল মোটরস ইজ ইন ফাইনান্সিয়াল ট্রাবল। আর আমি বোকার মতো ভাবছিলাম, জেনারেল মোটরস আবার কোন গাড়ি বানায়! এই এখন জানলাম, ক্যাডিলাক, বিউইক, শেভ্রলে! মাই গুডনেস! যাই হোক স্যার, আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে।"

"কী প্রশ্ন?"

"গাড়ি নিয়ে নয় স্যার, ওয়াশিং মেশিন নিয়ে।"

এর পর কি আর কনসেনট্রেট করে কিছু পড়া যায়! আর যতসব ফালতু কোয়েশ্চেন! কী করে ওয়াশিং মেশিন কাজ করে, নর্মাল সাইকেল আর পার্মানেন্ট প্রেস সাইকেলের তফাত কী, চালাতে কত ইলেকট্রিসিটি খরচা হয় — এইসব! তারপরে ফ্রিজার নিয়ে প্রশ্ন। কী করে ভেতরটা এত ঠান্ডা হয়? কমপ্রেসার কী, ফ্রিয়ন কেন ব্যবহার করা হয়? সেখান থেকে চলে গেলেন গ্যাস ফার্নেসে। শুধু প্রশ্ন নয়, সেই সঙ্গে নেড়েচেড়ে সব দেখা! এটা ওঁর অত্যন্ত ব্যাড হ্যাবিট। নতুন কিছু দেখলেই হলো, তার নব ঘুরিয়ে, বোতাম টিপে, ডালা খুলে সব কিছু দেখা চাই! আর ইন দ্য প্রসেস একটা কিছু ঘোঁট পাকান। হ্যাপাটা পরে আমাদেরই সামলাতে হয়! সেইজন্য খুটখুট শুরু করলেই আমি কিংবা প্রমথ গিয়ে আটকাই। অবশ্য ভাগ্য ভালো আজ তেমন কোনো অঘটন ঘটল না। শুধু ফ্রিজারের ডালাটা পুরো বন্ধ না করেই দেখি উনি চলে গেছেন। ভাগ্যিস আমি পরে সব কিছু চেক করছিলাম! ঠিক করে বন্ধ করে দিলাম। ফ্রিজারটা চললেও লাকিলি ভেতরে কিছু ছিল না। সুতরাং নষ্ট হবার আর প্রশ্ন ওঠে না। তাও একেনবাবুকে ওঁর অপকর্মের কথাটা বলে লজ্জা দিলাম।

আমরা যখন ফিরছি, তখন দেখি অরুণ খুব যত্ন করে টেবিলে পড়ে থাকা এক্সট্রা খাবারগুলো প্যাক করে রেফ্রিজারেটরে ঢোকাচ্ছেন। আমরা অবশ্য চেটেপুটেই খেয়েছিলাম। সুতরাং বাকি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। বড়জোর এক-আধটুকরো মিষ্টি, একটা বা দুটো পুরি, তরকারির একটা সার্ভিং — তাও ছিল কিনা সন্দেহ! যাই হোক আমি বুঝিনি যে, প্রমথরও সেটা চোখে পড়েছে। গাড়িতে উঠেই ও বলল, "এই জন্যই আমরা কোনোদিন বড়লোক হতে পারব না। দেখলি তো খুদকুঁড়ো পর্যন্ত এরা ফেলে না!"

।। ৬।।

সন্ধ্যেবেলায় বেন্টুমাসির ফোন। দারুণ উত্তেজিত। এইমাত্র উনি সাহানিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে, ট্যাপান জি ব্রিজের কাছে পুলিশ নাকি গোভিন্দ জসনানির ডেড বডি আবিষ্কার করেছে! একেনবাবু বাড়ি নেই শুনে খুব নিরাশ হলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, একেনবাবু একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছেন তখন বললেন, "আচ্ছা লোক তো একেন! কোথায় খুনি ধরবে, না ঘোড়ার ডিম বক্তৃতা শুনে বেড়াচ্ছে! যত্তসব! যাই হোক, একেন এলেই আমাকে ফোন করতে বলিস।"

"তা তো বলব। কিন্তু আমাকে একটু বল না কী ব্যাপার?"

"ব্যাপার আর কী, ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে! পাপ করেছিস, তার ফল ভোগ করতে হবে না!"

"কার পাপের কথা বলছ?"

"কোন রাজ্যে থাকিস তুই। অ্যাঁ? মনিবকে খুন করে কোটিকোটি টাকা নিয়ে একটা লোক পালাল, আর তুই বলছিস, কার পাপের কথা হচ্ছে!"

বেন্টুমাসির ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড। মাথায় যখন একবার ঢুকেছে যে, গোভিন্দ জসনানি একটা খুনি, শিবেরও সাধ্য নেই সেটার নড়চড় করানোর! সুতরাং শ্যাম মিরচন্দানির ডেথ যে ন্যাচারাল, আবার সে প্রসঙ্গ তুলে সময় নষ্ট করলাম না।

"বুঝেছি বুঝেছি," আমি বললাম। "কিন্তু গোভিন্দ জসনানিকে মারল কে?"

"আরে বাপু, সেই জন্যেই তো একেনের সাহায্য দরকার। আমি বুঝতে পারছি, কে মেরেছে। কিন্তু প্রমাণটমানগুলো একেনকে একটু খুঁজে পেতে বের করতে হবে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," আমি বললাম, "হু ইজ দ্য মার্ডারার, সাহানিদের কেউ?"

"তোর ঘটে কী আছে রে? এদিকে তো শুনি পিএইচ.ডি. না কী ছাই করেছিস! নিশ্চয় টুকে পাশ করেছিস, নইলে বলিহারি এদেশের পিএইচ.ডি.!"

"আঃ, ওসব কথা থাক! বলো না তোমার সাসপেক্ট কে?"

"কে আবার? যে লোকটা জানত, ব্যাগে ওই টাকাগুলো আছে!"

"সেটা তো অরুণ!" আমি বললাম।

"কেন, অরুণ ছাড়া আর কেউ জানত না? যে-লোকটা শ্যাম মিরচন্দানিকে টাকাটা দিয়েছিল সে কোথায় গেল, সে জানত না?"

"দ্যাট্স ট্রু।"

"আমি তো বলি যে, ওই লোকটার সঙ্গেই বুড়ো গোভিন্দের ষড় হয়েছিল। গোভিন্দ টাকাটা সরিয়ে প্রথমে ওর বাড়িতে গিয়ে গা ঢাকা দেবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা সব সেখানেই হবে। তারপর সবকিছু ঠান্ডা হলে খুনি গোভিন্দ ভালোমানুষ সেজে আবার উদয় হবেন!"

"দেন হোয়াই ওয়াজ হি মার্ডারড, গোভিন্দ খুন হলেন কেন?"

"উত্তরটা তুই একটু ঘটের বুদ্ধি খরচা করে দে!"

"আমার মাথায় কিছু খেলছে না, তুমিই বলো।"

"আঃ, এত একেবারে ব্যোমকেশের গল্পের মত! গোভিন্দ যখন টাকা নিয়ে ওই লোকটার কাছে গিয়ে হাজির হল, তখন লোকটা ভাবল, বাঃ, এই তো সুযোগ! গোভিন্দকে যদি এখন আমি মারি, তাহলে তো আর ভাগ দেবার প্রশ্নই ওঠে না, পুরো টাকাটাই আমার হয়ে যায়!"

আমায় স্বীকার করতেই হবে যে, বেন্টুমাসি মে হ্যাভ এ পয়েন্ট। বেন্টুমাসির থিওরি যদি সত্যি হয়, তাহলে তার আরও একটা ইমপ্লিকেশন আছে। সেটা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আর কারও জানার কথা নয় যে, গোভিন্দ জসনানি ওই লোকটার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সুতরাং, মিস্টার জসনানিকে মার্ডার করে, বডিটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে এলে, খুনের সঙ্গে ওই লোকটাকে জড়ানো বেশ কঠিনই ব্যাপার হবে!

একেনবাবু ফিরলেন বেন্টুমাসির ফোনের আধ ঘন্টা পরে। আমরা ভেবেছিলাম, জসনানির মার্ডারের খবরটা দিয়ে ওঁকে বেশ একটু অবাক করে দেব। কিন্তু ও হরি, উনি ইতিমধ্যেই

সব জেনে বসে আছেন! আসলে উনি যে সেমিনারে গিয়েছিলেন, ইন্সপেক্টর লান্ডিও সেখানে ছিলেন। তার কাছ থেকেই খবরগুলো উদ্ধার করেছেন বুঝলাম। একেনবাবুর ভার্সান থেকে পরিষ্কার হল যে, বেন্টুমাসি একটা তথ্য জানতেন না। হুইচ ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। সেটা হচ্ছে গোভিন্দ জসনানির মৃত্যুর কারণ। শ্যাম মিরচন্দানির মতো গোভিন্দ জসনানির মৃত্যুটাও সম্ভবত স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক। অবশ্য অটপসির রিপোর্ট এখনও পুরো পাওয়া যায়নি।

একেনবাবু বললেন, "আমাকে একটু হোয়াইট প্লেইন্স পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে। একটা রাইড দেবেন স্যার?"

কেন, কী, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মাথায় এল। কিন্তু সেগুলো জিজ্ঞেস না করে বললাম "শিওর।"

প্রমথ বলল, "চল, আমিও যাব।"

।। ৭ ।।

ইন্সপেক্টর লান্ডি একেনবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের কথাও নিশ্চয়ই একেনবাবু ওঁকে বলেছিলেন, তাই আমরাও সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। আমি আগে কখনও কোনও পুলিশ স্টেশনের ভেতরে ঢুকিনি। দেখলাম একটা বড় ঘরে বেশ কয়েকজন জুনিয়র অফিসার বসে। সেই ঘরের এক সাইডে একটা বড় দরজা।

সেখান থেকে লোহার গারদ দেওয়া লক আপ এরিয়াটা চোখে পড়ে। লক আপ এরিয়ার উলটোদিকে যে লাগোয়া ঘর, সেটা হল ইন্সপেক্টর লান্ডির। সারা ঘর উঁচু উঁচু ফাইভ-ড্রয়ার ফাইল ক্যাবিনেটে ভর্তি। দেওয়ালের শুধু একটু অংশই ফাঁকা। সেখানে হোয়াইট প্লেনস ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের একটা ডিটেল ম্যাপ।

ইন্সপেক্টর লান্ডি ম্যাপটাতে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ঠিক কোথায় ডেড বডিটা পাওয়া গেছে। টাপান জি ব্রিজটা পার হয়ে আপস্টেট নিউ ইয়র্ক যাবার পথে, ব্রিজ থেকে আধ মাইলও হবে না। 'আপস্টেট নিউ ইয়র্ক' এখানকার খুব একটা চলতি কথা। আসলে নিউ ইয়র্ক শহরটা হচ্ছে আবার নিউ ইয়র্ক স্টেটের মধ্যে, যেটা আমেরিকার একটা বিশাল স্টেট। 'আপস্টেট নিউ ইয়র্ক' বলতে ওই স্টেটেরই উত্তর দিকটা বোঝায়।

যাক সে কথা। বডিটা পাওয়া গেছে হাইওয়ের পাশে, তবে অনেকটা নীচে। ওই জায়গায় হাইওয়েটা খুব উঁচু জমির ওপরে। সুতরাং মনে হয়, বডিটাকে কেউ ওপর থেকে রোল করে ফেলে দিয়েছে! যেহেতু জায়গাটা বরফে ভর্তি ছিল, সেইজন্য একেবারে গড়িয়ে নীচে চলে যায়নি, খানিকটা গিয়ে ঢালুর ওপরই একটা গর্তে বরফের মধ্যে আটকে গেছে। বডিটা বোধহয় কয়েকদিন ধরেই ওখানে পড়ে ছিল। কিন্তু বরফে ঢাকা ছিল বলে কারও নজরে পড়েনি। রোদে বরফ কিছুটা গলে যাওয়ায়, হাইওয়ে পেট্রল ওঁর ব্রাউন ব্রিফকেসটা বরফের ওপর দেখে, গাড়িটা থামিয়েছিল। ব্রিফকেসটা তুলতে গিয়ে বডিটা আবিষ্কার করে।

আমি অবশ্য ঠিক বুঝলাম না, কেন ইন্সপেক্টর লান্ডি অনুমান করছেন যে, কেউ মিস্টার জসনানির বডিটাকে হাইওয়ে থেকে নীচে ফেলে দিয়েছে। ইন ফ্যাক্ট উনি যেজায়গায় বডিটা পাওয়া গেছে বললেন, আমি জানি সেখানে অনেক কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল। শীতকাল বলে বেশিরভাগ কাজই এখন বন্ধ। ফলে অনেক টেম্পোরারি শেড ওখানে ফাঁকা পড়ে আছে। তা হলে কি মিস্টার জসনানি তারই কোনো একটায় আশ্রয় নিয়েছিলেন? হয়তো গতকাল হিচ হাইক করবেন বলে হাইওয়েতে উঠে আসার পথে ঠান্ডায় ওভার এক্সারশনে হার্ট ফেল করে মারা যান। সেটা হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। এদেশে ঠান্ডায় বরফ পরিষ্কার করতে গিয়ে তো কত কমবয়েসি লোকই মারা যায়, আর উনি তো বৃদ্ধ! আমি আমার সন্দেহের কথাটা বলতেই ইন্সপেক্টর লান্ডি মুচকি হেসে ক্লিয়ারলি ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করে দিলেন। বললেন, "প্রথমত, ওই শেডগুলোতে কোনো হিটিং নেই। বাইরে যা ঠান্ডা, ইট ইজ হার্ড টু বিলিভ দ্যাট হি উড হ্যাভ সার্ভাইভড দেয়ার। দ্বিতীয়ত, ওঁর ব্রিফকেসটা পাওয়া গেছে ওঁর বডিটা থেকে অন্তত পাঁচ ফুট দূরে। মাটিতে বরফ না থাকলে বুঝতাম যে, ওটা গড়িয়ে দূরে চলে গেছে। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। তৃতীয়ত, বরফের ওপর কোনো পায়ের ছাপ নেই। অবভিয়াসলি, হি ওয়াজ নট ওয়াকিং।

হ্যাঁ, বলতে পারেন যে, বরফ পড়া শুরু হবার আগে উনি ওখানে উঠে এসে মারা যান। সেক্ষেত্রে উনি বা ওঁর ব্রিফকেস, দুটোই বরফে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে থাকত। ফাইনালি, ওঁর চোখে যে চশমাটা ছিল, সেটা হল প্লাস পাওয়ারের, অর্থাৎ রিডিং গ্লাস। কেন একটা লোক রিডিং গ্লাস চোখে দিয়ে হাঁটতে বেরোবে?"

ইন্সপেক্টর লান্ডির কথা শুনে আমার ভারি অপ্রস্তত লাগল। আসলে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গল্প পড়ে পড়ে আমার এমন অবস্থা হয়েছে — আমি ধরেইনি, পুলিশেরা সব গবেট, কিছুই ঠিকমতো ধরতে পারে না!

একেনবাবু বললেন, "স্যার ব্রিফকেসটা একটু দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

ব্রিফকেসটা ইন্সপেক্টর লান্ডির পেছনেই ছিল। উনি আমাদের সামনে ওটা রেখে বললেন, "কম্বিনেশনটা হচ্ছে থ্রি-টু-টু।"

কম্বিনেশনটা লক লাগানো স্যামসোনাইটের সচরাচর যে ধরনের ব্রিফকেস চোখে পড়ে, সেরকমই একটা ব্রিফকেস। আমি স্যামসোনাইট কখনো ব্যবহার করিনি। কিন্তু নিশ্চয়ই খুব মজবুত হবে। হাইওয়ে থেকে নীচে পড়াতেও কোনো টোল খায়নি। অবশ্য বরফ ছিল বলেই হয়তো।

"হাত দেব স্যার?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"স্বছন্দে। ব্রিফকেসে কোনো ফিঙ্গার প্রিন্টই পাওয়া যায়নি। ইট ওয়াজ ওয়াইপড ক্লিন!"

লকের থাম্ব হুইলগুলোকে থ্রি-টু -টু পজিশনে আনতেই ব্রিফকেসের ডালাটা খুলে গেল। দেয়ার ইজ নাথিং ইনসাইড, একেবারে শূন্য!

"আপনি শিওর স্যার যে, এটাই রাইট ব্রিফকেস? এরকম তো অনেক ব্রিফকেসই আছে।"

"ইয়েস, আই অ্যাম শিওর। সাহানিরা এসে আইডেন্টিফাই করে গেছেন। দেখুন লেফটে সাইডে একটা ছোট্ট স্ক্র্যাচ আছে, ওটাই হল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। তাছাড়া

লকের কম্বিনেশনটাও এক।"

"সবই এক। শুধু টাকাগুলোই নেই!"

"এগজ্যাক্টলি।"

"দিস ইজ কনফিউসিং স্যার," একেনবাবু মাথা নাড়লেন। "মৃত্যুর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিচ্ছু নেই, অথচ মিস্টার জসনানির বডিটা আর ফাঁকা ব্রিফকেসটা একই সঙ্গে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল!"

"ইট ইজ কনফিউসিং।" ইন্সপেক্টর লান্ডি মাথা নেড়ে বললেন।

"আর কিচ্ছু পাননি স্যার। চশমা আর ব্রিফকেস ছাড়া?"

"ও ইয়েস। লেট মি শো ইউ। এটা হচ্ছে ওর ওয়ালেট, আর ওঁর কোর্টের পকেটে এই কার্ডটা ছিল।" ড্রয়ার থেকে জিনিস দুটো বার করে ইন্সপেক্টর লান্ডি একেনবাবুকে দিলেন।

ওয়ালেটে দেখলাম ড্রাইভার্স লাইসেন্স, দুটো ক্রেডিট কার্ড, আর কয়েকটা শুধু ডলার। কোটের পকেটে যে কার্ডটা পাওয়া গেছে, সেটা হল একটা বিজনেস কার্ড। কার্ডে লেখা সলোমান লাজারাস, প্রেসিডেন্ট, এস.এল.প্রেশাস স্টোনস। নীচে ব্রুকলিনের একটা ঠিকানা, আর ফোন নম্বর।

"হু ইজ দিস পার্সন স্যার?"

ইন্সপেক্টর লান্ডি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "এর থেকেই স্যাম মিরশন্ডানি মিলিয়ন ডলারের ক্যাশ নিয়েছিলেন।"

স্যাম মিরশন্ডানি মানে অবশ্যই শ্যাম মিরচন্দানি। মাই গড! তাহলে কি বেন্টুমাসির থিওরিই ঠিক!

প্রমথ নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছিল। জিজ্ঞেস করল, "ইজ দেয়ার এনি কানেকশন? আই মিন বিটুইন দ্য ডেথ অ্যান্ড দিস কার্ড।"

"কানেকশন ফর হোয়াট, দ্য ম্যান ওয়াজ নট মার্ডারড!"

"সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু টাকাটা কোথায় গেল, কে চুরি করল? আমি প্রশ্ন করলাম।

"দ্যাট্স এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন," বলে টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে ইন্সপেক্টর লান্ডি একটা চুরুট ধরালেন।

।। ৮।।

মাঝেমাঝে এমন হয় যে, আমরা শুরু করি একটা সমস্যা নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ সেই সমস্যাটা আর থাকে না, তার বদলে অন্য একটা সমস্যা এসে হাজির হয়! নতুন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আবার নতুনতর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই!

বেন্টুমাসির কাছ থেকে প্রথম দিকে রেগুলার তাড়া না খেলে, জসনানির অন্তর্ধান নিয়ে আমরা হয়তো কেউই খুব একটা মাথা ঘামাতাম না। বেন্টুমাসি জসনানিকে মার্ডারার ভাবলেও, আমরা তো জানতাম যে, হি হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ এনি মার্ডার। আমার যে কারণে একটু ইন্টারেস্ট জেগেছিল, সেটা হল একটি বৃদ্ধ ভারতীয়, হু ইজ বাই নো মিনস

এ রিচ পার্সন, তিনি কীভাবে এই অচেনা অজানা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারবেন? যাই হোক, সমস্যাটা পালটে গেল যখন জানলাম যে, উনি খালি হাতে উধাও হননি, এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন! যাঁর পকেটে এক মিলিয়ন ডলারস আছে, তাঁর অন্তত এই পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই খাওয়া পড়ার অভাব হবে না! এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে, সেক্ষেত্রে পুলিশ বা এফ.বি.আই.-এর নজর এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপার হবে! কিন্তু এখানে ঘটনাচক্র সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে! জসনানিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে সেই মৃত্যুতে কারও কারসাজি নেই, কেউ তাঁকে হত্যা করেনি! এদিকে টাকাগুলোর কোনো হদিশ নেই! প্রশ্ন, জসনানিই কি টাকাটা চুরি করেছিলেন? না, আর কেউ? শুধু ইন্সপেক্টর লান্ডি নয়, আমাদের সবার কাছেই, 'দ্যাট্স এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন'। কিন্তু তার উত্তর যদি পাওয়াও যায়, দ্যাট উইল নট এক্সপ্লেইন যে, জসনানির ডেডবডিটা ওখানে পাওয়া গেল কেন!

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে যখন উঠলাম, তখন শুধু আমি আর একা নই, প্রমথ আর একেনবাবুও দেখলাম গম্ভীর ভাবে কী সব যেন ভাবছেন। বেশ খানিকটা পথ কেউ আর কোনো কথা বললাম না। কয়েকটা ব্লক যাবার পর একটা সুপারমার্কেটে আমরা থামলাম। একেনবাবুর সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। ছাড়ব-ছাড়ব করেও এখনও উনি ব্যাড হ্যাবিটটা ছাড়তে পারেননি। আমি আর প্রমথ গাড়িতে বসে আছি, কিছুক্ষণ বাদে দেখি সুধীর শিকদার — একেনবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরছেন! আমাদের দেখে বললেন, "কোনো কথা শুনব না, একটু চা খেয়ে যেতে হবে।"

লোকটা অত্যন্ত নাছোড়বান্দা। আমার আর প্রমথর অনেক আপত্তি ছিল, কিন্তু এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যে, আশেপাশে সবাই আমাদের দিকে তাকাতে শুরু করল, যেন কী না কী হচ্ছে! আমি শেষ চেষ্টা করলাম। বললাম, "আমার ভীষণ রাস্তা গুলিয়ে যায়।"

শিকদারমশাই বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে গাড়িটা রেখে আমার গাড়িতে আসুন। চা-টা খেয়ে আমি আপনাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব।"

এর পর আর 'না' বলা যায় কী করে!

ওঁর গাড়িতে উঠে অবশ্য বুঝলাম, এত পীড়াপীড়ির কারণটা কী! একেনবাবুকে বললেন, "বুঝলেন মশাই, বেরিয়েছিলাম সেই ছ'টায়, গিন্নীর জন্য স্কিমড মিল্ক কিনতে। আর এখন বাজে সাড়ে আটটা! টু এন্ড হাফ আওয়ার্স! ভাগ্যিস আপনারা সঙ্গে আছেন, নইলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হত!"

"কী করছিলেন স্যার এতক্ষণ?"

"একটা লন মোয়ারের খোঁজ করছিলাম। রবার্টসে বুঝলেন মশাই প্রচুর কালেকশন — নিউ, ইউজড, ফ্যাক্টরি রিকন্ডিশন্ড, কী চান! একেবারে মাথা ঘুরে যায় দামগুলো দেখে! নতুন হলে তো কথাই নেই, আকাশছোঁয়া দর মশাই!"

শিকদারমশাইয়ের প্রফেশন কী জানি না, কিন্তু ওঁর উচিত ছিল মাস্টারি করা।

সত্যি, কী অসম্ভব ভালোবাসেন লেকচার দিতে!

"বুঝলেন মিস্টার সেন, এভরিথিং আই বাই ইজ ইউজড। এই যে গাড়িটা দেখছেন — এটাও কিন্তু ইউজড কার। কিন্তু বোঝার জো আছে?"

একেনবাবুর মুখ দেখে বুঝলাম এদেশের 'ইউজড' কথাটার তাৎপর্যটা ওঁর জানা নেই। তাই বললাম, "ইউজড মানে হল সেকেন্ড হ্যান্ড।"

"ও তাই বলুন স্যার। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি তো বুঝতেই পারিনি এটা সেকেন্ড হ্যান্ড

গাড়ি, ভাবছিলাম একদম ব্র্যান্ড নিউ!"

গাড়ির কমপ্লিমেন্ট শুনে শিকদারমশাইয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল।

"দ্য ফ্যাক্ট ইজ, লোকে অবশ্য বোঝে না, ইউজড গুডস আর ওয়ার্থ এভরি পেনি। প্রথমত, আপনি জলের দরে কিনছেন, দ্বিতীয়ত, পুরোনো বলে 'এই বুঝি ভেঙে গেল' 'এই বুঝি চুরি হল' — এইসব নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। তার থেকেও বড় কথা ইউজড জিনিস সাধারণত রিলায়েবল হবে।"

হোয়াট ননসেন্স! মনে মনে বললাম। সেই সঙ্গে প্রমথর হাতে একটা চাপ দিলাম, যাতে হঠাৎ অপমানকর কিছু না বলে ফেলে! কিন্তু একেনবাবু দেখলাম শিকদারমশাইয়ের বক্তৃতাতে একেবারে মুগ্ধ।

"এটা খুব গভীর তাৎপর্যের কথা বললেন স্যার। আমার মাথাতে একদম আসেনি।"

শিকদারমশাই তাতে উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আরে বাড়ির কথাই ধরুন না কেন। আমার বন্ধুবান্ধব, যারা একদম নতুন বাড়ি কিনেছে, তারা যে কী ভুগেছে!

বেসমেন্টে জল লিক করছে, দেয়াল ক্র্যাক করছে, প্লাম্বিং ঠিকমতো কাজ করছে না – থাউসেন্ড অ্যান্ড ওয়ান প্রবলেমস মশাই। অথচ আমার বাড়ি দেখবেন। কিনেছি যখন তখন টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড, বাট ডিভয়ড অফ অল প্রবলেমস!"

ভাগ্যক্রমে খুব বেশিক্ষণ বকবকানি শুনতে হল না, ওঁর বাড়ি এসে গেল। মিসেস শিকদার বেশ মারমূর্তি ধরেই দরজাটা খুলেছিলেন, আমাদের দেখে একটু থতমত খেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। সুধীর শিকদারও আমরা যে কত মান্যগণ্য লোক স্ত্রীকে বারবার বোঝালেন। তারপর কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "একটু চা হলে বোধহয় মন্দ হত না, কী বল?" তারপরই বললেন, "না, না, তুমি বস, আমি বানাচ্ছি।"

মিসেস শিকদার বাধা দিলেন, "থাক তোমাকে আর রান্নাঘরে যেতে হবে না, যে অবস্থা করে রাখবে, আমার কাজ আরও বাড়বে!"

"আহা, কী মুশকিল! তাতে আর কি, পরিষ্কার করে দেবো!"

শিকদারমশাই আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলেন, "পুজোর রান্নাটা আর কি! নর্মালি একটা কিচেন ভাড়া করি। এবার হঠাৎ আগে কিছু জিনিসপত্র এসে পড়ায়, আমার বাড়িতেও কিছু কিছু করতে হয়েছে।"

"সে তো তোমার দোষ, না করলেই পারতে।"

"কী যে বলো, ভোগের জন্য দেওয়া জিনিস ফেলে দিতে আছে?"

আমাদের অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে। মিসেস শিকদারই পরে পরিষ্কার করে বললেন। মিস্টার সাহানিদের ফ্রিজার হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা অনেক ফ্রোজেন ভেজিটেবল শিকদারমশাইকে পুজোর দিন পাঁচেক আগে দিয়ে যান। নর্মালি শীতকালে ওগুলো বাড়ির বাইরে রাখলে হয়তো ফ্রোজেনই থাকত, কিন্তু পুজোর ক'দিন আগে একটু গরম পড়ায়, মিস্টার শিকদার আর রিস্কই নিতে চাননি। নিজের বাড়িতেই ওগুলো রান্না করে ফেলেন। চারশো লোকের রান্না তো আর ছেলেখেলা নয়। কিচেনের অবস্থা তাই সহজেই অনুমেয়!

মিসেস শিকদার রান্নাঘরে যেতেই, শিকদারমশাই দেখলাম অদৃশ্য হয়েছেন।

এই ফাঁকে প্রমথ বললল, "কী রে তোকে সেদিন আমি বলিনি যে, ফ্রোজেন ফুড! তখন তো পাত্তা দিলি না!"

আমি বললাম, "চুপ কর, ফ্রোজেন, নট ফ্রোজেন, কী এসে যায়? ফুড ইজ ফুড!"

“তোর মুণ্ডু! পুজোর ভোগ রান্না হচ্ছে দু’শো বছরের পুরোনো ভেজিটেবল দিয়ে! কী পার্টি রে সব!”

“বাজে বকিস না,” আমি ধমক দিয়ে বলললাম, “বড়জোর ছ’মাস কি এক বছরের পুরোনো ফসল।”

“তাই বা হবে কেন,” বলে প্রমথ আরও কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সুধীর শিকদার ঘরে ঢুকছেন দেখে থেমে গেল।

শিকদারমশাই দু’-আঙুলে একটা ডিবে নাচাতে নাচাতে সোফায় এসে বসলেন। ডিবেটার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, “বস্তুটা কী স্যার?”

“গেস করুন তো?”

“নস্যি?” একেনবাবুর চোখ দেখি জুলজুল করছে। তেলোর ওপর ডিবেটা ঠুকতে ঠুকতে শিকদারমশাই বললেন, “আদি এবং অকৃত্রিম হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান নস্যি!” তারপর আমাকে আর প্রমথকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “কী মশাই, চলবে?”

আমি সোজা বললাম “না।”

কিন্তু প্রমথটা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, “দিন একটু ট্রাই করি। তবে একটা টিস্যু পেপার দিন, যদি হাঁচি আসে!”

শিকদারমশাই বাথরুম থেকে টিস্যু পেপার আনতে যেতেই আমি ফিসফিস করে প্রমথকে বললাম, “ওদিকে তো ফ্রোজেন ফুড নিয়ে চেঁচামেচি করিস। আর এদিকে ওরকম একটা আনহাইজিনিক লোকের নস্যি তুই নিচ্ছিস?”

প্রমথ উলটে বলল, “চুপ কর, তুই এখানে চা খাচ্ছিস না!”

টিস্যু পেপার এল। তারপর সেই টিস্যু পেপার হাতে ধরে তিনজনের নস্যি নাকে টেনে জলভেজা চোখে আঃ, আঃ করা! জাস্ট ডিসগাস্টিং! আমি আর সহ্য না করতে পেরে সোজা ডাইনিং রুমে গিয়ে দেয়ালে বাটিকের কয়েকটা কাজ ছিল, সেগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। তখনই কিচেনে চোখ পড়ল। উঃ কী নোংরা! চা যখন এল, তখন সেটা গলা দিয়ে নামছিল না। তার ওপর সুধীর শিকদার এক প্লেট নিমকি সামনে ধরে আদর-আপ্যায়নের চেষ্টা করলেন যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র অবস্থা! প্রমথটা এদিকে অম্লান বদনে পেট খারাপ হয়েছে বলে সব কিছু অ্যাভয়েড করল। আমি জানি, কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। আজ দুপুরেও ও একটা মিডিয়াম সাইজের পিৎজা সাঁটিয়েছে। শুধু একেনবাবু হাসিমুখে সবকিছু খেলেন, আর যথারীতি অজস্র প্রশংসা করলেন!

।। ৯।।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে প্রমথ একেনবাবুকে প্রশ্ন করল, “কী মশাই, কী বলবেন কিছু ঠিক করেছেন?”

একেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “কাকে কী বলব স্যার?”

“এক্ষুণি বেন্টুমাসির যে ফোন কলটা আসবে, তার কথা বলছি। কী বলবেন

বেন্টুমাসিকে?”

প্রমথটা একেবারে যেন সাইকিক! কথা শেষ হতে না হতেই বেন্টুমাসির ফোন!

“কে বাপি?”

“হ্যাঁ। বলে আমি ফোনের মাউথপিসটা হাতে ঢেকে একেনবাবু আর প্রমথকে শব্দ না করে মুখ নেড়ে বললাম, “বেন্টুমাসি।” তাতে একেবারে ম্যাজিকের মত রিয়্যাকশন হল! প্রমথটা গা দুলিয়ে নাচা শুরু করল। আর একেনবাবু হাত দুটো জোড়া করে ঘন ঘন মাথে নেড়ে ‘না’ বলে চললেন।”

“একেন কি তোর ওখানে?” বেন্টুমাসি প্রশ্ন করলেন।

আমি হাত তুলে একেনবাবুকে অভয় দিয়ে বেন্টুমাসিকে বললাম, “না, উনি তো নেই।”

“কোন চুলোয় গেছে এই সাতসকালে?”

“তা তো ঠিক জানি না। এলে ফোন করতে বলব?”

“হ্যাঁ বলিস। আর তুই কি জানিস, একেন ওই ব্যাপারটার কোনো হদিশ পেল কিনা?”

“ঠিক বলতে পারছি না বেন্টুমাসি। তবে অনেক খোঁজখবর করেছেন জানি।”

“তোরা কী করছিস, তোরা কোনো খোঁজখবর করছিস না?”

“আমরাও করছি, কালই তো ইন্সপেক্টর লান্ডির কাছে সবাই গিয়েছিলাম।”

“কী বলল সে?”

“বললেন, অটপসির প্রিলিমিনারি রেজাল্ট অনুসারে মিস্টার জসনানির ডেথ ন্যাচারাল। সুতরাং, ডাজ নট লুক লাইক ইট ওয়াজ এ মার্ডার।”

“হনুমানদের যতসব উড়ুটে কথা!”

“হনুমান! কাদের কথা বলছো তুমি?”

“কাদের আবার, এইসব ডাক্তারগুলোর! জ্যান্ত লোকদের রোগই ধরতে পারে না, আর কিনা মড়া লোক দেখে খুঁটিনাটি সব জেনে বসে আছে! দ্যাখ বাপি, আমি তোকে বলে রাখছি, এটা হল একটা ডাহা খুন! যে লোকটা মিরচন্দানিকে টাকা দিয়েছিল, তাকে থানায় এনে দু’চার ঘা দে, তারপর দেখ কবুল করে কি না!”

বেন্টুমাসির ফোন শেষ হলে আমি একেনবাবুকে বললাম, “আপনার ফেইলিওরের জন্য মশাই আমাকে ধমক খেতে হচ্ছে! না পারছেন খুনি ধরতে, না পারছেন টাকা উদ্ধার করতে!”

একেনবাবু বললেন, “কেসটা সত্যিই পাজলিং স্যার। একটু আগে ইন্সপেক্টর লান্ডিকে ফোন করেছিলাম। পোস্ট মর্টেম ইজ নাউ কমপ্লিট। কোনো সন্দেহই নেই যে, ডেথ ইজ ন্যাচারাল।”

“তাই যদি হবে মশাই, তাহলে কেন বডিটা ওভাবে লাম্প করা হল, আর টাকাটাই বা অদৃশ্য হল কেন? ” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, “আমারও একবার সেটা মনে হয়েছিল। কিন্তু ব্রিফকেসে যে অত টাকা ছিল সেটা তো পুলিশ বা আমরা কেউই জানতাম না, যদি না অরুণ সাহানি আমাদের বলতেন! সাহানি ব্রাদার্স যদি সত্যিই টাকাটা চুরি করতেন, সেক্ষেত্রে টাকা থাকার কথাটা পুরোপুরি চেপে যেতেন।”

প্রমথ বলল, “দেয়ার ইজ অ্যানাদার বিগ আন-অ্যানসার্ড কোয়েশ্চেন। সাহানিদের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ মিস্টার জসনানি কোথায় ছিলেন?”

একেনবাবু চুপ করে আছেন দেখে প্রমথ বলল, “কী মশাই, আমরা অ্যামেচাররা

স্পেকুলেট করে যাচ্ছি, আর আপনি প্রফেশনাল গোয়েন্দা ব্যোম মেরে আছেন যে?"

একেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "দিস কেস ইজ ভেরি কনফিউসিং স্যার।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা একেনবাবু বললেন, "স্যার, হঠাৎ খেয়াল হল মিস্টার সাহানিদের বাড়িতে আমার ডায়েরিটা ফেলে এসেছি।"

আমি বললাম, "আপনি শিওর?"

"প্রায় শিওর স্যার। আমি সেদিন ক্যামেরার কতগুলো ইনফরমেশন ডায়েরিতে টুকে ওটা হাতে নিয়েই ওঁদের রেকরুমে যাই। সেখানে আপনার সঙ্গে গল্প করার সময় বোধহয় চেয়ারে বা কোথাও ওটাকে রাখি। তারপর আর আমি ডায়েরিটা ব্যবহার করিনি। সুতরাং, ওটা ওখানেই আছে।"

।। ১০ ।।

ডায়েরি উদ্ধার করতে সেই রাত্রেই আমরা সাহানিদের বাড়ি গেলাম। সাহানিদের বাড়িতে সে রাত্রে গেস্ট আসার কথা, তাও যখন ফোন করলাম অশোক বললেন, "ঠিক আছে, চলে আসুন।"

আমি এরকম ভাবে শর্ট নোটিসে কারুর বাড়ি যাওয়াটা পছন্দ করি না। লোকের ওপর শুধু শুধু ইম্পোস করা। কিন্তু মনে হল ডায়েরিটা একেনবাবুর হঠাৎ ভীষণ জরুরি দরকার! একেনবাবু বাইরে ভাব দেখান চূড়ান্ত ফ্লেক্সিবল, কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে অসম্ভব রিজিড় আর একগুঁয়ে। ডায়েরিটা যখন দরকার, তখন সেই মুহূর্তেই দরকার!

নোটিস শর্ট হলেও আমাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র কমতি হল না। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ কফির আয়োজন করলেন, আমি একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতেই বললেন, "কী মুশকিল, আমরা খাব না! শুধু কী আপনাদের জন্য করছি নাকি!"

অবশ্য এর আগেই যে একপ্রস্থ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, সেটা টেবিলে পড়ে থাকা কাপগুলো থেকে বুঝলাম।

ওঁদের গেস্ট দু'জন কমবয়েসি, নিশ্চয়ই অশোকের অফিসের। দু'জনেই খুব এক্সাইটেড হয়ে অফিসের নানান গল্প করছিল। আমি অবশ্য কিছুই শুনছিলাম না। কী হবে শুনে? গল্পের সেটিং জানা নেই, না চিনি ক্যারেক্টারগুলোকে, না জানি তাদের পাস্ট হিস্ট্রি! রসটা তাহলে পাব কোত্থেকে?

একেনবাবু ইতিমধ্যে নীচ থেকে ওঁর ডায়েরিটা উদ্ধার করে এনেছেন। নিতান্ত কফি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসা যায় না। নইলে তাই করতাম।

সাহানিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা ছোটো একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। রেস্টুরেন্টটা ইটালিয়ান। আমি অর্ডার করলাম শ্রিম্প স্ক্যাম্পি, প্রমথ নিল চিকেন পার্মাজাঁ। একেনবাবু রেস্টুরেন্টে অর্ডার দেবার বেলায় সাধারণত আমাদের লিড ফলো করেন। এবার ওস্তাদি করে পাস্তা আরাবিয়েত্তা অর্ডার করে খাবার সময় আফশোস করা শুরু করলেন।

"এ তো শুধু নুডুল আর ঝাল সস স্যার। আমি ভেবেছিলাম ল্যাম্ব-ট্যাম্ব কিছু থাকবে। দারুণ মিসটেক করলাম স্যার অর্ডারটা দিয়ে। কী করে খাই এটা?"

আমি বললাম, "কী আর করবেন, আপনি বরং আমার থেকে কিছুটা নিন।"

"তা কী করে হয় স্যার, আপনার তাহলে কম পড়ে যাবে্!র্ "কিচ্ছু কম পড়বে না, আপনি নিন।"

"তাহলে আপনি স্যার আমারটা একটু নিন," বলেই একেনবাবু সস শুদ্ধু একগাদা পাস্তা আমার প্লেটে ফেলে দিয়ে শ্রিম্প স্ক্যাম্পির পুরো টেস্টটাই বরবাদ করে দিলেন। তারপর প্রমথকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কী খাচ্ছেন স্যার?"

"চিকেন।"

"লুকস গুড! ওটাই স্যার আমার অর্ডার করা উচিত ছিল।"

"তাহলে নিন মশাই একটু। নইলে আমার আবার পেট খারাপ করবে।"

"আরে না না স্যার, আমার প্লেট একেবারে ফুল। এই তো বাপিবাবু এতগুলো চিংড়ি মাছ দিলেন।"

"তা বললে শুনব কেন মশাই! লোভ যখন একবার করেছেন, তখন নিতেই হবে!" বলে প্রমথ ওর কিছুটা পোরশন একেনবাবুকে দিল।

একেনবাবু এই সুযোগে ওঁর পাস্তার বাকিটুকু প্রমথকে পাস করে দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রমথ বলল, "না, ওসব আমি নিচ্ছি না। আপনার কর্মফল মশাই আপনি ভোগ করবেন।"

আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার ঠিক সামনেই একটা বড় টিভি মনিটর।

সেখানে দেখি আমার একটা ফেভারিট পুরোনো গেম শো 'টেল দ্য ট্রুথ' - এর রি-রান হচ্ছে। 'টেল দ্য ট্রুথ' — এর প্রত্যেকটা শো-ই এক ধাঁচের। প্রথমে মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং লোকের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া হয়। তারপর সেই লোকটি ছাড়া আরও দুজন এসে দাবি করে, তারাই হচ্ছে সেই লোক। শো-তে প্রশ্ন করার জন্য কয়েকজন সেলিব্রেটি থাকে। তারা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে এই তিনজনকে নানান ধরনের প্রশ্ন করে বের করার চেষ্টা করে, কে আসল, এবং কারা নকল!

ন্যাচারালি দর্শকরাও সেই সঙ্গে গেস করার চেষ্টা করে। শো-র শেষে যারা প্রশ্ন করছিল, তাদের বলা হয় নিজেদের অনুমানগুলো জানাতে। তারপর আসল লোকটি উঠে দাঁড়ায়।

এবার যে লোকটা এসেছিল, তার নাম, এডওয়ার্ড ব্র্যান্ডো। সে হচ্ছে একজন পেস্ট্রি মেকার। ব্র্যান্ডোর তৈরি পেস্ট্রি নাকি আমেরিকার তাবৎ গণ্যমান্য লোকে খেয়েছে! ওর স্পেশালিটি হচ্ছে ওয়েডিং কেক বানানো। মাত্র কয়েকমাস আগে এই নিউ ইয়র্কেই নাকি ব্র্যান্ডো একটা আট ফুট উঁচু ওয়েডিং কেক বানিয়েছে! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মাত্র আধ ঘন্টার শো। খেতে খেতেই শেষ হয়ে গেল। আমি আগে এই এপিসোডটা দেখিনি, তার ওপর শো-টা দেখছি বহুদিন বাদে। তাই খুব এনজয় করছিলাম। যথারীতি, প্রশ্নের শেষে শো-র হোস্ট গ্যারি মোর প্যানেলকে জিজ্ঞেস করলেন, আসল ব্র্যান্ডো কে? কে যে আসল, আমি তো কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কিন্তু প্যানেলের সবাই দেখলাম একবাক্যে বলল, তিন নম্বর চেয়ারে বসা লোকটা।

তখন গ্যারি মোর বললেন, "উইল মিস্টার রিয়েল এডওয়ার্ড ব্র্যান্ডো প্লিজ স্ট্যান্ড আপ!"

কী আশ্চর্য! দ্য প্যানেল ওয়াজ রাইট!

একেনবাবুও একেবারে স্টান্ড! কিছুতেই ভেবে পেলেন না প্রশ্নকারীর তিন-তিনজনেই কী করে আসল লোকটাকে বের করে ফেললেন!

আমাকে বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছিল স্যার, প্রত্যেকেই চমৎকার উত্তর দিয়েছেন! তিন নম্বরের বদলে দু'নম্বর উঠে দাঁড়ালেও মেনে নিতুম।"

প্রমথও নিশ্চয়ই ভুল লোককে বেছেছিল। তাই বলল, "ধ্যুস, যাকেই ভোট দিন না, থার্টিথ্রি পারসেন্ট চান্স যে, ইউ আর রাইট। আই বেট, আজ সবাই লাকে মেরে দিয়েছে!"

"মোটেও নয়," বলে আমি প্রমথর সঙ্গে তর্ক জুড়তে যাচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম একেনবাবু কেমন একটু অন্যমনস্ক।

আমি বললাম, "কী ব্যাপার, সামথিং রং?"

একেনবাবু বললেন, "আই ওয়াজ এ ফুল স্যার। ইট ওয়াজ রিয়েলি সো সিম্পল!"

আমি আর প্রমথ অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম। কী সিম্পল, কিসের কথা উনি বলছেন?

"এখনো লিঙ্কটা বুঝতে পারছেন না স্যার? টু ডেথস, অ্যান্ড ফ্রোজেন ফুড, আই মিন ইটস ডাম্পিং!"

"কী বলছেন মশাই যা তা? একটু খোলসা করে বলুন তো?" প্রমথ ধমকে বলল।

উনি উত্তর না দিয়ে বললেন, "স্যার, আপনাদের কাছে একটা কোয়ার্টার হবে, একটা জরুরি ফোন করতে হবে।"

প্রমথ একটা কোয়ার্টার দিতেই হুড়মুড় করে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, "চলুন স্যার, আর একবার একটু মিস্টার সাহানিদের বাড়িতে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "সে কী, কেন?"

"আপনি সেদিন বললেন না যে, ওঁদের ফ্রিজারটা চলছে, কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা। সেটা মোটেও সুবিধার নয় স্যার!"

সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেনবাবুর এই কথাটার কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না। উনি কি হঠাৎ খেপে গেছেন!

"তাতে হয়েছেটা কী?" প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, "ইট ইজ নট গোয়িং টু গেট ড্যামেজেড ফর দ্যাট।"

"চলুন স্যার, আর কোনো প্রশ্ন করবেন না, আই অ্যাম স্টিল লিটল কনফিউজড।" কথাটা বলে একেনবাবু মুখে একেবারে কুলুপ দিয়ে বসে রইলেন।

।। ১১ ।।

অশোক সাহানি দরজা খুলে আমাদের দেখে একেবারে অবাক, একটু যেন বিরক্তও।

"কী ব্যাপার, আপনারা এত রাত্রে?"

কথাটা শুনেই একেনবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওই যাঃ স্যার, এত যে রাত

হয়েছে, সেটা তো একদম খেয়াল হয়নি। না স্যার, আপনাকে এখন আর ডিস্টার্ব করা উচিত হবে না।”

ইতিমধ্যেই অরুণও দেখলাম অশোকের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

“কী ব্যাপার?” অরুণ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

“নাথিং দ্যাট আর্জেন্ট স্যার,” একেনবাবু একেবারে হাত দুটো জোড়া করে বললেন। “দোষটা সম্পূর্ণ আমার। আমরা যদি একটু খেয়াল করতাম যে, এগারোটা বেজে গেছে, তাহলে কখনোই ডোর বেলটা বাজাতাম না, নেভার স্যার! যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। উই মাস্ট লিভ রাইট নাউ। আপনারা স্যার নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ুন। দেয়ার ইজ অলওয়েজ টুমরো।”

এই কথার পর অত্যন্ত নির্লজ্জ না হলে কেউ বলবে না যে, ঠিক আছে,কাল দেখা হবে।

অশোক বলললেন, “ভেতরে আসুন। উই মাস্ট হ্যাভ সামথিং ইমপর্ট্যান্ট টু সে।”

“আপনি শিওর স্যার? আই মিন ইট ইজ নট টু লেট?”

“ডাজ’ন্ট ম্যাটার, আসুন।”

“থাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।”

আবার আমরা সাহানি ম্যানসনের ফ্যামিলি রুমে গিয়ে বসলাম। ওঁদের গেস্টরা দেখলাম চলে গেছেন। কফির কাপগুলো তখনও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেগুলো দেখে প্লাস টেনশনে — আমার বেশ কফির পিপাসা পাচ্ছিল। কিন্তু এবার আর কেউ চা- কফির জন্য আপ্যায়ন করলেন না। অরুণ ‘আমি একটু আসছি’ বলে ভেতরে চলে গেলেন। আর অশোকও আমাদের সামনে বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফায়ার প্লেসের কাঠগুলোকে খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশ্ন করলেন, “বলুন মিস্টার সেন, হাউ ক্যান উই হেল্প ইউ?”

প্রশ্নটা একেনবাবুর কানে ঢুকল কিনা জানি না, কারণ উনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফায়ার প্লেসটা দেখছেন। বললেন, “যাই বলুন স্যার, এই ফায়ার প্লেস জিনিসটা কিন্তু একেবারে মার্ভেলাস। হ্যাঁ বাড়িতে আপনাদের সেন্ট্রাল হিট আরও কীসব আছে জানি ঠিকই, কিন্তু এই উড বার্নিং ফায়ার প্লেসের আগুনের গরম স্যার, একেবারে আউট অফ দ্য ওয়ার্লড! আমি আবার স্যার ঠান্ডায় বড্ড কাবু হই! এই যে আপনার এখানে বসে আমি গনগনে তাপ পোয়াচ্ছি — ইট ইজ জাস্ট...!”

একেনবাবুর বকবকানি শুরু করতেই দেখলাম অশোকের ভুরু দুটো একটু একটু করে কুঁচকোচ্ছে। বলতে কী আমারও অস্বস্তি লাগছিল, রাত দুপুরে উনি এই খেজুরে আলাপ শুরু করেছেন দেখে!

“প্লিজ,” একেনবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অশোক বললেন, “এটা বলার জন্য নিশ্চয়ই এত রাত্রে আসেননি!”

“ইউ আর রাইট স্যার। সত্যি কথা বলতে কী স্যার, আমি গরমের কোনো কথাই ভাবছিলাম না, বরং তার উল্টোটাই ভাবছিলাম। আমার মাথায় আপনাদের ফ্রিজার নিয়ে একটা প্রশ্ন ঘুরছিল।”

“ফ্রিজার!”

“হ্যাঁ স্যার। আপনাদের বেসমেন্টে বোধহয় একটা ফ্রিজার আছে। আসলে স্যার, আমি ফ্রিজার-টিজার ঠিক চিনি না। তবে কিনা শ্যামলবাবুর বাড়িতে ক’দিন আগে একটা ফ্রিজার দেখেছিলাম। আপনাদের বেসমেন্টে যে বক্সটা আছে, সেটাও হুবহু এক সাইজ,

এক চেহারা। তাই মনে হল ফ্রিজারই নিশ্চয়ই হবে!”

“আই অ্যাম নট সারপ্রাইজড। আই ডু হ্যাভ এ ফ্রিজার ইন মাই বেসমেন্ট।”

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, অশোক তার বিরক্তিটা প্রাণপণে চাপার চেষ্টা করছেন।

“ইজ ইট ওয়ার্কিং স্যার?”

“ইয়েস।”

“আমি তো শুনেছিলাম ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।” একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন।

এত রাত্রে কারোর বাড়িতে এসে কেউ যে এরকম ননসেন্স প্রশ্ন করে যেতে পারে, সেটা বোধহয় অশোক কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু অন্যপক্ষে উনি আমাদের একেনবাবুকে চেনেন না!

“কার কাছে শুনলেন?”

“মিস্টার শিকদার স্যার...।”

“ও এবার বুঝেছি!” অশোক একেনবাবুর কনফিউশনের সূত্রটা ফাইনালি ধরতে পারলেন। “ইয়েস, ওটা খারাপ হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ঠিক খারাপ নয়। জাস্ট এ সার্কিট ব্রেকার প্রব্লেম। কোনো কারণে ওভারলোড হয়ে গিয়ে বোধহয় ট্রিপ করেছিল। অরুণ তখন সেটা বোঝেনি। তাই সবজিগুলো মিস্টার শিকদারকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে এসেছিল, নষ্ট না হয়ে যাতে পুজোর ভোগে লাগে।”

“নাউ ইট ইজ ক্লিয়ার স্যার। অ্যান্ড ইট মেকস সেন্স। আমি স্যার অস্বীকার করব না, আগের দিন আপনাদের বেসমেন্টে গিয়ে আমি একটু কনফিউজডই হয়ে গিয়েছিলাম! আই নো ইট ইজ নান অফ মাই বিজনেস স্যার, কিন্তু হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি আপনাদের ফ্রিজারের ডোরটা একটু খুলেছিলাম। আর খোলামাত্র বুঝলাম যে, ভেতরটা একেবারে আইস কোল্ড! অথচ মিস্টার শিকদার বলেছিলেন যে, ফ্রিজার খারাপ হয়ে গেছে বলে আপনারা সরস্বতী পুজোর ভেজিটেবলগুলো পাঁচ দিন আগে ডেলিভারি করেছেন! কিন্তু এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আসলে আপনাদের ফ্রিজারটা সত্যি খারাপ হয়নি!”

“ইউ আর রাইট।” কথাটা বললেন অরুণ। কোন ফাঁকে উনি যে ঘরে ঢুকেছেন আমি খেয়ালও করিনি!

একেনবাবু ঘাড়টা ঘষতে ঘষতে বললেন, “বাট দ্যাট ব্রিংস অ্যানাদার কোয়েশ্চেন স্যার। আমি সেদিন খেয়াল করেছিলাম যে, আপনাদের ফ্রিজারটা একেবারে ফাঁকা। এবং আজও যখন ডায়রিটা খুঁজতে নীচে গিয়েছিলাম, দেখলাম ওটা ফাঁকা পড়ে আছে!”

দাদা আর ভাই এক পলকের জন্য চোখাচোখি করলেন। অশোক বললেন, “ওয়েল কারণ আমরা ফ্রিজারটা বিক্রি করে একটা নতুন ফ্রিজার কিনব ঠিক করেছি।”

“মাই গড স্যার! আমার তো মনে হল ফ্রিজারটা প্রায় ব্র্যান্ড নিউ!”

“ইট ইজ নট ওল্ড,” অশোক স্বীকার করলেন, “তবে বুঝলেন তো, একবার যখন ব্রেকার ট্রিপ করেছে, তখন গন্ডগোল কিছু নিশ্চয়ই আছে।”

“এবার বুঝলাম স্যার। আমি এতক্ষণ খালি ভাবছিলাম, কিংসে জলের দরে ফ্রোজেন ভেজিটেবল বিক্রি হয়ে গেল, অথচ আপনারা সেগুলো কিনলেন না কেন! এদিকে শ্যামলবাবু বলছিলেন আপনারা দু'জনে এত হিসেব করে চলেন। আই মিন ভাল সেন্সেই বলছিলেন। শুধু শ্যামলবাবু কেন, আমি নিজেই তো সেদিন দেখলাম স্যার, খাবার পর লেফট ওভারগুলো কেমন যত্ন করে আপনারা তুলে রাখছেন। ভেরি গুড হ্যাবিট স্যার,

ভেরি গুড হ্যাবিট। এনিওয়ে, আই ওয়াজ ভেরি কনফিউসড! কিংসে এরকম বার্গেন পেয়েও আপনারা তার সদ্ব্যবহার করলেন না। আসলে বুঝলেন কি না, আমার সমস্যা হচ্ছে...”

একেনবাবু বোধহয় একটা দীর্ঘ বক্তৃতার প্ল্যান করছিলেন, কিন্তু অরুণ সেটা থামিয়ে দিলেন।

“মিস্টার সেন, আমার দাদার অসম্ভব ধৈর্য, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট। আপনার কি আর কিছু বলার আছে?”

“আছে স্যার।”

“দেন সে ইট, বাট ডু হারি, ইট ইজ গেটিং লেট!”

“হ্যাঁ স্যার।” বলে একেনবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাতে গিয়ে কী ভেবে থেমে বললেন, “সিগারেট খেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না তো? মানে যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহলে...।”

“না হবে না,” অরুণ বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন, “জাস্ট গেট গোইং।”

“না, থাক স্যার। বড্ড ব্যাড হ্যাবিড!”

‘মিস্টার সেন, আই অ্যাম রানিং আউট অফ পেশেন্স! আপনার বক্তব্যটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন!” অরুণ অসহিষ্ণু ভাবে বললেন।

“আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, গোভিন্দ জসনানির মৃত্যুটা আমার কাছে একটু মিস্টিরিয়াস?”

“তার মানে?” অশোক প্রশ্নটা করলেন।

“মানে ওঁর হঠাৎ এই ব্রিফকেস নিয়ে অদৃশ্য হওয়াটা, আর তার এক হপ্তা বাদে ওঁর মৃতদেহটা ব্রিফকেস সমেত প্রায় অক্ষত অবস্থায় ট্যাপান জি ব্রিজের কাছেপাওয়াটা। সামথিং ইজ নট কোয়ায়েট রাইট স্যার। ”

“হোয়াটস রং দেয়ার?” এবার অরুণ প্রশ্নটা করলেন। “আমার তো ধারণা, ইন্সপেক্টর লান্ডির বিশ্বাস যে, সামবডি ফার্স্ট রবড হিম অফ অল দ্য মানি। তারপর ওঁকে ধাক্কা দিয়ে হাইওয়ে থেকে নীচে ফেলে সে অদৃশ্য হয়।”

“এটা মন্দ বলেননি স্যার। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে, উনি মারা যান হার্ট অ্যাটাকে। যদি মনে করি স্যার, ওঁর হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল রাস্তা থেকে ওকে ফেলে দেবার পর, তা হলে কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যায়!”

“গোলমেলে হয়ে যায়?” এবার অরুণ প্রশ্নটা করলেন।

“হয়ে যায় না স্যার?” যেলোকটা অতগুলো টাকা কেড়ে নিল, সে কেন তার ভিক্টিমকে জীবিত অবস্থায় ওভাবে ফেলে রেখে চলে যাবে! বুঝতে পারছেন স্যার আমি কী বলছি? মিস্টার জসনানি তো সেক্ষেত্রে পরে পুলিশের সামনে লোকটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেন!

“হু নোজ, তার মুখে হয়তো মুখোশ ছিল।” অরুণ বললেন। “সুতরাং আইডেন্টিফাই করার প্রশ্নই ওঠে না।”

“ঠিক, সেটা অবশ্যই একটা পসিবিলিটি স্যার।” স্বীকার করলেন একেনবাবু।

“তাহলে? এ ছাড়াও অনেক পসিবিলিটি আছে মিস্টার সেন,” এবার অশোক বললেন। “আমি ধরে নিচ্ছি যে, গোভিন্দ আঙ্কল কারও কাছ থেকে গাড়িতে রাইড নিচ্ছিলেন। সে লোকটা যখন আঁচ পায় যে, আঙ্কলের ব্রিফকেসে এত টাকা আছে। হি স্টপড দ্য কার এবং ব্যাগটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরকম একটা ফিজিক্যালি স্ট্রেসফুল

সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গোভিন্দ আঙ্কল হার্ট অ্যাটাকে কোলাপ্স করেন। দ্য রেস্ট ইজ সিম্পল। হি ডাম্পড দ্য বডি। আফটার অল, এ ডেড ম্যান উইল নেভার বি এবল টু আইডেন্টিফাই, তাই না?"

"আমিও ঠিক এটাই ভেবেছিলাম স্যার। তবে কিনা একটা ব্যাপার তাতে ক্লিয়ার হয় না।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন?"

"ব্রিফকেসের লকটা একেবারে পারফেক্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে! আমি নিজেই দেখেছি স্যার। আমি তো ভেবেছিলাম লকটা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যাবে। না স্যার, তা নয় — দ্য লক ওয়াজ স্পটলেসলি ক্লিন, অ্যান্ড কমপ্লিটলি ইনট্যাক্ট!"

অশোক ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বললেন, "পারহ্যাপস, লোকটা পিস্তল দেখিয়ে গোভিন্দ আঙ্কলকে দিয়েই ব্রিফকেসটা খুলিয়েছিল।"

"ট্রুলি অ্যামেজিং স্যার! বিশ্বাস করুন আমিও তাই ভেবেছিলাম! কিন্তু তখন আমার মনে পড়ল স্যার, ব্রিফকেসটা তো আপনাদের বাড়ির। লকের কম্বিনেশনটা জানেন আপনারা, আর আপনাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন শ্যাম মিরচন্দানি। মিস্টার জসনানির তো সেটা জানার কথা নয়! কারণ, যখন ব্রিফকেসটা আপনাদের কাছ থেকে মিস্টার মিরচন্দানি ধার নেন, তখন মিস্টার জসনানি ওয়াজ আউট অফ দ্য হাউস। তাই না?"

"আমি হয়তো অন্য কোনো সময় ওঁকে কম্বিনেশনটা বলেছিলাম," অরুণ বললেন। "ইন ফ্যাক্ট, আমার এখন মনে পড়ছে, আই ডিড টেল হিম।"

"কিন্তু আরেকটা সম্ভবনা আছে স্যার।"

"সেটা কি?" দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্নটা করলেন।

"ধরুন স্যার, আপনাদের দু'জনের মধ্যেই কেউ টাকাটা ব্রিফকেস থেকে সরিয়েছেন!"

"বি কেয়ারফুল মিস্টার সেন, কী যা তা বলছেন আপনি!"

"এখানে স্যার সম্ভবনার কথা হচ্ছে। হতে তো পারে যেমন আপনাদের মধ্যে একজন বা দু'জন মিলেই টাকাগুলো আত্মসাৎ করে, শুক্রবার রাত্রে মিস্টার জেসনানির বডিটা হাইওয়ের পাশে ডাম্প করে এসেছেন!"

"দিস ইজ আটারলি ননসেন্স!" অশোক বেশ কড়া গলায় বললেন, "টাকার কথা ছাড়ুন। শুধু শুধু আমরা বাড়ির গেস্টের ডেডবডি বাইরে ওভাবে ডাম্প করতে যাব কেন? ইউ আর নট ইমপ্লায়িং দ্যাট উই কিলড হিম!"

"নো স্যার, অ্যাবসলুটলি নট। ওঁর মৃত্যু পুরোপুরো স্বাভাবিক।"

"তাহলে?"

"সেটাই ছিল আমার পাজল স্যার। অস্বীকার করব না, পাজল হিসাবে এটা ছিল অতি মোক্ষম! আমি স্যার পুরোপুরি কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম। আপনারা যদি সত্যি খুন না করে থাকেন, তাহলে ওভাবে ডেড বডিটা ডাম্প করতে যাবেন কেন? আর তখনই চিন্তাটা আমার মাথায় এল স্যার — আমার মন বলল, আপনারা কিছু একটা ঢাকার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ আমার মনে পড়ল এরকম একটা কেসের কথা আমি কোথাও পড়েছি। এমনকি সিনেমাতেও বোধহয় দেখেছি।"

একেনবাবু যে কী বলতে চাচ্ছেন, আমি তখনও বুঝতে পারছি না! কিন্তু অশোক আর অরুণ বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পারছিলেন। কারণ ওঁদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের বদলে একটা চাপা আতঙ্ক ফুটে বেরোচ্ছে! অরুণ দেখলাম দেওয়াল-আলমারিটার দিকে আস্তে

আস্তে এগোচ্ছেন।

একেনবাবু সেটা লক্ষ্য করে অরুণকে বললেন, "স্যার, ইন্সপেক্টর লান্ডি কিন্তু বাইরে তাঁর লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন। পাপের বোঝা আর বাড়াবেন না!"

কথাটা শোনামাত্র ম্যাজিকের মত কাজ হল! অরুণ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন! শুকনো গলায় অরুণ বললেন।"

"আমি শ্যাম মিরচন্দানির খুন হওয়ার কথাটা বলছি!"

"হোয়াট!" এবার আর সাহানি ব্রাদার্স নয়, আমার মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে গেল।

"হ্যাঁ স্যার।" আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন।

"শ্যাম মিরচন্দানি যখন নিউ ইয়র্কে ওঁর কাস্টমারদের কাছ থেকে পাওনা-গন্ডা আদায় করছেন, সেই সময়ে এখানে এই বাড়িতে এঁদের দু'জনের সামনেই মিস্টার জসনানি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। এই দু'ভাই জানতেন যে, মিস্টার মিরচন্দানি সেদিন প্রায় মিলিয়ন ডলার ক্যাশ নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন। তখনই বোধহয় স্যার, ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা এঁদের মাথায় আসে। ইট ইজ এ কমপ্লিকেটেড প্ল্যান। কিন্তু ঠিক মত এগজিকিউট করতে পারলে, দে উইল বি এ মিলিয়ন ডলার্স রিচার! যেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে একটা মার্ডার, তারপর এ সুইচ বিটুইন টু ডেড বডিজ।

"ওঁদের পরিচিত ডাক্তার যখন মিস্টার জসনানিকে দেখতে বাড়িতে এলেন, তখন তাঁকে এঁরা মিথ্যে করে পেশেন্টের নাম বলেন শ্যাম মিরচন্দানি। নাউ হাউ উইল দ্য ডক্টর নো! তিনি কোনো রকম সন্দেহ না করে স্যার, শ্যাম মিরচন্দানির নামে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে চলে গেলেন। তারপর যখন শ্যাম মিরচন্দানি বাড়িতে ফিরলেন, এই দু'ভাই মিলে তাকে হত্যা করলেন। হয় বিষ খাইয়ে, নয় গলা টিপে। ঠিক কী করে সেটা শুধু ওঁরাই জানেন। নাউ দে হ্যাভ মিরচন্দানিস ডেডবডি অ্যান্ড এ ভ্যালিড ডেথ সার্টিফিকেট! দাহ করার সময় ফিউনারেল হোম বা লোকাল অথরিটির সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকবে না।

"নেক্সট স্টেপ স্যার, মিস্টার জসনানির বডিটাকে পাচার করা, কারণ আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি ওয়ান ডেডবডি টু মেনি! কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে স্যার। দ্বিতীয় ডেড বডিটা যদি খুব তাড়াতাড়ি পুলিশের নজরে আসে, তাহলে একটু ঘোঁট পাকতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি বডিটা আট-দশ দিন পরে খুঁজে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কারও কোনো সন্দেহ জাগবে না। ওয়েদার যদি ঠান্ডা থাকত তাহলে এই সময়ের জন্য বডিটা ওঁদের ব্যাক ইয়ার্ডেই লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু মনে আছে স্যার, ক'দিন হঠাৎ কীরকম আনইউজুয়াল গরম পড়েছিল! তখনই ওঁরা ঠিক করলেন যে, বডিটা ফ্রিজারে রেখে দেবেন।

"তার পরের সব খবর আপনি জানেন। বাঙালি ক্লাব হঠাৎ এক ফ্রিজার ভেজিটেবল পেল, পুলিশে খবর গেল জসনানি ব্রিফকেস নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন! শ্যাম মিরচন্দানিকে যোগ্য সমারোহের সঙ্গে দাহ করা হল, যাতে কারও মনে কোনো সন্দেহ না জাগে! তারপর গত শুক্রবার যখন বরফ পড়তে শুরু করল, তখন এঁরা জসনানির বডিটা ফ্রিজার থেকে বের করে হাইওয়ের পাশে নিয়ে গিয়ে ডাম্প করে এলেন। সেই সঙ্গে ফাঁকা ব্রিফকেসটা, যাতে জসনানি যে টাকা চুরি করে পালিয়েছেন, সেই থিওরিটা প্রমাণিত হয়। ওঁরা ভেবেছিলেন যে, জসনানির মৃত্যুটা নিয়ে খুব একটা তদন্ত হবে না, কারণ ইট ইজ নট এ মার্ডার। কী স্যার, আমি ভুল বলছি?" অরুণ আর অশোকের দিকে তাকিয়ে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"ইউ হ্যাভ নো প্রুফ," অরুণ মনে হল আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করছেন। "অল ইউ সেইড ইজ জাস্ট ইয়োর ইমাজিনেশন।"

"অন দ্য কনট্রারি স্যার, আই ক্যান গেট অল দ্য প্রুফ আই ওয়ান্ট। আপনাদের ডাক্তারকে মিস্টার জসনানির ফটোটা দেখালেই উনি সাক্ষী দেবেন যে, ওঁর ডেথ সার্টিফিকেটই উনি লিখেছিলেন। ইন্সপেক্টর লান্ডি আপনাদের ফ্রিজারটা ফরেন্সিক এক্সপার্টের কাছে নিয়ে যাবেন। বিলিভ মি স্যার। এদেশের ফরেন্সিক সায়েন্স হচ্ছে ট্রুলি অ্যামেজিং! কী থেকে যে এরা কী বের করে...।"

বাইরে এদিকে ইন্সপেক্টর লান্ডি দরজায় বেল বাজাচ্ছেন ঘরে ঢোকার জন্য।

।। ১২ ।।

শ্যামলদার বাড়িতে বসে গল্প হচ্ছিল। শ্যামলদা একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন আপনার সন্দেহ হল একেনবাবু যে, সাহানিরা এর মধ্যে জড়িত?"

"যখন স্যার আমি ব্রিফকেসটা দেখলাম, তখনই বুঝলাম, ওঁরাই, সম্ভবত অরুণ সাহানিই টাকাটা সরিয়েছেন। কিন্তু মিস্টার জসনানির অদৃশ্য হওয়া, আর তার প্রায় এক হপ্তা পরে ওঁর বডিটা হঠাৎ ওভাবে হাইওয়ের পাশে পেয়ে যাওয়াটা কুড নট বি এক্সপ্লেইনড। বিশেষ করে মৃত্যুটা যখন পুরোপুরি স্বাভাবিক। সো আই ওয়াজ রিয়েলি পাজলড স্যার।"

"কখন আপনি বুঝলেন যে, এর মধ্যে কোথাও একটা খুন জড়িয়ে আছে?"

"যখন রেস্টুরেন্টে বসে 'টু টেল দ্য ট্রুথ' শো-টা দেখছিলাম স্যার। আই ওয়াজ ওয়াচিং দ্য শো। বাট আই হ্যাড নো আইডিয়া স্যার, হু দ্য রাইট পার্সন ওয়াজ! আর ঠিক তখনই আমার চোখ খুলে গেল! আসলে ব্যাপারটা খুব সিম্পল স্যার! আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, শ্যাম মিরচন্দানির ডেথটা ন্যাচারাল। কারণ ডাক্তার সেটাই বলেছেন। হ্যাঁ ডাক্তার একজনকে স্বাভাবিক ভাবে মারা যেতে দেখতে পারেন। কিন্তু কী করে তিনি জানবেন, যে সেই লোকটাই হচ্ছে শ্যাম মিরচন্দানি? যখন এই প্রশ্নটা মাথায় এল, এভরিথিং কুড বি এক্সপ্লেইনড।"

"কিন্তু আপনি যে বললেন এরকম একটা কেসের কথা কোথাও পড়েছেন— একটা সিনেমাতেও বোধহয় দেখেছেন।"

"নিশ্চয়ই পড়েছি বা দেখেছি স্যার, কিন্তু ঠিক কোথায় সেটাই এখন মনে পড়ছে না। আসলে স্যার লক্ষ লক্ষ বই আর সিনেমারহস্য আর খুনের সবরকম সম্ভবনাই কোথাও না কোথাও কভার হয়ে আছে!"

বেন্টুমাসি ফ্লোরিডা থেকে আনা পান চিবোতে চিবোতে শ্যামলদাকে বললেন,

"এবার বোঝ, আমার তো কোনো কথাই কানে দিস না। তোকে বলিনি যে, ন্যাচারাল ডেথ-ফেথ নয়, ওটা হচ্ছে পুরো মার্ডার?"

ঢাকা রহস্য উন্মোচিত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১ ।।

কিছুদিন হল একেনবাবু গাছ নিয়ে পড়েছেন। ওঁর মাথায় যখন একবার কিছু চাপে, তখন সেটা সরানো মুশকিল। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট লাগোয়া একটা ছোট্ট বারান্দা আছে। সেখানে দুটো চেয়ার কোনো মতে বসানো যায়। অবশ্য বারান্দায় বসে মনোহর কিছু দেখা যায় না ঠিকই। তবে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি-টাড়ি প্রচুর চলে। আর যেহেতু আমরা নিউ-ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কাছে থাকি। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় সবসময়েই লেগে থাকে। কেউ হাঁটে, কেউ জগিং করে। রাস্তার পাশে একটা স্টারবাক কফি শপ আছে-তার সামনের চত্বরে চেয়ার-টেবিল সাজানো। সেখানে দু'-একজন বসে থাকে ল্যাপটপ খুলে। বেশিরভাগই হাত-পা ছড়িয়ে কফি, এস্প্রেসো, মোকা লাতে, বেগেল ইত্যাদি খায় আর প্রচণ্ড হৈ চৈ করে। আটতলার উপরে বসে সে-সব দেখতে মন্দ লাগে না। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। একেনবাবু বারান্দায় গোটা পনেরো ফুল গাছের টব বসিয়েছেন। বই ঘেঁটে ঘেঁটে গাছগুলোর নানান তদারকি চলছে।

বাগান সম্পর্কে আমার চিরদিনের ধারণা মাটি কুপিয়ে বীজ বা চারা লাগানো। মাঝে মধ্যে গোবর সার জাতীয় কিছু দেওয়া। আজকাল আরও হরেক রকমের কেমিক্যাল সার বেরিয়েছে জানি, কিন্তু তার কতটা ব্যবহার করতে হবে, কখন দিতে হবে, কোন গাছে দিতে হবে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু একেনবাবুকে বইয়ের পাতা ঘন ঘন উলটে সাদা, খয়েরি, নীল, সবুজ-নানা রঙের দানা মেপে মেপে টবের উপর ফেলতে দেখে মনে হল এর থেকে কেমিস্ট্রির এক্সপেরিমেন্টও সহজ। প্রমথকে একদিন সেটা বলতে ও খ্যাঁক খেঁকিয়ে উঠল, "রাখ তোর একেনবাবুর বারান্দা-বাগান। এখন পর্যন্ত একটা ফুলও চোখে দেখলাম না, এদিকে বারান্দায় যাবার জো নেই। দেব একদিন সব কিছু ফেলে।"

একেনবাবুর ডিফেন্স হচ্ছে ফুল ফোটার সময় এখনও আসেনি। আমাদের আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে। তবে উনি যে একটু উদ্বিগ্ন সেটা বুঝলাম। একদিন বলেই ফেললেন,"সূর্যের আলো বেশি আসছে না স্যার বারান্দায়।"

প্রমথ সামনে ছিল। বলল,"তা আপনি কী করতে বলেন, বারান্দাটাকে ঘুরিয়ে পুব-মুখো করে দেবো। এদিকে যে আলো বেশি আসে না — সেটা তো দু'বছর ধরে দেখছেনই, কী তাহলে বাগানের এক্সপার্ট হলেন!"

"না তা নয় স্যার, ফুল আসবেই। তবে কিনা পুরো পোটেনশিয়ালটা রিয়্যালাইজ হবে না।"

"আর্টিফিশিয়াল লাইট লাগান। তবে ইলেকট্রিসিটির বিল আপনি দেবেন, 'শেয়ার করুন স্যার' বলে বায়না ধরবেন না। ইন ফ্যাক্ট, বারান্দাটা তো আমরা কেউ ব্যবহার করতে পারছি না, বাপি বরং বারান্দার এরিয়াটা ক্যালকুলেট করে আপনার ভাড়ার শেয়ারটা বাড়িয়ে দিক।"

প্রমথ সত্যিই একেনবাবুর পেছনে লাগতে পারে।

"কী যে বলেন স্যার, এই ফুলগুলো যখন ফুটতে শুরু করবে, কীরকম শোভা হবে বলুন তো? আমি জানি ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা ফুল ভালোবাসেন।"

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর গার্লফ্রেণ্ড, যদিও প্রমথ গার্লফ্রেণ্ড কথাটা শুনলে তেলে-বেগুন হয়ে যায়। জাস্ট ফ্রেণ্ড — আগে আবার বিশেষণ যোগ করতে হবে কেন?

যাকগে ওসব কথা। যেটা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হল বছর কয়েক হল — আমরা একটা বড় অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে তিনজনেই একসঙ্গে আছি। প্রমথই উদ্যোগ নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা জোগাড় করেছে। ওর মতে এটাই সবচেয়ে ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট, কারণ একেনবাবুর হ্যাপা এক জনের পক্ষে সামলানো অসম্ভব। দু'জন থাকলে উনি একটু কন্ট্রোলে থাকবেন।

আজ সকালে একেনবাবু আর প্রমথ দু'জনেই বেরিয়েছে। একেনবাবুকে গাছের জন্য একটা ওষুধ কিনতে হবে। একটা গাছের পাতায় 'লিফ মাইনর' না কী একটা অসুখ হয়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই ক্ষেপে গেছেন। এমনিতে হাড়-কেপ্পন, কিন্তু গাছের পেছনে যা খরচা করেছেন, তা দিয়ে উনি স্বচ্ছন্দে ওঁর পুরনো অল-ওয়েদার কোটটি বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন কোট কিনতে পারতেন। কী আর করা। তবে ওরা যাওয়াতে আমার সুবিধা হয়েছে। আজকে খুব রিল্যাক্স করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনব আর নিউইয়র্ক টাইমস পড়ব। গত দু'-সপ্তাহ ধরে খাতা দেখা আর একটা রিসার্চ পেপার লেখার চাপে গা ছেড়ে জীবনটা উপভোগ করা হয়নি। কিন্তু সেটা হবার কি জো আছে। ডিং ডং বেল। দরজা খুলে দেখি তারেক আলী।

"বুঝলেন বাপিদাদা, বাংলাভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের বাংলাদেশ, আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ নয়।"

"কী খবর', 'কেমন আছেন' দূরে থাক, 'হ্যালো' পর্যন্ত নয়। প্রথমেই একটা যুদ্ধং দেহি ভাব!

চট করে তারেকের পরিচয়টা দিয়ে নিই। তারেক ক'মাস হল আমাদের পাশের টু-রুম অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে। কোনো একটা আই.টি ফার্মে কাজ করে। বাড়ি ঢাকাতে। কয়েক মাস হল এইচ-১ ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে। শুধু তারেক নয়, ওর সঙ্গে মামুদ বলে আরও একটি ছেলে এসেছে — একই কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে। কিন্তু মামুদ একটু মুখচোরা, বিশেষ আসে না। তারেকভায়া একাই একশো। একেনবাবুর সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত লোক। মাঝে মাঝে যখন তারেক আর একেনবাবুর বকবকানির সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়, তখন আমি কাজ আছে বলে অফিসে পালাই। তবে মাঝেমধ্যে তারেকের কথাগুলো মন্দ লাগে না। ছেলেটার মধ্যে একটা চাপা হিউমার আছে। সেই হিউমারটা পরিপূর্ণ রূপ পায় ওর বাঙ্গাল কথার টানে। সেই কথা আর সুরকে অক্ষরে তুলে ধরার ক্ষমতা আমার নেই। বাঙ্গাল পাঠকদের কাছে তাই আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একদিন হঠাৎ তারেক বলল,"বুঝলেন দাদা, বাংলাদেশের মতো প্রোগ্রেসিভ দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।"

প্রমথ সকালে সবার জন্য ডিমের অমলেট করছিল। রান্নাঘর থেকেই তারেকের কথা শুনে চেঁচিয়ে বলল, "হোয়াট ননসেন্স!"

"ননসেন্স কেন দাদা, ভুল তো কিছু আমি বলছি না।"

আমিও বলে উঠলাম, "কী প্রোগ্রেস এত দেখলে শুনি?"

"আচ্ছা শোনেন। আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্টকে আমরা সবংশে নিধন করেছি, দ্বিতীয় প্রেসিডেন্টকে শুধু একা মেরেছি। তৃতীয় প্রেসিডেন্টকে মারিনি, শুধু জেলে পুরেছি প্রোগ্রেসটা একবার দ্যাখেন?"

প্রমথ যে প্রমথ সেও বলে উঠল, "নাহে, এবার তোমার কথাটা মানছি।"

তারেক আসা মানে নিউ ইয়র্ক টাইমস পড়া আজ মাথায় উঠল। অন্ততঃ ঘন্টাখানেক বক্তৃতা করবেই। কিন্তু বাংলাদেশের ছেলে — দুই বাংলার মিলন ঘটাতে এসেছে, তাকে তো আর তাড়ানো যায় না।

জিজ্ঞেস করলাম, "কফি খাবে?"

"না দাদা," তারেক বলল, "উত্তরটা কিন্তু দিলেন না, কথাটা আপনি মানেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন কথাটা?"

"এই যে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কথা।"

"তোমার এই কথা বলার বেসিস কী?"

"আপনারা।"

"আমরা! হোয়াই?"

"এই যে দাদা, আপনারা কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন। 'যুক্তি' অথবা 'কেন' না বলে বললেন 'বেসিস' আর 'হোয়াই'। বাংলা যখন বলবেন, তখন শুধু বাংলা বলবেন, ইংরেজি যখন শুধু ইংরেজি।"

কথাটা তারেক ভুল বলেনি। আমার অর্ধেক কথাতেই ইংরেজি এসে যায়। ফ্র্যাঙ্কলি অনেক কথা বাংলাতে কী হবে সেটাই মাথায় আসে না। কিন্তু সাতসকালে তারেকের এই বক্তব্য আমি মানতে রাজি নই। ভাষা নিয়ে যুদ্ধ করেছিস — বেশ করেছিস, কিন্তু তা বলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাকে বাংলাদেশী বাংলা হারিয়ে দেবে — এ আবার কি আবদার! বিশেষ করে যারা জলকে পানি বলে, আর স্নানকে গোসল — তারা বাংলা নিয়ে মাতব্বরি করবে কেন? কিন্তু ওটা একটু ডেলিকেট সাবজেক্ট। তাই বললাম,"দ্যাট্‌স লাইফ। ভাষা তো চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকে না। প্রয়োজনে বদলায়। ইংরেজিতেও তো অনেক অন্যান্য ভাষা এসেছে।"

"কিন্তু তা বলে দাদা হোয়াইকে বাংলায় নিয়ে আসবেন — 'কেন'-টা কী দোষ করল?"

"তোমরাও তো বাপু দিদিকে আপা বল, পিসি না মাসিকে বুয়া।"

"আপনি দাদা রেগে তক্কো করছেন। সত্যি ভেবে দেখুন, গান বলুন, নাটক বলুন, সিনেমা বলুন — বাংলাদেশের সঙ্গে কি আপনারা পেরে উঠছেন?"

"গানে তোমরা এগিয়ে আছো?"

"আছি দাদা। বের করুন একজন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।"

"স্যাম্পল অফ ওয়ান দিয়ে তুমি তোমার থিওরি প্রুভ করতে চাও?"

"তা নয় দাদা, আপনারা তো আমাদের অন্য আর্টিস্টদের গান শোনেন না, বন্যাই এখানে আসেন — সেটাই শোনেন। তারপর দেখুন, নাটক বা টেলিফিল্ম — অপি করিমের মতে বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকা আপনাদের টিভিতে কেউ আছে? তিশা, বাঁধন বা বিপাশা হায়াতের মতো সুন্দরী?"

"যাদের কথা বলছো, তাদের কাউকেই দেখিনি।"

"তাহলে বলি দেখুন। দেখলে আপনার চোখ জুড়বে, আমার সঙ্গে আর তর্ক করবেন না।"

"তুমি পশ্চিমবঙ্গের সব অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের দেখেছো?"

"আলবাৎ দাদা, নইলে তুলনামূলক বিচার করব কী করে? পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা আমরা পড়ি, সিনেমা দেখি, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাগুলো পড়ি। সেগুলোও তো সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার একটা অঙ্গ। এবার আপনি বলুন, বাংলাদেশের লেখকদের কী কী বই আপনি পড়েছেন?"

"দেখো বাপু, আমি ফিজিক্সের বই শেষ করারই সময় পাই না। বাংলা সাহিত্য তো দূরের কথা।"

"তাই তো বলছি দাদা, বাংলাকে বাংলাদেশই বাঁচিয়ে রাখবে।"

লাকিলি এই সময়ে একেনবাবু ঘরে ঢুকলেন। "এই যে স্যার, কী মনে করে?"

"একটু গল্প করতে এসেছিলাম দাদার সঙ্গে।"

"বাপু সত্যি কথাটাই বল না — তর্ক জুড়তে এসেছ।"

"কী যে বলেন দাদা, তর্ক কোথায়....একটু আলোচনা।"

"কী নিয়ে আলোচনা স্যার, বলুন একটু শুনি?"

"আমি বলেছিলাম বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে বাংলাদেশ–পশ্চিমবঙ্গ নয়। কিন্তু দাদা মানতে রাজি নন।"

"কেন স্যার?"

"আপনি তারেকের পক্ষ নিচ্ছেন?"

"পক্ষ নিচ্ছি না স্যার, আপনার পজিশনটা বুঝতে চাচ্ছি।"

"আমার কোনো পজিশন নেই — এইসবে সময় নষ্ট করা।"

"এইটেই দাদা ঠিক বলেছেন। আপনারা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী — তাঁরা বাংলা নিয়ে সময়ে নষ্ট করছেন না বলেই বাংলা ভাষাটা পশ্চিমবঙ্গে ধ্বংস হবে।"

"চুকে যাবে, এখন তো ইংরেজি আর হিন্দিরই যুগ।"

"তা হোক দাদা, কিন্তু একেনবাবুর যে কাহিনিগুলো লিখছেন — সেগুলোও তো কেউ পড়বে না।"

"এখনও কেউ পড়ে নাকি? লোকে না চেনে একেনবাবুকে, না জানে বাপিকে।"প্রমথ কখন ঘরে ঢুকেছে টেরও পাইনি।

"কেন দাদা, আমি তো পড়েছি।"

প্রমথ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ওস্তাদ। বলল, "তাই নাকি? কোত্থেকে?"

"ওই যে আপনাদের একটা পত্রিকা বেরোয় 'সুখী গৃহকোণ' — সেইখানে!"

"কোথায় পড়েছিলে, বাংলাদেশে যখন ছিলে?"

"না, না বাপিদাদা পড়তে দিয়েছিলেন।"

"তাহলে মোট দুজন পড়েছো — বাপি নিজে আর তুমি। কারণ আমি পড়িনি, একেনবাবুও না।"

"না, না, প্রমথদা, মামুদও পড়েছে।"

"তাহলে তিন জন। তবে জিজ্ঞেস করে দেখো – পুরোটা পড়েছে কিনা। কারণ বাপির লেখাটা কয়েক পাতার পরেই ঝুলে যায়।"

একেনবাবু আমার পক্ষ নিয়ে বললেন, "কী যে বলেন স্যার। 'সুখী গৃহকোণ' — এর তো এখন অনেক সেল হয়।"

"সে নিয়ে তো আমি প্রশ্ন তুলছি না। ডিকশনারিও তো প্রচুর বিক্রি হয়, আপনিও তো কিনেছেন একটা। কোনো দিন ব্যবহার করেছেন?"

প্রমথর পাঞ্চগুলো একেবারে র‍্যাণ্ডম। সত্যি, কোনো বানান জানতে হলে একেনবাবু প্রমথকেই জিজ্ঞেস করেন। ও না থাকলে আমাকে। ডিকশনারিটা বহুদিন ধরেই তাকের উপর অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

"বই কিনলেই যদি পড়া হয়ে যেত, তাহলে এতগুলো ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর ফেল করত না।"

এই রকম অদ্ভুত যুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। তার ওপর প্রসঙ্গটা যখন আমার লেখা নিয়ে, আমি এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না।

প্রসঙ্গটা তারেকই পালটালো। বলল, "আসলে আমি এসেছিলাম একেনবাবুর কাছে।"

"আমার কাছে স্যার। কী ব্যাপার?"

"মামুদকে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে।"

"কী সমস্যা?"

"বলছি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, " দাদা, তাহলে ওই কফিটা বানান, খেতে খেতে বলি।"

কফি খেতে খেতে তারেক যা বলল, সেটা হল মামুদ কয়েকদিন হল খুব ডিপ্রেসড হয়ে আছে। মামুদ এমনিতে কথাবার্তা কমই বলে। তবে এ ক'দিন দু'-একটা হ্যাঁ হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলেনি। শেষে তারেকের পীড়াপীড়িতে ও জানিয়েছে দেশ থেকে একটা চিঠি পেয়ে ওর সন্দেহ হচ্ছে যে পাঁচ মাস আগে ঘটে যাওয়া ওর বাবার মৃত্যুর মধ্যে হয়তো কোনো রহস্য আছে — ওটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

তারেক জিজ্ঞেস করেছে — কার চিঠি?

মামুদ উত্তর দিয়েছে, চিঠিটা ওর বাবারই লেখা। এসেছে বাবার অ্যাটর্নির কাছ থেকে। যাই হোক, তারেক আর বিশেষ কিছু জানতে চায়নি। কিন্তু মামুদকে বলেছে যে, ও একবার একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখুক। তিনি হয়তো এ বিষয়ে একটা মতামত দিতে পারবেন। মামুদ প্রথমে উৎসাহ দেখায়নি — বোধহয় ওর সমস্যা নিয়ে আর কাউকে বিব্রত করতে চায়নি। কিন্তু পরে রাজি হয়েছে। কিন্তু নিজে এ নিয়ে অনুরোধ করতে অস্বস্তি বোধ করছে, তাই তারেক এসেছে একেনবাবু মামুদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হবেন কিনা জানতে।

একেনবাবু সব শুনে বললেন, "কী আশ্চর্য স্যার, এটা কি কোনো কথার কথা।"

।। ২।।

খানিক বাদে তারেক মামুদকে নিয়ে এল। তারেক ভুল বলেনি। মামুদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, ওর মনের ওপর একটা ঝড় চলছে। ঘরে প্রায় নিঃশব্দে ঢুকে সোফার একটা কোণে চুপ করে বসল। এমনিতেই যতবার ও এসেছে দু'-একটার বেশি কথা বলেনি। ওকে কথা বলানো মানে, প্রশ্ন করা আর তার উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' শোনা। আজ যদিও নিজের তাগিদেই এসেছে কথা বলার জন্যে। কিন্তু স্বভাবোচিত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে

পারছে না। এমনিতে ও ব্যাপারটা কতখানি বলতে পারবে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তারেক এবং একেনবাবু যখন আছেন, তখন প্রশ্নের কিছু কমতি হবে না। সুতরাং তথ্য উদঘাটন চট করে না হলেও, সেটা যে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা সবাই চুপ করে আছি। নিস্তব্ধতাটা একেনবাবুই ভাঙলেন।

একেনবাবু বললেন, "বলুন স্যার, তারেক সাহেব বললেন আপনি আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।"

"আমি একটু চিন্তায় পড়েছি," মামুদ আস্তে আস্তে বললেন।

"কীসের চিন্তা স্যার?"

"হয়তো অহেতুক চিন্তা, কিন্তু মাথা থেকে সরাতে পারছি না। আপনাকে বলতে চাই, আবার মনে হচ্ছে — চিন্তাটা এতই অর্থহীন যে এ নিয়ে অন্যদের বিব্রত করাটাও বোধহয় অনুচিত।"

'স্যার আপনি এত ভাবনা করছেন কেন, বলে ফেলুন। বন্ধুদের কাছে বলবেন স্যার — এ নিয়ে এত সঙ্কোচ কেন?"

"সঙ্কোচ ঠিক নয়, আসলে ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়।"

"বলে ফেলুন স্যার। তারেক সাহেব বলছিলেন একটা চিঠির কথা — তাতে নাকি কিছু একটা খবর আছে।"

"চিঠির কথাটা ঠিকই বলেছে তারেক। বাবা একটা চিঠি আনোয়ার চাচার কাছে রেখে যান — বাবার মৃত্যুর পর আমাকে দেবার জন্য।

"আনোয়ার চাচা?"

"আনোয়ারচাচা হলেন বাবার অ্যাটর্নি।"

"বুঝলাম স্যার। চিঠিতে কী ছিল?"

"দু'লাইনের চিঠি। আশঙ্কা করছি, আমার হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। সম্পত্তিতে তোর অধিকার তুই ছাড়বি না।' এই প্রথম লাইনটাই আমাকে প্রচণ্ড ভাবে বিচলিত করেছে। কেন কথাটা উনি লিখেছিলেন?"

"এই চিঠির ব্যাপারে আপনি আগে কিছু জানতেন না স্যার?"

"না, বাবা আমায় কিছু বলে যাননি।"

"আপনার বাবা কতদিন আগে মারা গেছেন?"

"আমি এদেশে আসার মাস দুয়েক আগে — তা প্রায় মাস পাঁচেক হল।"

"আপনার আনোয়ারচাচা এতদিন চিঠিটা দেননি কেন স্যার?"

"আনোয়ারচাচা নিজে বেশ কয়েকমাস মরণাপন্ন অসুস্থ ছিলেন। কিছুদিন হল আবার কাজকর্ম শুরু করেছেন। উনি লিখেছেন চিঠিটার কথা উনি ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওঁর নজরে এসেছে।"

"আই সি। তা আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন স্যার, ওঁর মৃত্যুটা কি অস্বাভাবিক ভাবে হয়েছিল?"

"সেটা নিয়েই ভাবছি। বাবা মারা যান একটা পার্টি চলাকালীন। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে ওঁর মৃত্যু হয়।"

"আপনার বাবার হার্টের কোনো প্রবলেম ছিল?"

"তা ছিল, বাবার হার্ট বরাবরই খারাপ। বছর তিনেক আগে ওঁর ট্রিপল বাইপাস হয় আপনাদের মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে। কিন্তু তারপর থেকে উনি ভালোই ছিলেন। খুব সাবধানে নিয়মমতোই চলতেন। তবে নিয়ম মেনে চললেও প্রবলেম তো হতেই পারে।"

"তাহলে আপনার সন্দেহ জাগছে কেন স্যার?"

"তাই তো বলছি যে, চিন্তাটা মনে হয় অহেতুকই। তাছাড়া পার্টিতে আমার খালু ছিলেন, যিনি পুলিশের সাবেক ডিআইজি।"

"সাব-ডিআইজি টা কি?" প্রমথর প্রশ্ন।

"'সাব' নয় দাদা, 'সাবেক' — মানে প্রাক্তন" তারেক বিশদ করল।

"আর খালু?"একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"মেসোমশাই।"

"সরি স্যার, বলুন।"

"তিনি অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি। তাছাড়া বাবার কাছের মানুষ আরও অনেকে ছিলেন। তাঁদেরও কেউ কোনো রহস্য এর মধ্যে দেখেননি, নইলে কানাঘুষো শুনতাম। বাবার পানীয়টাও পুলিশ পরীক্ষা করেছিল — কিছু পায়নি।"

"দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান। পুলিশ কেন এসেছিল?"

"এর উত্তর আমি ঠিক দিতে পারব না। ডাক্তার আহমেদ আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনি বাবাকে নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে দেখতেন। তিনিও পার্টিতে ছিলেন। এবং বাবাকে পরীক্ষা করে ডেথ সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। আমার ধারণা খালু তাও হয়তো একটু নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন।"

"তা পানীয়তে যখন কিছু পাওয়া যায়নি, তাহলে এখন ও নিয়ে চিন্তা হচ্ছে কেন স্যার?"

"কে জানে, আমি হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না। কতগুলো জিনিস এখন মনে হচ্ছে ঠিক ছিল না।"

"যেমন?"

"যেমন, পার্টি চলার সময়ে দু'বার টেনিস কোর্টের বাতিগুলো নিভে যায়। শুধু দু'বারই সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করেছিল। আমাকে গিয়ে রিসেট করতে হয়েছিল। তখন এ নিয়ে আমি অতটা ভাবিনি। লাইনের ওভারলোড খুব বেশি না থাকলে সার্কিট ব্রেকার সব সময়ে ট্রিপ নাও করতে পারে।

"আমি একটু কনফিউজড স্যার। টেনিস কোর্টের সঙ্গে পার্টির সম্পর্কটা কী?"

"ও সরি, পার্টিটা টেনিস কোর্টেই হচ্ছিল। আসলে বাবার হার্ট বাইপাসের পরে টেনিস কোর্ট আর ব্যবহার হতো না। আমি নিজে কোনোদিনই টেনিসে উৎসাহী ছিলাম না। তাই ওটা এমনিই পড়ে থাকত। শুধু পার্টির সময়ে ব্যবহার করা হতো। শেষ পার্টিটা ঐ টেনিস কোর্টেই হয়েছিল।"

"এবার বুঝলাম। বলুন স্যার কী বলছিলেন?"

"কী বলছিলাম আমি?"

"বলছিলেন স্যার, সার্কিট ব্রেকার মাঝে মাঝে এমনি ট্রিপ করতে পারে — সে নিয়ে তখন কিছু ভাবেননি।"

"ও হ্যাঁ। কিন্তু এখন ভাবছি, দ্বিতীয়বারের পরে আর ব্রেকার ট্রিপ করেনি কেন! আমি তখন ভেবেছিলাম বাড়ির পেছনে সুইমিং পুল আর বাগানের স্পট লাইটগুলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম বলে বোধহয় লোড কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে পড়েছে যে ঐ আলোগুলো ছিল অন্য সার্কিটে — তাদের ব্রেকার আলাদা। ওগুলোর জ্বলা নেভার সঙ্গে টেনিস কোর্টের আলোর কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আই সি।"

“এছাড়া বাবা নাকি অরেঞ্জ জুসের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন, জুসটা তিতো। আমিও অরেঞ্জ জুসই খাচ্ছিলাম, আমার তিতো লাগেনি।”

“কিন্তু সেই জুসটা তো পরীক্ষা করা হয়েছিল?”

“তা হয়েছিল। সেই জন্যেই মনে হচ্ছে — সব কিছুই হয়তো অহেতুক চিন্তা।”

“চিন্তা যখন আপনার হচ্ছে, তখন একটা কাজ করা যাক স্যার। আপনি পার্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বা দেখেছেন সবকিছু ডিটেল্সে বলুন। কিচ্ছু বাদ দেবেন না।”

“কী রকম ডিটেল্স?”

“এই যেমন স্যার, পার্টি কখন শুরু হল, কারা এসেছিলেন, বসার কী বন্দোবস্ত ছিল, খাবার কোত্থেকে এসেছিল, কে কোথায় বসেছিলেন। কখন আলো নিভলো — যা যা আপনার মনে আছে — সব।”

“কী ভাবে শুরু করি,” বলে মামুদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলা আরম্ভ করলঃ “আমার বাবা মাঝে মধ্যেই বাড়িতে পার্টি দিতে ভালোবাসতেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে পার্টিটা বাইরে হতো, নইলে বাড়ির হলঘরে। আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। বাবা প্রচুর টাকা খরচ করে এটা বানিয়েছিলেন বছর দশেক আগে।

সামনে উঁচু পাঁচিলের দু'দিকে দুটো বড় গেট। সেখান দিয়ে গাড়ি ঢোকার জন্যে সার্কুলার ড্রাইভওয়ে। দু'সাইডে ছিল দুটো গ্যারেজ। গাড়ি বারান্দার সামনে ছিল নেট দিয়ে ঘেরা একটা বড় টেনিস কোর্ট। নেটগুলো পরে খুলে ফেলা হয়েছিল। টেনিস কোর্টকে ঘিরে সেখানে সারি করে নানান ধরনের ফুলের টব বসানো হয়েছিল। বাড়ির পেছনে ছিল বেশ বড় একটা পাথর বসানো চত্বর, যেটা গিয়েছিল একটা ছোটো বাঁধানো সুইমিং পুল পর্যন্ত। তারপর আবার বাগান।

“পার্টি শুরু হয়েছিল সন্ধ্যেবেলায়। প্রায় একশোর মতো নিমন্ত্রিত ছিলেন। বাবার বিজনেসের সূত্রে চেনাজানা, রাজনৈতিক জগতের লোক, সরকারি অফিসার,

লেখক, শিল্পী, চিত্রতারকা — মোটমাট বাংলাদেশের বেশ কিছু নামিদামি লোককে বাবা ডেকেছিলেন।

“পার্টি আরম্ভ হয়েছিল সাড়ে সাতটা নাগাদ। ড্রিঙ্কস আর অ্যাপেটাইজার দিয়ে শুরু। যাঁরা মদ খান তাঁদের জন্য ওয়াইন, বিয়ার, হুইস্কি, জিন, শেরি ইত্যাদি হরেক রকম পানীয় ছিল, অন্যদের জন্য অরেঞ্জ জুস, পাইনাপেল জুস, কোকাকোলা ইত্যাদি। বাবা অসুস্থ হবার পর থেকে পার্টি-টার্টির সব দায়িত্ব পড়েছিল বাবার বিজনেস পার্টনার জামাল চাচার উপরে। জামাল চাচা বাবার থেকে বয়সে অনেক ছোটো — বাবাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখতেন; বাবার অনেক ব্যক্তিগত কাজেও সাহায্য করতেন। গুলশনের এক কেটারারকে দিয়ে জামাল চাচা সব কিছু করাতেন। টেবিল চেয়ার আনা থেকে শুরু করে — সেগুলো সাজানো, মিনি-বার বসানো, অন্যান্য ডেকোরেশন, পানীয়, অ্যাপেটাইজার ও খাবারের বন্দোবস্ত — সব কিছুই তারা নিখুঁতভাবে করত। বাবা অসুস্থ হবার পর অন্তত গোটা ছয়েক পার্টি এই কেটারার আমাদের বাড়িতে করেছে। খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

“সব কিছুই চমৎকার চলছিল। ঠিক পৌনে আটটা যখন বাজে তখন হঠাৎ টেনিস কোর্টের আলো সব নিভে যায়।”

“মাপ করবেন স্যার, ঠিক পৌনে আটটা সেটা আপনি কী করে বুঝলেন?”

“ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। আমি একটা সস্তা ডিজিট্যাল হাতঘড়ি কিনেছিলাম তার কয়েকদিন আগে। কোনো কারণে সেটাতে রাত্রি পৌনে ৮-টার অ্যালার্ম দেওয়া ছিল।

আমি কিছুতেই অ্যালার্মটাকে ক্যানসেল করতে পারছিলাম না। প্রতিদিন রাত্রি পৌনে আটটায় ওটা বাজতো, একটা বোতাম টিপে আমি আওয়াজটা বন্ধ করতাম। আলোটা পৌনে আটটাতেই নিভেছিল, কারণ ঠিক সঙ্গেসঙ্গেই আমার ঘড়ির অ্যালার্মটা বেজে উঠেছিল।

ঢাকাতে মাঝেমধ্যে বাতি চলে যায়। আমাদের একটা জেনারেটর ছিল। বাতি নিভলে সেটা চালানো হতো। কিন্তু আমি দেখলাম রাস্তার আলো নেভেনি। আমাদের বাড়ির ভেতরের আলোগুলোও জ্বলছে। সুতরাং সার্কিট ব্রেকার কোনো কারণে ট্রিপ করেছে। বাবা চেয়ারে বসেছিলেন। আমি বাবার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বাবাও ব্যাপারটা বুঝেছেন। বললেন, বাড়ির ব্রেকারগুলো গিয়ে দেখতে।

আম্মা বাবার পাশে বসেছিলেন। আম্মা বললেন, 'আমাকেও ঘরে যেতে হবে, তোমার বাবার ওষুধ আনতে ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'কোথায় ওষুধটা আছে বল, আমি নিয়ে আসছি।'

আম্মা বললেন, 'না, তুমি খুঁজে পাবে না। আমাকে নিয়ে চলো।'

অন্ধকারে আম্মাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছতে আমার একটু সময়ই লেগে গেল।

বাড়িতে ঢুকে আম্মা লিফটে উঠলেন, আর আমি..."

"লিফট?"

"বাবার অসুখের পর ওটা লাগানো হয়।"

"আই সি, সেটা কোথায়?"

"দরজা খুলে ঢুকেই প্যাসেজের ডান পাশে।"

"বুঝলাম স্যার, ঠিক আছে বলুন।"

"সার্কিট ব্রেকারগুলো প্যাসেজের অন্য প্রান্তে সিঁড়ি ঘরের দেওয়ালে। আমি যখন সেদিকে এগোচ্ছি, তখন দেখলাম জামাল চাচা বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন।"

"বাথরুমটা কোথায় স্যার?"

"লিফটের পাশে উপরে যাবার আরেকটা সিঁড়ি, তার ঠিক পরেই।"

"তারপর কী হল স্যার?"

"ও হ্যাঁ, জামাল চাচা আমাকে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'বাইরের বাতিগুলো নিভে গেছে।'

"সে কী!"

"হয়তো ওভারলোড, ব্রেকার ট্রিপ করেছে।'

'আচ্ছা বিপদ তো! কিন্তু অন্ধকারে মাসুদ ভাইকে একা রেখে চলে এলে.... আম্মা আছে তো?"

আম্মা ওষুধ আনতে উপরে গেছে শুনে জামাল চাচা তাড়াতাড়ি ছুটলেন। বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জামাল চাচার একটা দুশ্চিন্তা আছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাবা যাতে বেহিসাবি কিছু না করেন সেই জন্য পার্টি-টার্টিতে উনি বাবাকে খুব নজরে রাখেন। আমার অবশ্য এটা বাড়াবাড়ি লাগে, কারণ বাবাকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই আমার মনে হয়।"

"একটা প্রশ্ন স্যার। আপনাদের বাড়ির সেটআপটা একটু বলুন। আপনি টেনিস কোর্ট থেকে বাড়িতে ঢুকলেন কীভাবে?"

"আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে তিন-চারটে সিঁড়ি নামলেই গাড়ি-বারান্দা।

সেখান থেকে টেনিস কোর্টে যাবার জন্যে বাঁধানো পথ আছে।"

"সেটা বুঝতে পারছি স্যার। বাড়ির ভেতরের সেটআপটা জানতে চাইছি।"

"ও হ্যাঁ। বারান্দা থেকে বাড়িতে ঢোকার তিনটে দরজা। সাইডের দুটো দরজা ছোটো। একটা দিয়ে অফিস ঘরে ঢোকা যায়। আরেকটা দিয়ে স্টোর রুমে। সামনের বড় দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা চওড়া প্যাসেজ — সেটা দিয়ে নীচের সব ঘরগুলোতে যাওয়া যায়। সেট আপটা মুখে কতটা বোঝাতে পারলাম জানি না। কিন্তু আমার কাছে অনেক ছবি আছে সেগুলো দেখালে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।"

"ঠিক আছে স্যার, সেটা পরেই না হয় দেখাবেন। এবার বলুন তারপর কী হল।"

"প্যাসেজের অন্য প্রান্তে পৌঁছে ব্রেকার বক্সটা খুলে দেখি, সত্যিই একটা ব্রেকার ট্রিপ করেছে। ওটা সেট করে দিতেই একটা হাততালির আওয়াজ ভেসে এল। অর্থাৎ টেনিস কোর্টে আবার বাতি ফিরে এসেছে।" এতটা বলে মামুদ একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "আচ্ছা, আমি কি বেশি ডিটেলে আপনাকে বলছি?"

"এতটুকু নয় স্যার। ঠিক এভাবে বলে যান — যা যা ঘটেছিল। তবে একটা প্রশ্ন স্যার, সার্কিট ব্রেকার বক্সের কাছাকাছি আর কাউকে দেখলেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের মালীর আয়েষা নামে একটি বোবা মেয়ে আছে। বছর দশ এগারো বয়স। সে ওখানে ঘুরঘুর করছিল। ও বুদ্ধিতেও খাটো,এদিক-ওদিক নিজের মনেই ঘুরে বেড়ায়। আমার একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটাই ব্রেকারে হাত দিয়েছে কিনা। আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু খেয়াল হল ও জবাব দিতে পারবে না। তবে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, এখানে হাত দিবি না বলে।"

"ও কথা বুঝতে পারে?"

"তা মোটামুটি পারে।"

"আর কাউকে দেখেননি স্যার?"

"না।"

"সিঁড়িঘরের সিঁড়িটাও নিশ্চয় দোতলায় যাবার?"

"হ্যাঁ, দোতলায় যাবার দুটো সিঁড়ি। এই সিঁড়িটা কাজের লোকেরাই সাধারণত ব্যবহার করে। এক-আধ সময়ে আমরাও করি, যখন বাড়ির পাশে ফলের বাগানে যাই।"

"তারপর বলুন স্যার।"

"আমি যখন বাইরে এলাম তখন দেখি জামাল চাচা বাবার স্বাস্থ্যকামনা করে একটা টোস্ট দিচ্ছেন। অনেকে ওখানে মদ খেলেও বাবা হার্ট বাইপাস হবার পর থেকে আর মদ খান না। পার্টি-টার্টিতে সাধারণতঃ কমলালেবুর রস বা আনারসের রস — এইরকম কিছু খান। জামাল চাচার পর খালুও টোস্ট দিলেন। তখনই বাবার মুখ দেখে মনে হল বাবার মুখটা একটু বিকৃত। বাবা বললেন, 'জামাল, বেশ তিতো এবারের জুসটা।'

জামালচাচা বললেন, 'সেকী, আমার তো সেরকম লাগছে না।' বলতে বলতেই আবার আলো নিভে গেল। আমি আবার ছুটলাম সার্কিট ব্রেকার অন করতে।

কে জানি পেছন থেকে বললেন, পেছনের বাগানের আলোগুলো বন্ধ করে দিতে, তাহলে লোডটা একটু কমবে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সার্কিট ব্রেকারটা অন করে, পেছনের আলোর মেইন সুইচটা অফ করে দিয়ে যখন ফিরলাম তখন বাবাকে ডাক্তার আহমেদ আর খালু ধরাধরি করে শুইয়ে দিচ্ছেন মাটিতে। আমি জামাল চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

জামাল চাচা একেবারে হতচকিত। বললেন, 'কী জানি, হঠাৎ খেঁচুনি দিয়ে পড়ে গেলেন।'

তাহলে কি স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক — কী হল বাবার। কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম বাবার দেহটা একেবারে নিথর।

পার্টিতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই দিশেহারা। ডাক্তার আহমেদ গলার পাশে আঙুল দিয়ে মাথা নাড়লেন। ইতিমধ্যে খালু পুলিশে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলেছে। আম্মা বাবাকে জড়িয়ে ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেছেন। কয়েকজন মহিলা আর মিসেস আহমেদ আম্মাকে ধরে আছেন।

আমার বুকে যে কী কষ্ট হচ্ছে বোঝাতে পারব না। আমি নীচু হয়ে বসে বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। আমার পাশে ডাক্তার আহমেদ। আমি তখন একটাই প্রশ্ন করলাম, 'সব শেষ?'

উনি মাথা নাড়লেন।

জামাল চাচা শুনলাম খালুকে বলছেন, 'মাসুদভাই জুসটা খেয়ে তিতো বলেছিলেন। আমার তো তিতো লাগল না। বুঝতে পারছি না।'

খালু সেটা শুনেই একটা রুমাল দিয়ে বাবার গেলাসটা ঢেকে রাখলেন।

খানিক বাদেই অ্যাম্বুলেন্স এল, সেইসঙ্গে পুলিশও। খালু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কীসব বললেন। তারপর তাঁরা বাবার পানীয়ভর্তি গ্লাসটা নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এত শোকাচ্ছন্ন যে, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। কিন্তু আমার আশেপাশে যা হচ্ছে সবই কানে আসছে। ডাক্তার আহমেদের সঙ্গে খালু আর জামাল চাচার কথাবার্তা শুনছিলাম, অন্যদিকে আম্মার বিলাপ। অনেকে এসে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। এর ফাঁকেই আমি শুনলাম ডাক্তার আহমেদ জামাল চাচাকে বোঝাচ্ছেন যে, তিতো লাগাটা কিছু অস্বাভাবিক নয় — ওটা স্ট্রোকের আগে সাময়িক বিভ্রান্তি। সিজার হওয়ার আগে অনেক রকম অদ্ভুত স্বাদ-গন্ধ মানুষ পায়।

জামাল চাচা বললেন, 'কিন্তু স্ট্রোক তো পরে হল।'

'আমার মনে হয় ম্যাসিভ স্ট্রোকের একটু আগেই একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। তখনই উনি জুসটা তিতো লাগার কথা বলেছিলেন। ওঁর হার্টটাও খুব বাজে অবস্থায় ছিল।'

কে জানি ডাক্তার আহমেদের কথা সমর্থন করলেন। 'হ্যাঁ, প্রথমে তো দু'-এক চুমুক জুস খেলেন, তখন তো তিতো বলেননি।'

'কে জানে, আমারও তো ওঁকে সেরকম অসুস্থ বলে মনে হয়নি।' জামাল চাচা যেন আত্মগত হয়েই বললেন।

আমারও সেটাই ধারণা ছিল। বাবা এত সংযত হয়ে থাকতেন যে, হঠাৎ এভাবে চলে যাবে, এটা কখনোই আমার মনে হয়নি।

পরের প্রশ্নটা হল বাবার পোস্ট মর্টেম হবে কিনা। আমার ভীষণ আপত্তি বাবার শরীর কাটাছেঁড়া হবার ব্যাপারে।

ডাক্তার আহমেদও সেটা করার খুব একটা কারণ দেখছেন না। যদি পানীয়তে গোলমেলে কিছু পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্য অন্যকথা। সুতরাং দ্রুত পানীয়টা পরীক্ষা করা হোক। সেখানে কিছু না পাওয়া গেলে ধর্মাচারে যা যা পালনীয় সেটা করা হবে। খালু আর জামাল চাচা তার দায়িত্ব নিলেন — আমি শুধু সঙ্গে থাকব।

পরদিন সকালেই জানা গেল পানীয়তে কিছু পাওয়া যায়নি। সুতরাং পোস্ট মর্টেম করার আর কোনো কারণ রইল না। মোটামুটি এই ব্যাপার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। তাহলে তো আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ দেখছি না। কেন আপনার মনে হচ্ছে যে মৃত্যুটাতে কোনো রহস্য আছে।"

"ঐ যে বললাম হঠাৎ দু'বার করে সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করা।"

প্রমথ বলল, "ব্রেকারটা তো ডিফেক্টিভ হতে পারে।"

"তা পারে অবশ্য। তবে আরেকটা কারণও রয়েছে আমার চিন্তার। আমার ধারণা বাবা কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।"

"কী রকম ঝামেলা স্যার?"

"তা বলতে পারব না। তবে ওঁকে একটু বিমর্ষ দেখতাম। দু'-একবার প্রশ্ন করেছি। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাইনি। আমার সঙ্গেও একটা দূরত্ব লক্ষ্য করেছি। এমনকী জামাল চাচার সঙ্গেও খিটমিট করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর জামালচাচার কাছে শুনেছি যে, ব্যাবসাতে অনেক গণ্ডগোল চলছিল, তাই ওঁর মনটা ভালো ছিল না। জামাল চাচা নিজেও বাবার মৃত্যুতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাবসার ওঁর নিজের অংশটা জামাল চাচা বিক্রি করে দেন। একটু অর্থকষ্টের মধ্যেও পড়েছিলেন।"

"কেন তার কারণটা কি জানেন স্যার?"

"ব্যাবসার দেনাটেনাই হবে নিশ্চয়ই। বাবার ব্যাবসাতে আমার নিজের কোনো আগ্রহ ছিল না। আমি বাবাকে বলেছিলাম যে, ওতে আমি নিজেকে জড়াব না। তাই জামাল চাচা যখন এসে আমাকে আমার অংশটা বুঝে নিতে বলেন, আমি কোনো উৎসাহ দেখাইনি। তাতে উনি একটু ব্যথিতই হয়েছিলেন।"

"আপনার বাবার অবর্তমানে আপনাদের তরফ থেকে কোম্পানিটা দেখভাল কে করছেন?"

"আম্মা আর আমি জামাল চাচাকে অনুরোধ করেছি সেটা করতে, আর তার জন্য পারিশ্রমিক নিতে।"

"আপনার বাবার কি কোনো উইল ছিল স্যার?"

"যদ্দুর জানি, না। বাবা মাঝে মাঝে উইলের প্রসঙ্গ তুলতেন, কিন্তু আমি ওঁকে বলে দিয়েছিলাম যে ওঁর সম্পত্তি আমি চাই না। আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব। আমার ওইরকম মনোভাব দেখেই হয়তো ও নিয়ে আর এগোননি।"

"কিন্তু স্যার, উইল তো শুধু আপনার জন্য নয়, আপনার আম্মার জন্যেও।"

"তা ঠিক।" মামুদ একটু লজ্জিত হল। "কিন্তু জামাল চাচা আমার মনোভাব জানেন। আমাদের বাড়ি নিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা ছিল — জামাল চাচাই কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন। আমি ওঁকে কাগজপত্র তৈরি করতে বলেছি যাতে আম্মার নামে বাড়িটা হয়।"

কথাটা শুনে আমার খটকা লাগল। ছেলের সঙ্গে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে চিন্তা-তাহলে কি আম্মা মামুদের সৎমা? একেনবাবুর ভুরুটাও একটু কুঁচকালো। কিন্তু একেনবাবু তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "দ্বিতীয়বার যখন সার্কিট ব্রেকার অন করতে গেলেন স্যার, তখন কি কাউকে দেখেছিলেন?"

"আমি যখন বাড়িতে ঢুকছিলাম, তখন মিস্টার খানকে দেখেছিলাম দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, কী আবার আলো নিভে গেল নাকি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, এই এক্ষুণি। কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে উনি ঝড়ের বেগে টেনিস কোর্টের দিকে চলে গেলেন।"

"একটু স্ট্রেঞ্জ স্যার, তাই না?"

"উনি একটু অদ্ভুত ধরণেরই লোক।"

"কী করেন উনি?"

"মিস্টার খানকে আমি ভালো চিনি না। শুনেছি ওঁর অনেক পলিটিক্যাল কানেকশন আছে।"

"আপনার বাবার বন্ধু?"

"না, বাবা ওঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ওঁকে ঘাঁটাতে চাইতেন না। শুনেছি বাবার ফ্যাক্টরিতে একবার প্রচণ্ড লেবার ট্রাবল হয়েছিল — যাঁর পেছনে উনি ছিলেন। পরে অবশ্য মিটমাট হয়। আমার ধারণা তার জন্য বাবাকে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল মিস্টার খানকে। সেইজন্য জামাল চাচা সব সময়ে বাবাকে বলতেন বাবার সব পার্টিতে উনি যেন নিমন্ত্রিত হন এবং ওঁকে যাতে বিশেষ সমাদর করা হয়। ভালো না করতে পারলেও খারাপ করতে উনি নাকি ওস্তাদ।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। মিস্টার খান ছাড়া, দ্বিতীয়বার আর কাউকে দেখেছিলেন?"

"রহিম মালী, আয়েষার যে বাবা – তাকে দেখেছিলাম সিঁড়িঘরে। আয়েষার খোঁজে এসেছিল।"

"আয়েষাকে দেখেছিলেন?"

"না।"

"সাইডের দরজাটা খোলা ছিল। সেখান দিয়েই হয়তো বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি রহিমকে একটু বকলামও সাইডের দরজাটা বন্ধ না করে রাখার জন্য। সাধারণত ওটা রাত্রে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। রহিম অবশ্য বলল যে, ও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে বাড়িতে গেছে। তবে আমাদের বাড়িতে এ ব্যাপারে কোনো ডিসিপ্লিন নেই— যে যার খুশি যেদিক দিয়ে ইচ্ছে যাতায়াত করে। বিশেষ করে রাঁধুনি, দু'জন কাজের লোক, মালী — তারা কখন কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে — তার কোনো ঠিক নেই।"

"আই সি। আপনাদের বাড়ির মালী বা কাজের লোকরা থাকে কোথায়?"

"ওদের থাকার জায়গাগুলো আমাদের কম্পাউণ্ডের পেছনে। বাবা অসুস্থ হবার পর থেকে একজন রাতের নার্স রাখা হয়েছিল। তিনি বাইরে থাকতেন।"

"তাঁদের কেউ কি পার্টিতে ছিলেন?"

"না, বাবা বা আম্মা বাড়ির কাজের লোকদের পার্টিতে থাকা পছন্দ করতেন না। পার্টি থাকলে হয় তারা পার্টি শুরু হবার আগে চলে যেত, অথবা পার্টি শেষ হলে আসত। পার্টি বলে রাতের নার্সকে সে রাতে ছুটি দেওয়া হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আপনার বাবার মৃত্যুটা যদি সত্যিই স্বাভাবিক না হয়, তাহলে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?"

"এইবার আমায় মুশকিলে ফেললেন। তেমন ভাবে কাউকেই সন্দেহ হয় না। তাছাড়া পুলিশও তো সন্দেহের কিছু দেখেনি। শুধু বাবার চিঠিটা আমাকে বিব্রত করেছে– এইটুকুই।"

"চিঠিটা স্যার, আপনার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, এই দেখুন।"

"পড়তে পারি স্যার?"

"নিশ্চয়, সেইজন্যই তো দিলাম।"

দু'লাইনের চিঠি। বয়ানটা মামুদ যা বলেছে হুবহু তাই — 'আশঙ্কা করছি, আমার হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। সম্পত্তিতে তোর অধিকার তুই ছাড়বি না।' আর সেই সঙ্গে আরেকটা

কাগজে একটা লম্বা লিস্ট।

সেই লিস্টে মামুদের নামে যেসব শেয়ার উনি করিয়েছিলেন, সেগুলোর ডিটেল্স। মামুদের সঙ্গে ওঁর পার্সোনাল জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাসবই আর শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো যে আনোয়ারের কাছে রয়েছে — সেই খবরটা।

চিঠিটা পড়ে একেনবাবু বললেন, "একটু পাজলিং স্যার, তাই না? হঠাৎ করে মৃত্যু ঠিকই, তবে কিনা খুন না হয়ে হার্ট অ্যাটাকেও তো হতে পারে।"

মামুদ মাথা নাড়ল। "কিন্তু বাবা এইভাবে মৃত্যুচিন্তা আগে কখনো করেননি। তাই আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে।"

"আই সি। ভালোকথা স্যার, পার্টির কোনো ছবি আছে?"

মামুদ কথাটার অর্থ বুঝল না। জিজ্ঞেস করল, "কার কথা বলছেন?"

"বলছি স্যার, আপনার বাবার সেই পার্টির সময়ে কেউ ছবি তুলছিলেন?"

"আমিই তুলেছিলাম কয়েকটা আমার ক্যামেরায়।"

"সেগুলো আছে আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ। অনেকগুলো ছবির সিডি আমি নিয়ে এসেছি। সেখানে পার্টির ছবি নিশ্চয়ই কয়েকটা আছে।"

"নিয়ে আসুন না স্যার, একটু দেখি।"

"আমাকে একটু খুঁজতে হবে।"

"আমরাও আছি স্যার, আপনিও আছেন। যখন খুঁজে পাবেন স্যার নিয়ে আসুন। আর বাড়ির ছবিগুলোও।"

"বেশ, কিন্তু আপনার কী মনে হয় — যা শুনলেন এখন পর্যন্ত।"

"ফ্র্যাঙ্কলি স্যার, আই হ্যাভ নো ক্লু।"

।। ৩ ।।

পরের দিন বিকেলে আবার মামুদ আর তারেক এল। মামুদ একটা সিডি নিয়ে এসেছে। আমার ল্যাপটপটা অফিসে ফেলে এসেছি। প্রমথ ওর নিজেরটা বার করে দিল, কিন্তু খুবই ব্যাজার মুখে। ওর সবসময়েই একটা ভীতি যে ওর কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকবে- বিশেষ করে দেশিভাইদের কোনো ডিস্কেট বা সিডিকে ও বিশ্বাস করে না। আমাদের সবার কম্পিউটারই নাকি ভাইরাসে জর্জরিত।

তবে আজকে ওর নিজের একটা আগ্রহ ছিল বলেই দিল, কিন্তু তার আগে ধমকের সুরে বলল, "ভাইরাস-ফাইরাস নেই তো মামুদ, তোমাদের দেশে তো ওগুলো কিলবিল করে।"

আমার কথাটা শুনে লজ্জা লাগল। বললাম, "কি বলছিস যা-তা!"

"কেন, কথাটা ভুল বললাম! কী তারেক, কথাটা আমি ভুল বলেছি?"

তারেক দেখি আজকে তর্ক জুড়ল না। বলল,"আরে না দাদা, ভুল বলবেন কেন। তবে

মামুদের সিডি-তে ওসব পাবেন না।”

“কেন, মামুদকে ভাইরাসরা ভয় পায়?”

আমি বললাম, “তুই চুপ করবি?”

মামুদ সিডি থেকে বেছে একটা ছবি বার করল।

পার্টির আয়োজন যখন শুরু হচ্ছে — সেই সময়কার ছবি। টেবিল আর চেয়ারগুলো পাতা হয়েছে টেনিস কোর্টে। প্রতিটা টেবিলে সবুজ রঙের চাদর পাতা আর তার ওপর বড় সাদা ফুলদানি। যেখানে সেখানে রঙ-বেরঙের একগুচ্ছ করে ফুল।

“আপনার বাবা কোন টেবিলে বসেছিলেন স্যার?”

মামুদ দেখাল টেবিলটা। গাড়ি-বারান্দার খুব কাছে, ওখান থেকে উঠে একটু গেলেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পথ। সেই পথ ধরে গাড়ি-বারান্দা পেরোলেই বাড়ির বারান্দা।

“দাঁড়ান এই ছবিটায় আরেকটু ভালো করে দেখতে পাবেন, বলে মামুদ আরেকটা ছবি বার করল।”

বেশ বড় গোল টেবিল। চারিদিকে গোটা দশেক চেয়ার সাজানো।

“আপনার বাবা ঠিক কোথায় বসেছিলেন স্যার?”

“আমি শিওর নই। হয় এই চেয়ার অথবা তার পাশেরটা,” একটা চেয়ার দেখিয়ে মামুদ বলল।

“আই সি। আচ্ছা স্যার, আর কে কে ওঁর সঙ্গে বসেছিলেন?”

মামুদ একটু চিন্তা করে বলল, “আম্মা, কবীর সাহেব, আজিজুল চাচা, মিস্টার খান। কয়েকটা চেয়ার ফাঁকা ছিল মাঝে মাঝে, জামাল চাচা ওখানে এসে বসছিলেন। আমিও দু’-একবার গিয়ে বসেছি। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও মাঝে মাঝে এসে বাবার সঙ্গে বসে গল্প করে যাচ্ছিলেন।”

“যাঁদের কথা বললেন, তাঁরা কী করেন?”

“আজিজুল চাচা বাবার থেকেও বয়সে বড়। স্কুলে বাবার মাস্টারমশাই ছিলেন। খুব ভালো লোক, তবে কানে খুব কম শোনেন। কবীর সাহেব এক সময়ে বাবাদের পার্টনার ছিলেন। কয়েক বছর আগে বাবা আর জামাল চাচার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে চলে যান। নিজে একটা বিজনেস শুরু করেন। সে বিজনেস অবশ্য ভালো চলেনি।

পার্টির কয়েক মাস আগে বাবার কাছে এসে ক্ষমা-টমা চেয়ে আবার বিজনেসে জয়েন করতে চান বলে জানান। জামাল চাচা ওঁকে ফেরত নিতে চাইছিলেন, কিন্তু বাবার আপত্তি ছিল। কবীর সাহেব আম্মাকে এসে ধরেছিলেন। আম্মাও বাবাকে অনেকবার বলেছিল ওঁকে পার্টনার করে নিতে। বাবা শেষমেষ বোধহয় রাজি হয়েছিলেন। তবে এই ফিরে আসা নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু কবীর সাহেব মাঝে মাঝেই বাবার কাছে এ নিয়ে তদবির করতে আসতেন।”

“মিস্টার খানকে কি বিশেষ সম্মান দেবার জন্য আপনার বাবার টেবিলে বসানো হয়েছিল স্যার?”

“তা নয়। সবাই ঘুরে ঘুরে নানান চেয়ারে বসছিলেন। আম্মা, কবীর সাহেব আর আজিজুল চাচা সব সময়েই বাবার টেবিলে ছিলেন। মিস্টার খান খানিক বাদে এসেছিলেন।”

একেনবাবুর কানে কথাটা কত গেল বুঝলাম না, কারণ উনি মন দিয়ে ছবিটা দেখছেন আর মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন, “ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং।”

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, “কী এত ইন্টারেস্টিং?”

"এই ফুল যে বাংলাদেশে হয় স্যার, আমার জানা ছিল না।"

কথাটা শুনে মামুদ খুশি হল। "আপনি বেশ ফুল চেনেন দেখছি।"

"তা স্যার একটু একটু চিনি। টবের এই আবছা গোলাপি ফুলগুলো তো মনে হচ্ছে হাইড্রেঞ্জিয়া — তাই না?"

"ঠিকই ধরেছেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কোনগুলোর কথা বলছেন?"

"এই যে স্যার, দেখুন।"

দেখলুম অসংখ্য পাপড়িতে ঠাসা বেশ বড় গোল গোল সাদা আর আবছা গোলাপি রঙের ফুল। টবের পর টবে ফুটে আছে। মধ্যে কয়েকটা অন্য ধরনের ফুল গাছ, তবে তাদের দুটো ছাড়া লম্বায় হাইড্রেঞ্জিয়ার থেকে ছোট।

বড় দুটো গাছের একটা আমি চিনতে পারলাম — ম্যাগনোলিয়া। আমাদের ক্যাম্পাসেই একটা আছে — আমার অফিস ঘর থেকে দেখা যায়। কিন্তু টবেও যে সেটা হয় জানা ছিল না। টব দুটো অবশ্য খুবই বড়।

"হাইড্রেঞ্জিয়ার কম টব নেই আপনাদের বাগানে। এই ছবিতেই তো অন্তত গোটা দশেক দেখছি।"

"হ্যাঁ, এটা বাবার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া নেশা। প্রতি বছর টবে তিরিশটা করে হাইড্রেঞ্জিয়া গাছ করতেন — এটা আমি জন্মকাল থেকে দেখে আসছি।"

"কোত্থেকে গাছগুলো পেয়েছিলেন?"

"এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে আমার বাবার আব্বার সময় থেকে। তিনি ছিলেন গাছপাগল লোক — জমিদার নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর খুব বন্ধু ছিলেন। আপনারা হয়তো ওঁর নাম জানেন না, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও নগেন্দ্রনারায়ণের একটা পরিচিতি আছে। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে উনি বীজ আর চারা সংগ্রহ করে একটা চমৎকার বাগান করেছিলেন। বাবার আব্বাকেও তার কিছু কিছু বীজ আর চারাগাছ দিয়েছিলেন। তবে বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু হাইড্রেঞ্জিয়া আর কয়েকটা গাছ এখনও আছে।"

"আপনার শখ নেই স্যার?"

মামুদ একটু চুপ করে বলল, "আমি তো এখন এখানে। আর আম্মার সেরকম শখ নেই।"

"টু ব্যাড স্যার, এরকম চমৎকার গাছগুলো দেখেও আনন্দ।"

"তা ঠিক, তবে নেশা না থাকলে এগুলো করা কঠিন। শীতের দেশের পেরিনিয়াল গাছগুলোকে আমাদের দেশে বাঁচিয়ে রাখা সোজা ব্যাপার নয়।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম স্যার, এই গাছগুলোকে গ্রীষ্মকালে কোথায় রাখেন?"

"বাবা অনেক পয়সা নষ্ট করেছেন এগুলোর পেছনে। গাছের জন্য বাড়ির পেছনে ঘর বানিয়েছেন। এককালে বরফ দিয়ে ঘর ঠাণ্ডা রাখা হত, পরে এয়ারকন্ডিশনার এল। নেশাগ্রস্ত না হলে এগুলো করা যায়?"

"অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং। কোনোদিন যদি ঢাকায় যাওয়া হয়, তাহলে একবার আপনাদের বাড়ি গিয়ে গাছগুলো দেখব।"

"অবশ্যই যাবেন।"

"বাড়ির আর কোনো ছবি এই সিডি-তে আছে স্যার?"

"একটা নয়, অনেক। দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এখানে আসার মাস দুয়েক আগে বেশ কিছু ছবি আমি তুলেছিলাম। তাতে বাড়ির ভিতরকার ছবি, সামনের রাস্তা, বাগান — কিছুই

বাদ দিইনি। দাঁড়ান, কোন ফোল্ডারে রয়েছে দেখি। ও হ্যাঁ, এইখানে।" বলে ফোল্ডারটা খুলে একটা ছবি ক্লিক করল।

"এই যে দেখুন, এটা হল গাড়িবারান্দা। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে সামনের যে বারান্দাটা চোখে পড়ে — সেটা হল এটা। বাঁ দিকের দরজাটা বাবার অফিস ঘরে যাবার। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে — একটা চওড়া প্যাসেজ পাবেন। তার একদিকে দোতালা যাবার সিঁড়ি, লিফট, বাথরুম, একটা বড় হলঘর। বৃষ্টি হলে সেখানেই পার্টিগুলো হয়। হলঘরের শেষে মহিলাদের জন্য একটা বাথরুম। এগুলোর কথাই গতকাল আপনাকে বলেছিলাম।"

"হ্যাঁ স্যার। হলঘরটার কথাটা বোধহয় বলেননি।"

"বোধহয় বলিনি। বাবার অফিসের কথাটা বোধহয় বলেছি। প্যাসেজের উলটোদিকে বাবার নিজের অফিস ছাড়াও অনেকগুলো ঘর। এক সময়ে ওগুলো কোম্পানির টেম্পোরারি অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হত। এখন ফাঁকা পড়ে আছে। ঘরগুলোর পাশে একটা ছোট কিচেনও ছিল — অফিসের লোকদের চা-কফি স্ন্যাকস বানানোর জন্যে। এখনও ওটা আছে, কিন্তু ব্যবহার করা হয় না। প্যাসেজটা একদিকে শেষ হয়েছে সিঁড়ির ঘরে, যেখানে সার্কিট ব্রেকার বক্সটা। সেটার কথা তো কালকেই বলেছি। প্যাসেজের উলটোদিকেও আরেকটা সিঁড়ি ঘর ছিল। কিন্তু সেই সিঁড়ির দরজাটা সব সময়ে বন্ধ থাকে। দোতালায় শুধু আমরা থাকি, আর আত্মীয়স্বজন কেউ এলে তাদের জন্য কয়েকটা ঘর রয়েছে।"

"এক কাজ করা যাক স্যার," একেনবাবু বললেন, "এই সিডিটা আমি রেখে দিই, পরে ধীরে সুস্থে আমি দেখব।"

মামুদ লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি বোধহয় খুব বিরক্ত করে দিয়েছি তাই না?"

"মোটেই না স্যার। তবে এগুলো অনেক সময়ে দিয়ে দেখতে হবে। আপনার যদি সিডিটা রেখে যেতে কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলেই......"

"কী আশ্চর্য, আপত্তি থাকবে কেন?"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

"আর কিছু জানতে চান? মামুদ ওঠার আগে জিজ্ঞেস করল।

"না স্যার, আপাতত এই যথেষ্ট। এই সিডিটা তো দিয়ে গেলেন। একটু ভালো করে দেখি। চোখে দেখার মতো বড় কিছু নেই স্যার।"

মামুদ আর তারেক চলে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি আর প্রমথ একেনবাবুকে চেপে ধরলাম, "কী বুঝলেন মশাই?"

"হয়তো নর্মাল ডেথই স্যার। তবে গোলমাল কিছু থাকলেও আশ্চর্য হব না।"

"বাহ, খুব প্রোফাউণ্ড স্টেটমেন্ট," প্রমথ খোঁচা দিয়ে বলল।

"তার মানে কেসটা আপনি নিচ্ছেন?" আমি বললাম।

"কীসের কেস স্যার?"

এরমধ্যে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি একেনবাবু কম্পিউটারের মনিটরে তন্ময় হয়ে মামুদের বাড়ি দেখছেন।

"কী দেখছেন এত বিভোর হয়ে?"

"ফুলগুলো স্যার। হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলগুলো দেখতে অপূর্ব!"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু শুধু সেগুলো দেখছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"কী যে বলেন স্যার, ফুলগুলোই দেখছি। দেখুন স্যার, কীরকম লাইট পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়ার মাঝখানে হঠাৎ চমৎকার একটা নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া।"

"দেখলাম, কিন্তু তাতে অবাক হবার কী কিছু আছে? হাইড্রেঞ্জিয়া কি নীল রঙের হয় না?"

"হয় স্যার, নিশ্চয়ই হয়।"

"তাহলে?"

"আসলে আগে এটাকে এখানে দেখিনি।"

"হয়তো টবটা অন্য জায়গায় ছিল।"

"এটা মন্দ বলেননি স্যার। এই ছবিটা প্রায় একমাস পরে তোলা।" ছবিতে দেওয়া তারিখ দেখে বললেন, একেনবাবু।

"তাছাড়া একই গাছে তো নানান রঙের ফুলও হতে পারে। মেণ্ডেলের সূত্র জানেন না — কী ছাই এত গাছের বই পড়েন!"

"তাও ঠিক। চা খাবেন?"

"আপনি বানাবেন?" আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

"বানাতে পারি স্যার, কিন্তু আপনি অনেক ভালো বানান।"

"তাহলে চা খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন কেন, বললেই পারতেন একটু চা করে খাওয়াবেন কিনা?"

"আপনিও স্যার প্রমথবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন," একেনবাবু অনুযোগের ভঙ্গিতে বললেন।

"ঠিক আছে বুঝেছি, আসুন," বলে আমি কিচেনে গেলাম। স্টোভে জল চাপিয়ে আমি খুঁজতে শুরু করলাম চা-পাতা কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। পাওয়া গেল না। আমি টি-ব্যাগ একেবারেই পছন্দ করি না। তার থেকে ইনস্ট্যান্ট কফি ভালো।

"কফি চলুক, কী বলেন?"

"বেশ তো স্যার, আমেরিকায় কফিই ভালো।"

জল গরম হতে কয়েক মিনিট, কফি সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল। কফি নিয়ে বাইরের ঘরে বসতেই একেনবাবু বললেন, "আচ্ছা স্যার, শরিয়াত আইন সম্পর্কে আপনি কী জানেন?"

"সেটা আবার কি, ইসলামিক আইন?"

"হ্যাঁ।"

"কিছুই জানি না। হঠাৎ এই প্রশ্নটা কেন?"

"না স্যার, মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইনটা বেশ গোলমেলে। আমি অনেকদিন আগে একটু দেখেছিলাম, তারপর মাথা এত ঝিমঝিম করতে শুরু করল যে, হাল ছেড়ে দিলাম।"

"শরিয়াত আইন নিয়ে হঠাৎ মাথা ব্যথা কেন?"

"একটা অঙ্ক মিলছে না স্যার, তাই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি।"

মানিকজোড়দের জিজ্ঞেস করুন, ওরা নিশ্চয়ই জানবে। তারেক আর মামুদকে প্রমথ

ইদানীং মানিকজোড় বলতে শুরু করেছে — ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স, আমিও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলি।

“কারা, তারেকসাহেব আর মামুদ সাহেবের কথা বলছেন?”

“রাইট।”

“নাও জানতে পারেন স্যার, হিসেবটা বেশ গোলমেলে।”

“ভালো কথা ওদের খবর কী, ক’দিন ধরে বেপাত্তা!”

“কী একটা কাজে বাইরে গেছেন স্যার। আমিও খোঁজ করছিলাম।”

“আপনি কেন খোঁজ করছিলেন, প্রবলেম সল্ভ হয়ে গেল নাকি?”

“কী যে বলেন স্যার। প্রবলেম আছে কিনা তাই জানা নেই!”

“তাহলে কী জানতে চাইছিলেন?”

“হঠাৎ মনে হল স্যার বাইরের গাছ পরিবেশ পাল্টালে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।

আবহাওয়ার কথা ছেড়ে দিন, মাটি আলাদা, অন্যরকম পোকামাকড়,যেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতাই গাছগুলোর নেই, এইসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে — সোজা ব্যাপার নয়।”

আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একেনবাবুর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না!

“উত্তরাধিকার আইনের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কী?”

“না, না। আমি স্যার এখন গাছগুলোর কথা ভাবছি।”

“গাছগুলো! আপনি কি মামুদের বাড়ির হাইড্রেঞ্জিয়া, লাইলাক — ওইসব গাছগুলোর কথা ভাবছেন?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“দেখুন আপনি এখন গাছ-বিশারদ হয়ে গেছেন, আপনাকে কিছু বলতে সাহস হয় না। তবে যদি পঞ্চাশ বছর ধরে গাছগুলো বাংলাদেশেই জন্মায় আর মরে থাকে, তাহলে প্রতিরোধশক্তিটা বোধহয় এতদিনে গড়ে উঠেছে।”

“এটা ভালো বলেছেন স্যার। সমস্যাটা প্রথম দিকেই হয়েছিল।”

“নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু তার উত্তর মামুদ দিতে পারবে না। ওর ঠাকুরদা হয়তো পারতেন।”

“গুড পয়েন্ট স্যার,” একেনবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন। তবে আমার বক্তব্য উনি কতটা কানে দিলেন সেটা অবশ্য বুঝলাম না।

কোথাও নিশ্চয় একটা টেলিপ্যাথি কাজ করছিল। দরজায় বেল শুনে দেখি মামুদ আর তারেক।

“তোমাদের কথা হচ্ছিল,” আমি বললাম। “একেনবাবু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তোমাদের এইসব বিদেশি গাছের জন্যে মাটি, সার, ইনসেক্টিসাইড — এইসব সম্পর্কে।”

আমার কথাটা ধরতে না পেরে মামুদ অবাক চোখে তাকাল।

ব্যাপারটা ওকে বিশদ করে বলতেই বলল, “মাটির ব্যাপারটা জানি, কিন্তু সার আর ইনসেক্টিসাইড সম্পর্কে কিছুই জানি না।”

“মাটির ব্যাপার মানে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“প্রতি বছর বাবা বাংলাদেশের উত্তরের কোনো একটা জায়গা থেকে মাটি আনাতেন। কেন, সে প্রশ্ন করবেন না। বাবা বিশ্বাস করতেন ঐ মাটি না পেলে গাছ বাঁচবে না। আমার ধারণা ওঁর আব্বা সেখান থেকে প্রথমে মাটি এনেছিলেন, তাই বাবা আর চান্স নেননি।”

"ইন্টারেস্টিং স্যার, টবের সব মাটিগুলোই কি ওই একই জায়গার মাটি?"
"যদ্দুর জানি, হ্যাঁ। এ ব্যাপারে বাবার ভীষণ নজর ছিল।"
"ঠিক কোত্থেকে আসত স্যার?"
"তা তো জানি না। আমার কোনো আগ্রহই ছিল না ও ব্যাপারে।"
"তুমি না জানলে, সে মাটি এখন আসবে কোত্থেকে?"
"ধরে নিচ্ছি জামাল চাচা জানেন, নইলে সমস্যা। তার ওপর আমি তো এখানে।"
"এই যে একেনবাবু," আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, "কী ধরণের মাটি দরকার? অনেক বইপত্র তো লাইব্রেরি থেকে এনেছেন, ছেলেটাকে একটু হেল্প করুন।"
"আপনি স্যার সত্যিই প্রমথবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন।" একেনবাবু অনুযোগ করলেন।
"সেটা কি কমপ্লিমেন্ট?"
"রান্নার ব্যাপারে নিশ্চয়ই স্যার। দুর্দান্ত কফি বানিয়েছেন আজ।"
"আরেক কাপ চান নাকি?"
"চাই স্যার, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে।"
"আমি ওদের জন্য বানাচ্ছি। সুতরাং আরেক কাপ বানাতে অসুবিধা নেই।"
"বাঁচালেন স্যার। আসলে আজ মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

আরেক প্রস্থ কফি বানানো হল। আমার চেয়ে তারেকই বেশি খাটল। কাপ-ডিশ ধুয়ে জল গরম করে; আমি শুধু আধ চামচ ইনস্ট্যান্ট কফির গুঁড়ো ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়লাম।

কফি খেতে খেতে একেনবাবু হঠাৎ মামুদকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, আপনার আম্মাকে দেখে খুব বেশি বয়স কিন্তু মনে হল না।"

"খুব বেশি বয়স ওঁর হয়নি।"

একেনবাবু বোধহয় দ্বিতীয় প্রশ্নটা করবে কিনা ভাবছিলেন। তার আগেই মামুদ বলল, "উনি আমার নিজের মা নন।"

"আপনার নিজের মা স্যার?"

"তিনি অনেকদিন হল মারা গেছেন।"

একেনবাবুর চোখে তখনও প্রশ্ন দেখে মামুদ বলল, "আমার এই আম্মাকে বাবা বিয়ে করেন বছর দশেক আগে।"

এটুকু বলার পর মামুদের স্বাভাবিক সংযম ভেঙ্গে গেল।

অনেকগুলো কথা প্রায় অনাবশ্যক ভাবেই বলে ফেলল। "আমার সঙ্গে আমার আম্মার সম্পর্ক ভালো নয়। উনি আমার থেকে বছর কয়েকের মাত্র বড়। খুব গরীব ঘর থেকে এসেছেন। কেন এবং কীভাবে বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় বা শাদি হল আমি বলতে পারব না। আমি বোর্ডিং স্কুলে পড়তাম, এসে দেখি উনি বাড়িতে এসে গেছেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কোনোদিনই আমার বনেনি — দরকার মতো কথাবার্তা হতো, এইটুকুই। বাইপাস হবার আগে যখন বাবার প্রাণ যায় যায় হয়েছিল, তখন প্রথম আম্মা আমার সঙ্গে অত্যন্ত সুব্যবহার শুরু করেন। আসলে ওঁর বোধহয় ভয় হয়েছিল বাবার মৃত্যুর পর আমি যদি ওঁকে না দেখি। সে ব্যাপারে ওঁর কোনো চিন্তা নেই এটা আমি ওঁকে নিশ্চিত করেছিলাম। তাছাড়া জামাল চাচাও তখন এগিয়ে এসে ওঁকে সাহস দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনো অর্থকষ্ট বাবা হতে দেবেন না বলে।"

"কেন স্যার, আপনাদের শরিয়াত আইনে বিধবা স্ত্রীরা কিছু পান না?"

"কিছু পান। ধারদেনা সব বাদ দিয়ে যা থাকে তার ১/৮ অংশ উনি পেতেন, আমি

বাকি অংশ। তবে বাবার ধারদেনা কী ছিল, সেটা আমরা জানতাম না। তবে আম্মা যেরকম আরামের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন, সেই ঠাঁট বজায় রাখা তাতে হয়তো সম্ভব হতো না।"

"আপনার বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কী রকম ছিল?"

এর উত্তর সোজাসুজি মামুদ দিল না। শুধু বলল, "আম্মা কমবয়েসি এবং সুন্দরী–বাবা পছন্দ করেই শাদি করেছিলেন।"

"আপনার আম্মার কোনো ছেলেপুলে হয়নি স্যার?"

"একটি হয়েছিল, শাদির কয়েক বছর পরে। কিন্তু বাচ্চাটা জন্মানোর সময়ে মারা যায়।"

"আপনি বলেছিলেন স্যার, আপনার বাবা মারা যাবার কিছুদিন আগে থেকে আপনার আম্মা আর বাবার মধ্যে একটা দূরত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। তার মানে স্যার তার আগে নিশ্চয়ই ওঁদের সম্পর্কটা ভালো ছিল। আমি কী ভুল বলছি স্যার?"

মামুদ এবার লজ্জিত হল। "আপনি ভুল বলেননি। আসলে আম্মাকে পছন্দ করি না বলেই ওঁর সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার অসুবিধা হয়।"

"আই সি। আচ্ছা স্যার, আপনাদের সমাজে দেনমোহরের একটা ব্যাপার আছে না?"

"বুঝেছি, আপনি কী জানতে চাচ্ছেন। আমার মনে হয় না, বাবা ওঁকে বিয়ে করার সময়ে বিরাট কোনো দেনমোহরে রাজি হয়েছিলেন বলে। আমি জোর করে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু বাবার অসুখের সময়ে আম্মা সেই নিয়ে আমাকে ওঁর চিন্তার কথাটা বলেছিলেন।"

"দেনমোহর ব্যাপারটা কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটা খানিকটা আপনাদের স্ত্রীধনের মতো। মুসলমান স্বামীরা দেনমোহরের টাকাটা মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে দিয়ে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ কেউ মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি থেকে দেনমোহরের টাকাটা প্রথমেই বিধবা স্ত্রীর কাছে চলে যায়, তারপর অন্যান্য ঋণ কর্জ ইত্যাদি মিটিয়ে যা বাকি থাকে সেটাই ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করা হয়।"

"আপনার বাবার কোনো লাইফ ইন্সিওরেন্স ছিল?"

"না।"

"আপনি শিওর?"

"হ্যাঁ, কারণ আনোয়ার চাচা বাবাকে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন লাইফ ইন্সিওরেন্সের কথা, বাবা আমল দেননি। বলতেন, ঘরবাড়ি সম্পত্তি উনি যা রেখে যাচ্ছেন, সেটাই ওঁর সবচেয়ে বড় ইন্সিওরেন্স।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং," একেনবাবু বললেন।

"কী ইন্টারেস্টিং?"

"ঐ যা স্যার, সাতটা বেজে গেছে, আজ আবার ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।" এই বলে তড়িঘড়ি জুতোটুতো পরে 'চললাম স্যার' বলে অদৃশ্য হলেন।

মামুদ আর তারেক হতভম্বভাবে বসে আছে দেখে আমি বললাম, "টিপিক্যাল একেনবাবু, মাথায় কী ঘুরছে, কারোর বোঝার সাধ্যি নেই।"

।। ৫ ।।

আজ সকাল থেকে একেনবাবু আবার বারান্দার গাছগুলো নিয়ে লেগেছেন। আমাকে অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন একটা বড় আয়না কিনে সেটা যদি বারান্দার রেলিং-এ একটা ব্র্যাকেট আটকে লাগানো যায়, তাহলে সূর্যের আলো তাতে রিফ্লেক্ট হয়ে ওঁর দুটো টবে অন্তত পড়বে। ওঁর দুটো টবই হচ্ছে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল। অন্যগুলোতে যেসব গাছ আছে তারা ছায়াতেও বাঁচবে, যদিও ফুল ভালো হবে না।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "আপনি কি ঠিকমত চেক করে দেখেছেন দুটো টব আলো পাবে কিনা।"

"হ্যাঁ স্যার, থিওরি অফ রিফ্লেকশন তো সহজ অঙ্ক। কঠিন ব্যাপার হল আপনাদের সম্মতি পাওয়া।"

"সেটা পাবেনও না, প্রমথ বলল, আয়না ভেঙ্গে নীচে কারোর মাথায় পড়লে খুনের দায়ে জেলে যাবে কে, আপনি না আমরা?"

"পড়ে যাবে কেন স্যার — নাটবোল্ট দিয়ে টাইট করে লাগানো থাকলে?"

"আপনি এক কাজ করুন, প্রমথ বলল, সব ক'টা টব মামুদকে দিয়ে দিন। ওদের কম্পিটেন্ট মালি আছে, বিদেশি গাছ বাঁচিয়ে অভ্যস্ত। ওরা আপনার গাছকে অনেক ভালো দেখভাল করবে।"

"আপনি না স্যার, সত্যি!" একেনবাবু ওঁর ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াটা এভাবে উড়িয়ে দেওয়া হল বলে একটু ক্ষুণ্ণই হলেন।

আমার খারাপ লাগল। বললাম, "দোকানে তো গ্রো-লাইট বিক্রি করে দেখেছি। তার একটা কিনে লাগান না।"

"ওগুলো খুব এফেক্টিভ নয় স্যার। কোথায় সূর্যের আলো আর কোথায় গ্রো ল্যাম্প।"

"আরে মশাই, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"

"তা ঠিক।"

"ঠিক আছে আপনি যখন এত ঘ্যানঘ্যান করছেন, ইলেকট্রিসিটি না হয় আমরা শেয়ার করব। তবে এও আপনাকে বলছি, এর থেকে অনেক সস্তা হতো যদি আপনি সপ্তাহ অন্তর কিছু ফুল বাড়িতে কিনে আনতেন। এই মাটি-জলে বারান্দা কাদা হতো না, ফুলও বাড়িতে থাকত এবং তার ভ্যারাইটিও অনেক বেশি হতো।"

"কিন্তু নিজের হাতে বাগান করার আনন্দটা তো থাকত না।"

"সেটা তো শুধু আপনি উপভোগ করছেন। আমরা সাফার করছি। এক্ষেত্রে সবাই উপভোগ করতাম। আপনার ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কাও।"

একেনবাবুর ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন। ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সিস্কা এসে হাজির। একেনবাবুর কীর্তিকলাপ দেখে সে মুগ্ধ।

"মাই গড, কী চমৎকার গাছগুলো হয়েছে ডিটেকটিভ। আমি শিওর ক'দিন বাদেই বড় বড় ফুল হবে।"

"আই অ্যাম ট্রাইং ম্যাডাম," একেনবাবু পরম উৎসাহিত হয়ে বললেন।

"আমাদের অনেক নেগেটিভ ফিডব্যাক সত্ত্বেও," প্রমথ গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল।

"তোমরা এত নেগেটিভ কেন, নেচারকে নার্চার করছেন মাই ডিটেকটিভ।" ফ্রান্সিস্কা

একেনবাবুকে খুব পছন্দ করে। স্নেহভরে 'মাই ডিটেকটিভ' বলে ডাকে। একেনবাবুও ফ্রান্সিস্কাকে দেখলে মনে বেশ বল পান। আমাদের বিরুদ্ধে যা যা কমপ্লেইন আছে সব নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। তার জন্য ফ্রান্সিস্কার মিষ্টি তিরস্কার আমাদের সহ্য করতে হয়। এটাই রুটিন।

"একটু সূর্যের আলো জোগাড় করার চেষ্টা করছিলাম ম্যাডাম, কিন্তু ওঁরা আপত্তি করছেন।"

"কেন?" ফ্রান্সিস্কা অনুযোগভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল।

"তুমিই জিজ্ঞেস করো না আইডিয়াটা কী?"

একেনবাবু বিশদ করে আয়নার কথাটা বললেন।

"দ্যাট্‌স ব্রিলিয়ান্ট," সস্নেহে ফ্রান্সিস্কা বলল। "সিটি কোডে না আটকালে নিশ্চয়ই করা যেত।"

এইখানেই আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সিস্কার তফাত। বারণ করবে, কিন্তু এমন ভাবে করবে যে মনে হয় বারণ করছে না।

"কিন্তু ডিটেকটিভ, আমাকে তোমার বলতে হবে তুমি কী ফার্টিলাইজার দিচ্ছ। ইমপেশেন্ট গাছগুলো সত্যি কী হেলদি লাগছে!"

"মিরাকল গ্রো-র একটা স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ড কিনেছি ম্যাডাম। দেখলাম ওটাই বলছে এই গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভালো।"

"তুমি এক কাজ কর ডিটেকটিভ, আমার অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় আলো আসে। তোমার যে গাছগুলোতে আলো দরকার সেগুলো ওখানে রাখতে পারো। আমার শুধু দু'-একটা ছোট পট আছে। তোমার কয়েকটা পট ওখানে রাখলে কোনো অসুবিধা নেই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। প্রমথবাবু তো এগুলোকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে বলছিলেন।"

"ঢাকা, ইউ মিন বাংলাদেশের ঢাকা?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

ফ্রান্সিস্কা প্রমথর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি দিয়ে বলল, "ইউ আর রিয়েলি সো নটি!"

প্রমথ কাঁধ ঝাঁকাল।

"আজকে মেনু কী স্যার?"

ফ্রান্সিস্কা এলেই এই টেকনিকটা একেনবাবু ব্যবহার করেন। ফ্রান্সিস্কা রান্না করতে ভালোবাসে। আরও ভালোবাসে খাওয়াতে। কিন্তু ফ্রান্সিস্কার রান্না করার ব্যাপারটা খুব ইলাবোরেট। আমাদের সমস্ত পট্‌স আর প্যান্‌স তাতে লেগে যায়। তারপর সেগুলো ধুতে ধুতে আমার আর প্রমথর প্রাণান্ত। একেনবাবু অবশ্য ওঁর সার্ভিস ভলেন্টিয়ার করেন। কিন্তু সেটা নেওয়া মানে আরও বাড়তি কাজ। এখানে ওখানে নোংরা লেগে থাকবে। সেগুলো স্পট করে করে আবার ধোওয়া। ফ্রান্সিস্কা রান্না করলে খাওয়াটাও যেমন তেমন ভাবে করা যাবে না। সুন্দর করে টেবিল সাজিয়ে, প্লেসম্যাটের উপর প্লেট, গ্লাস, ন্যাপকিন কাঁটাচামচ ইত্যাদি রেখে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্যালাড, ব্রেড ও ওয়াইন সহযোগে সেই রান্না খেতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রোডাকশন। সেটা শর্ট কাট করা মানে ওকে কষ্ট দেওয়া। কে চায় কোনো সুন্দরীর কষ্টের কারণ হতে। তাছাড়া মেয়েটা রান্না করে চমৎকার, আর তার চেয়েও চমৎকার ওর হৃদয়টা। প্রমথর ভাগ্যি যে এরকম একটা মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কাপ-ডিশ পট্‌স প্যান ধোয়ার রূঢ় বাস্তবটাও উপেক্ষা করা যায় না। তাই আবার খাবার ধুয়ো তুলেছেন দেখে প্রমথ ধমকে বলল, "আপনি এত হ্যাংলা

কেন মশাই, আবার পোঁ ধরলেন।"

ফ্রান্সিস্কা এখন বাংলা বেশ শিখে গেছে। সহজ সহজ কথাগুলো ধরতে পারে। তাছাড়া যে রেটে আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, তাতে বাংলা না জানলেও মূল বক্তব্য মোটামুটি ভালোই বোঝে। কিন্তু 'হ্যাংলা' আর 'পোঁ' শব্দটা ও ধরতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "'হ্যাংলা' মানে কি?"

"ওটা ট্র্যানস্লেট করা যায় না," আমি বললাম।

"আর 'পোঁ?'

"ওটাও কঠিন," প্রমথ বলল।

একেনবাবু বললেন, "আসলে ম্যাডাম, আমি খাবারের কথা তুলেছিলাম বলে, ওঁরা রাগ করছেন, আপনাকে আবার রান্না করতে হবে বলে।"

"ওমা, এতে রাগের কী আছে! আমার তো ভালো লাগে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতে।"

"আর আপনার রান্নাও একেবারে এক্সেলেন্ট ম্যাডাম।"

"আচ্ছা নেমকহারাম তো আপনি মশাই, প্রতিদিন তো বেশ ভালোই সাঁটান আমার রান্না।"

"কী যে বলেন স্যার, এক জনকে ভালো বলা মানে কি আরেক জনকে খারাপ বলা! আপনার রান্নার প্রশংসা আমি সব জায়গাতেই করি।"

"ইউ আর সো কম্পিটিটিভ" বলে প্রমথর মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে ফ্রান্সিস্কা রান্নাঘরের দিকে গেল। একেনবাবুও গেলেন ওর পেছন পেছন।

"মাঝে মাঝে একেনবাবুকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে", আমার কানে কানে সেটা জানিয়ে প্রমথও গেল কিচেনটাকে একেনবাবু আর ফ্রান্সিস্কার যুগ্ম আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে।

তবে ভগবান আছেন। একেনবাবুর একটা ফোন — ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে।

"মাই গড — আপনি শিওর স্যার — গ্রেট নিউজ। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।"

ফোনটা নামাতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

"মামুদ সাহেবের বাবার ব্যাপারটা নিয়ে।"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এর মধ্যে জড়ালেন কী করে?"

"উনি বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলকে খুব ভালো চেনেন স্যার। আমি কতগুলো জিনিস জানতে চেয়েছিলাম। উনি বাংলাদেশ কনসালের থ্রু-তে ঢাকা পুলিশকে দিয়ে কাজটা করিয়েছিলেন।"

"কী কাজ?" প্রমথর প্রশ্ন। কখন প্রমথ আর ফ্রান্সিস্কা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দেখিনি।

"বলছি স্যার।"

ফ্রান্সিস্কা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ডিটেকটিভ, আমাকে তো কিছুই বলনি?"

"বলছি ম্যাডাম, বলছি। কিন্তু তার আগে, মামুদকে একটু খবর দেওয়া দরকার।"

"আমি ফোন করছি," প্রমথ বলল, "আর সেই সঙ্গে পিৎজারও অর্ডার করি। ফ্রান্সিস্কা তাহলে রান্না করতে গিয়ে গল্পটা মিস করবে না।"

এক ঢিলে চমৎকার দুটো পাখি মারল প্রমথ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নীচ থেকে তারেক এল। মামুদকে কোম্পানির কাজে দু'দিনের জন্য শিকাগো যেতে হয়েছে। প্রমথ বলল, মামুদের জন্য অপেক্ষা না করে যা জানলেন আমাদের বলুন। ওকে না হয় আবার বলবেন।

এর মধ্যেই প্রমথ সংক্ষেপে ফ্রান্সিস্কাকে মামুদের বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা বলে দিয়েছে। সেও একেনবাবুকে বলল, "ডিটেকটিভ, সব কিছু না শুনে তোমাকে ছাড়ব না।"

।। ৬।।

আমরা সবাই ভালোভাবে বসার পর একেনবাবু তারেককে বললেন, 'একটু আগে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ফোন করেছিলেন।"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট?"

"উনি নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্রিমিনাল ডিভিশনের হেড। আমাকে খুব স্নেহ করেন স্যার।"

"না, না, ওঁর কথা আমি বাপিদাদার কাছে শুনেছি, কিন্তু প্রসঙ্গটা বুঝতে পারছি না," তারেক বলল।

"মামুদ সাহেবের কেসের ব্যাপারটা নিয়ে স্যার ওঁর কাছে একটু সাহায্য চেয়েছিলাম। তা উনি ফোনে যে খবরটা দিলেন সেটা শুনে আমি মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে মামুদ সাহেবের বাবার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।"

কথাটা শুনে শুধু তারেক নয় আমি আর প্রমথও অবাক! ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ওঁকে এমন কী খবর দিতে পারেন যার থেকে এতদূরে বসে উনি এরকম একটা জোরদার কনক্লুশান করে ফেললেন!

"কী সর্বনাশ!" তারেক বলল, "তার মানে মামুদ যা আশঙ্কা করছিল সেটাই তো ঠিক। কিন্তু আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন?"

"বলছি স্যার, সেইজন্যেই আপনাদের ডেকেছিলাম, কিন্তু মামুদ সাহেবকে তো পাওয়া গেল না।"

"ওর শিকাগো হোটেলের নম্বরটা আমার কাছে আছে।"

"কিন্তু ফোনে এটা না জানানোই ভালো স্যার।"

"তা ঠিক। তবে ফিরে এসে খবরটা যখন শুনবে — একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আপনি এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ?"

"মোটামুটি নিঃসন্দেহ স্যার, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে গেলে ঢাকা পুলিশের আরও অনেক কিছু করণীয় আছে।"

"খুনি কে?" তারেক প্রশ্ন করল।

"স্যার, মামুদ সাহেব জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুটা অস্বাভাবিক কিনা — সেটার উত্তর পাওয়াটা স্যার কঠিন হলেও দারুণ শক্ত নয়। কিন্তু খুনি কে সেটা এখানে বসে জোর দিয়ে বলাটা স্যার ফ্র্যাঙ্কলি অসম্ভব।"

"একটু কম জোর দিয়েই না হয় বলুন," প্রমথ বলল।

"স্যার আমার একটা থিওরি আছে — সেটাই ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে বলেছি ঢাকার পুলিশকে জানাতে।"

"সেই থিওরিটা কী বলবেন?" তারেক জিজ্ঞেস করল।

"থিওরিটা পিওর থিওরি স্যা — ঠিক নাও হতে পারে।"

"আঃ, এত ভনিতা না করে শুরু করুন না," প্রমথ এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

"করছি স্যার, করছি। কিন্তু যা আমি বলছি, সেটা একটু সাফাই না গেয়ে বলাটা অনুচিত হবে।"

"সাফাই তো হল, এবার বলুন।"

একেনবাবু শুরু করলেন, "মামুদ সাহেবের বাবাকে খুন করা হয়েছিল ওঁর অরেঞ্জ জুসে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে।"

"আপনি একেবারে বিষের নাম জেনে বসে আছেন!" প্রমথ অবিশ্বাস ভরে কথাটা বলল।

"সেই তথ্যটাই আমাকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দিলেন স্যার।"

"কি যা-তা বলছেন মশাই। জুসটা তো পুলিশ পরীক্ষা করেছিল, কিছুই পায়নি!"

"সেটা জানি স্যার।"

"তাহলে?"

"আঃ," আমি প্রমথকে ধমক দিলাম, "তুই চুপ করবি? একেনবাবুকে বলতে দে।"

"এত সাসপেন্স না দিয়ে সোজাসুজি বললেই তো চুকে যায়।"

"বলছি স্যার সোজাসুজিই বলছি। কিন্তু জিনিসটাতে এত প্যাঁচ রয়েছে যে, গুছিয়ে বলাটা কঠিন।"

"ডিটেকটিভ, তুমি আস্তে আস্তে বল আমরা শুনেছি।" ফ্রান্সিকা এবার প্রমথকে চুপ করানোর ভার নিল।

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আমি আলো নেভার ব্যাপারটা দিয়েই শুরু করি। আমার বিশ্বাস, আলোটা ওভারলোড বা ডিফেক্টিভ ব্রেকারের জন্য নেভেনি। ওটা সার্কিট ব্রেকার অফ করেই নেভানো হয়েছিল যাতে খুনি মামুদ সাহেবের অরেঞ্জ জুসের গেলাসটা সরিয়ে সেই জায়গায় পটাশিয়াম সায়ানাইড মেশানো বিষাক্ত একটা গ্লাস রাখার সুযোগ পান। তারপরে আলো জ্বলে উঠল। জামাল সাহেব আর মামুদ সাহেবের মেসোমশাই যখন টোস্ট দিলেন তখন সেই বিষাক্ত জুসটা মাসুদ সাহেব খেলেন।

এখন খুনির চিন্তা ছিল যে জুস খেয়ে মৃত্যু হলে সেই জুসটা সম্ভবত পরীক্ষা করা হবে। সুতরাং এই বিষাক্ত জুসটাকে সরাতে হবে। সেইজন্য আবার বাতি নেভাতে হল। দ্বিতীয়বার আলো নেভামাত্র খুনি মাসুদ সাহেবের বিষাক্ত গ্লাসটা পালটে ওঁর পুরোনো গ্লাসটা সামনে রেখে দিলেন।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পারল না। "আপনি একটা অবাস্তব কথা বলছেন! খুনি অরেঞ্জ জুসে বিষ মিশিয়েছিল, সেটাও যদিও বা সম্ভব হয়। কিন্তু দৌড়ে গিয়ে আবার আলো নিভিয়ে এসে সেই গ্লাসটা সরিয়ে অন্য একটা গ্লাস মাসুদ সাহেবের সামনে রাখাটা ইম্পসিবল।"

"আমারও তাই বিশ্বাস স্যার।"

"তাহলে?"

"আপনি যে যুক্তি দিলেন, সেটা ভেবেই আমারও তাই মনে হয়েছে স্যার, খুনির একজন সাহায্যকারী ছিল।"

"আপনি বলতে চান যে সাহায্যকারী এমনভাবে দু'বার বাতি নিভিয়েছিল, যাতে খুনি তার কাজগুলো করতে পারে আশেপাশের লোকের সন্দেহ না জাগিয়ে — তাই তো?" এবার তারেক প্রশ্ন করল।

"দু'বারই যে সাহায্যকারী বাতি নিভিয়েছিল তা আমি বলছি না স্যার। কিন্তু টাইমিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। শুধু তাই নয় স্যার, যাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাঁরা মামুদ সাহেবদের বাড়িটা ভালো করে জানেন - তাঁদের বাড়ির ভেতরে দেখলে, বাড়ির কারো কোনো সন্দেহ হবে না।"

"তার মানে বাড়ির কাজের লোক এর মধ্যে জড়িত?" এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তা তো বলিনি স্যার। তবে সেটা নিশ্চয় একটা পসিবিলিটি, কিন্তু প্রব্যাবিলিটি নয়।"

"আচ্ছা, তোমরা ওঁকে বলতে দেবে?" ফ্রান্সিস্কা আমাদের সবাইকে একটু বকুনি দিল। তারপর একেনবাবুকে বলল, "এবার বল, ডিটেকটিভ।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, আমার নিজের বিশ্বাস খুনি প্রথমবার নিজেই একটা অরেঞ্জ জুসের গ্লাস নিয়ে সার্কিট ব্রেকারটা অফ করেছিলেন। সেই সময়েই তিনি সবার আড়ালে সেই জুসে বিষটা মেশান। মামুদ সাহেব যখন গেলেন কী হয়েছে দেখতে, তাতে যে সময়টুকু লাগল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে অন্ধকারে মাসুদ সাহেবের গেলাসটা সরিয়ে বিষের গেলাসটা সামনে রেখে দেন। তারপর মাসুদ সাহেব যখন সেটা খান, তার অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো আবার নিভে যায়। এবার আলোটা নিভে যায় ওঁর এক সাহায্যকারী ব্রেকারটি অফ করেন বলে। মামুদ সাহেব আবার ছোটেন সার্কিট ব্রেকার বক্সের দিকে। কিন্তু যাবার পথে মিস্টার খান আর সিঁড়ির ঘরে মালী রহিমকে ছাড়া কাউকে দেখতে পান না। আর আগেই বলেছি সেই সময়ে খুনি মাসুদ সাহেবের গেলাসটা আবার পালটে দেন। মাসুদ সাহেবের বিষক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি যখন ঢলে পড়ে যাচ্ছেন, তখন খুনি চট করে সেই বিষাক্ত জুসটা পাশে একটা ফুলের টবে ফেলে দেন, যাতে কোনোমতেই সেটা ভুলে আর কেউ না খান, বা পুলিশের হাতে পরীক্ষার জন্য না যায়।"

"কিন্তু এটাই যে ঘটেছিল, সেটা আপনি বুঝলেন কী করে?" প্রমথ একটু বিরক্ত হয়েই বলল।

"কারণ স্যার খুনি অরেঞ্জ জুসটা হাইড্রেঞ্জিয়ার টবে ফেলেছিলেন।"

"সো হোয়াট?"

"ফলে হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের রঙটা পাল্টে গেল।"

"কী বলছেন মশাই যা-তা!" এবার প্রমথ বলল।

"ঠিক কথাই বলছি স্যার। আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু বাপিবাবু দেখেছেন, সমস্ত সাদা আর আবছা পিঙ্ক রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া ফুলের মধ্যে শুধু একটার রঙ ছিল নীল। আর সেই নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়া স্যার পার্টির দিনে তোলা ছবিতে ছিল না। আমি খুব ভালো করে পার্টির সময়ের ছবিগুলো দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন। ছিল কি?"

ফ্র্যাঙ্কলি, আমরা কেউই অত মন দিয়ে ফুল দেখিনি। চুপ করে রইলাম।

একেনবাবু বলে চললেন, "মামুদ সাহেব বলেছিলেন মাটিগুলো সব আসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে, যেখানে মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর আছে।

আমি জানি স্যার, আমার এই গাছপালার খ্যাপামি নিয়ে আপনারা হাসাহাসি করেন। কিন্তু জানেন স্যার, হাইড্রেঞ্জিয়া গাছে যদি অ্যালুমিনিয়াম কম্পাউণ্ড ঢোকে, তাহলে তার

ফুলের রঙ হয়ে যায় নীল। কিন্তু সেটা তখনই ঢুকতে পারে যখন মাটি অম্লযুক্ত বা অ্যাসিডিক হয়। যেই মুহূর্তে অরেঞ্জ জুস টবের মধ্যে পড়ল, সেই টবের মাটি হয়ে গেল অ্যাসিডিক, আর হাইড্রেঞ্জিয়াও তার রঙ পালটাল — হয়ে গেল নীল।

সমস্ত পিঙ্ক হাইড্রেঞ্জিয়ার মধ্যে হঠাৎ স্যার ঐ নীল রঙ দেখে আমি ভাবছিলাম, কেন একটা টবের মাটি অ্যাসিডিক। টবগুলো সব টেনিস কোর্টের পাশে, সুতরাং সেখানে জুসটা ফেলার সম্ভাবনা প্রচুর।"

"কিন্তু অন্য কেউও তো তাঁদের জুস কোনো কারণে টবে ফেলতে পারে?" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।

"তা পারে স্যার, সেইটে জানতেই আমি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সাহায্য নিয়েছিলাম। তিনি বাংলাদেশের কনসুলেট জেনারেলের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের পুলিশকে দিয়ে নীল রঙের হাইড্রেঞ্জিয়ার টবটা পরীক্ষা করান। সেইখানে পটাশিয়াম সায়ানাইডের ট্রেস পাওয়া গেছে। সেটাই হল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের খবর।"

"মাই গড!" আমি বললাম।

"কিন্তু কে এই কাজটা করলেন?" তারেক প্রশ্ন করল।

"এবার তো আমার থিওরির কথা এসে গেল স্যার।"

"পসিবিলিটি তো তিনজন," আমি বললাম, মামুদের জামাল চাচা, মিস্টার খান আর কবীর–আজিজুল সাহেবকে আমি বাদ দিচ্ছি।"

"চমৎকার স্যার। আর সহকারী কে?"

"গোয়েন্দা তো আপনি মশাই!" প্রমথ বলল।

"আমার ধারণা স্যার খুনি হলেন, মামুদ সাহেবের জামাল চাচা। তিনিই প্রথমে গিয়ে সার্কিট ব্রেকার অফ করেছিলেন। মামুদ সাহেব যখন বাড়িতে ঢোকেন, তখন বাথরুমের সামনে জামালচাচার সঙ্গে ওঁর দেখাও হয়। মামুদ সাহেব সার্কিট ব্রেকার যেদিকে আছে সেদিকে হাঁটা দিতেই জামাল চাচা বিষাক্ত জুসটা হাতে নিয়ে পার্টির দিকে চলে আসেন। সেখানে এসে গ্লাসটা মাসুদ সাহেবের সামনে রেখে আলো জ্বলে উঠতেই মাসুদ সাহেবকে একটা টোস্ট দেন। টাইমিংটা এমন ভাবে করা হয় যে,

টোস্টের পরপরই আবার আলো নিভে যাবে। জামাল চাচা সাহায্যকারীর দৌলতে স্যার, সেটা যায়ও। সেই সুযোগে জামাল চাচা বিষাক্ত গেলাসটা সরিয়ে মাসুদ সাহেবের প্রথম গেলাসটা ওঁর সামনে রেখে দেন।"

"সাহায্যকারীটি কে?" তারেক জিজ্ঞেস করল।

"মিস্টার খান," প্রমথ বলল।

"না, স্যার। দ্বিতীয়বার আলো নেভার আগে মিস্টার খান বাড়িতে ঢুকেছিলেন ঠিকই এবং খুব দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তিনি যত দ্রুতই হাঁটুন, এমনকি তিনি দৌড়লেও সার্কিট ব্রেকার অফ করে বাড়ির বাইরে এসে মামুদ সাহেবের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না স্যার। তিনি সার্কিট ব্রেকারটা অফ করেননি।

যিনি সেটা করেছিলেন, তিনি সাইডের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পার্টিতে চলে আসেন।"

"তা তো বুঝলাম কিন্তু লোকটি কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না স্যার, জামাল চাচা মামুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওঁর আম্মা কোথায়? সেটা কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন নয়, জামাল চাচা শিওর হতে চাচ্ছিলেন যে, ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট ঠিকমতো জায়গায় রয়েছেন কিনা। যেই মুহূর্তে তিনি জানলেন যে, আম্মা বাড়িতে এসে গেছেন উনি দ্রুত পার্টির দিকে গেলেন। আসলে পুরো

ব্যাপারটাই ভালোভাবে প্ল্যান করা ছিল।"

প্রমথ বলল, "অফ অল দ্য পিপ্ল আম্মা? হোয়াই?"

আমিও বললাম, "যাই বলুন আপনি, আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। কোথাও একটা ফাঁক আছে। খুনের মোটিভটা কি? সুখ বা অর্থ কোনোটাই নয়। মামুদের কাছেই শুনেছি যে ওর বাবার মৃত্যু জামাল চাচাকে বিধ্বস্ত করেছে — আর্থিক ও মানসিক দু'ভাবেই। আম্মারও আর্থিক দিক থেকে বিরাট লাভের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।"

"ইউ আর রাইট স্যার। এটা আমাকেও বদার করেছে স্যার, বদারড্ মি এ লট। তারপর আমার মনে হল, এর একটা ব্যাখ্যা আছে স্যার। সেইটেই এখন ঢাকার পুলিশকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে — ঠিক কিনা।"

"ব্যাখ্যাটা বলুন।"

"প্রথমত স্যার হত্যাকাণ্ডটা অর্থের জন্য নয় স্যার, আমার ধারণা প্রেমের জন্য।"

"হোয়াট?"

"হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় মামুদ সাহেবের আম্মা আর জামাল চাচার মধ্যে প্রেম ছিল। মামুদসাহেবের আম্মা মাসুদ সাহেবের কাছে তালাক চেয়েছিলেন। কিন্তু মাসুদ সাহেব দিতে রাজি হননি। ইসলামিক আইনে স্যার স্বামীর তালাক দেবার অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীর অত সহজে স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স পাওয়াটা সহজ নয়। মাসুদ সাহেব নিশ্চয়ই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন যে, জামালসাহেবের সঙ্গে স্ত্রীর প্রেম আছে, ফলে মানসিকভাবে কষ্টও পাচ্ছিলেন। জামালসাহেব আর আম্মা যখন বুঝলেন কোনোমতেই মাসুদ সাহেব আম্মাকে ছাড়তে রাজি হবেন না, তখন এই মার্ডারের প্ল্যানটা করেন। কাম একটা আদিম রিপু স্যার, অনেক রকম অদ্ভুত কাজ এর তাড়নায় মানুষ করে ফেলতে পারে।"

"এটা নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা–যদিও ধোপে নাও টিকতে পারে," আমি বললাম, "কিন্তু এর জন্য জামালচাচার মানসিক অশান্তি বা অর্থকষ্টের ব্যাখ্যাটা তো পেলাম না।"

"ইয়েস স্যার। এইবার বলি, কেন সেটা হয়েছে বলে আমার সন্দেহ। এইটে যদি পারফেক্ট ক্রাইম হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু একজন যিনি মাসুদ সাহেবের টেবিলে বসেছিলেন, তিনি জামাল চাচার এই গেলাস সরানোটা অন্ধকারেও দেখে ফেলেন এবং যেই মুহূর্তে মাসুদ সাহেব মুখ বিকৃত করেছেন, সেই মুহূর্তে তিনি অনুমান করতে পারেন–একটু পরে কী ঘটবে। অর্থাৎ আবার আলো নিভবে। তখন তিনি দ্রুত ছোটেন বাড়ির দিকে। হলঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান আম্মা ঢুকছেন সার্কিট ব্রেকার যেখানে আছে সেখানে। তিনি দ্রুত ফিরে আসেন পার্টিতে।

তখন আলো আবার নিভে গেছে। কিন্তু এই ভদ্রলোক অতি ধুরন্ধর। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন দ্বিতীয় আলো নেভার সময়ে কী ঘটেছে। এরপর ওঁর ব্ল্যাকমেল করা শুরু হয় জামাল চাচাকে। এঁর অর্থের প্রয়োজন মেটাতে জামাল চাচা তাঁর সর্বস্ব খোয়ান। এবার আর ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের সমস্যা নয়, এটা হল মার্ডার চার্জ। সুতরাং মিস্টার খান এর জন্য কয়েক কোটি টাকা দাবি অবশ্যই করতে পারেন।"

আমরা সবাই চুপ।

একেনবাবু বললেন, "ঢাকা পুলিশ এখন জামাল চাচার সমস্ত কাগজপত্র সিল করে দেখছে কোথায় ওঁর টাকা গেছে, আর খান সাহেবের টাকাকড়ির হিসেব–নিকেশ করছে। দুটো মিলে গেলেই আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা হবে।"

ফ্রান্সিস্কা হাততালি দিয়ে বলল, "ডিটেকটিভ ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট।"

(গল্পের নামকরণ দেখে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, একেনবাবুর থিওরিতে কোনো ভুল ছিল না। শেষ খবর: ঢাকার পুলিশ আম্মা, জামাল চাচা আর মিস্টার খান তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে।)

একেনবাবু ও কেয়াদিদি

।। ১ ।।

প্রায় দু'–সপ্তাহ হল আমি অ্যাপার্টমেন্টে একা। প্রমথ গেস্ট ফ্যাকাল্টি হয়ে পাঁচ মাসের জন্যে বস্টন ইউনিভার্সিটিতে গেছে। একেনবাবু সাধারণত বাইরে যান না। তিনিও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে ওয়াশিংটন ডিসি– তে গেছেন। প্রমথর সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা হয়। একেনবাবু অদৃশ্য হলে যোগাযোগ করা কঠিন। গত বছর প্রায় জোর করে একেনবাবুকে দিয়ে মোবাইল কেনানো হয়েছে। কিন্তু এদেশে মোবাইলে ইনকামিং কল এলেও চার্জ হয় — এই সত্যটা জানামাত্র একেনবাবু ফোন 'অফ' করে রাখছেন। নিজে যদি ফোন করেন, তাহলেই কথাবার্তা হতে পারে। সেটা এবার এখনও করেননি। তবে দু'– তারিখে ফেরার কথা, অর্থাৎ এই মঙ্গলবার। একা একা বেশ খারাপই লাগছে। প্রমথর তির্যক মন্তব্য আর একেনবাবুর উলটোপালটা প্রশ্ন আর বকবকানি — দুটোই মিস করছি। খাওয়াদাওয়া আর নিউজ ছাড়া বেশির ভাগ সময় কাটছে কম্পিউটারের সামনে।

রবিবার সকালে ঘরে বসে ই–মেল দেখছি। বেরোতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আজ বাজার না করলেই নয়। চা, চিনি, রুটি — কিচ্ছু বাড়িতে নেই। বাজার করতে অবশ্য বেশি দূর যেতে হয় না। নীচে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই পাড়ার রকমারি দোকান 'হ্যাপি শপ'। তার গ্রোসারি সেকশানে মোটামুটি সবকিছুই পাওয়া যায়। দামটা একটু বেশি। মালিক ডেভ ব্রাউন আমার প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে। আমার থেকে বয়সে অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু দেখা হলেই খুব সম্মান দিয়ে 'হ্যালো, প্রফেসর ডে' বলে সম্বোধন করে। যেদিন কলেজে যাবার তাড়া থাকে ওখান থেকেই এক কাপ কফি আর চকলেট ক্রোঁসা তুলে নিয়ে কলেজে চলে যাই। ইদানীং অবশ্য প্রতিদিনই সেটা করছি, প্রমথ আর একেনবাবু না থাকায় শুধু নিজের জন্যে ব্রেকফাস্ট বানাতে ইচ্ছে করে না।

হ্যাপি শপে গিয়ে দেখি আজ দোকান ফাঁকা। ডেভ গল্প করতে ভালোবাসে আর খরিদ্দার না থাকলে তো কথাই নেই। বেশ খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করল, "বাই দ্য ওয়ে, তুমি এজে ডাটকে চেনো?"

"না।"

"হি ইজ ফ্রম ইওর হোমটাউন!"

"কোলকাতা?"

"ইয়েস। ওর ওয়াইফের সঙ্গে পরিচয় হল। তোমার পাশের বাড়িতে কয়েকদিন হল এসেছে। আমি তোমাদের তিনজনের কথা বলেছি। এজে এখন কোলকাতায়, ক'দিন বাদেই ফিরবে। ইউ মাস্ট মিট।"

ডেভ এরকম মাঝে মাঝেই করে। কোনো ইন্ডিয়ান পাড়ায় এলেই আমার আর প্রমথর অজস্র প্রশংসা করে আর একেনবাবুর স্থান যে হারকিউল (বা এ্যরকুল) পয়রোর পরেই সেটা বোঝায়। ভারি এমব্যারাসিং। এজে নিশ্চয় অজয়। ডাট যে দত্ত সেটা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কোলকাতার লোক হলেই কি আত্মীয়তা করতে হবে! এক্ষেত্রে সহজ উত্তর

হল, ‘হোয়াই নট’ বলা। তাই বললাম।

চা-চিনি-রুটি কিনতে গিয়ে অনেক কিছুই কিনে ফেললাম। বাজার সেরে যখন টাকা দিয়ে বেরচ্ছি, ডেভ এসে বলল, “বাই দ্য ওয়ে, এজের স্ত্রী কিন্তু ইন্ডিয়ান নয়।” তারপর একটু মুচকি হেসে বলল, “নাদিয়া ইজ ফ্রম রাশিয়া — এ রাশিয়ান ব্রাইড। খুব সুইট মেয়ে।”

এই মুচকি হাসার কারণ, রাশিয়ান ব্রাইডের অজস্র বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে। ইন্টারনেটেও রাশিয়ান ব্রাইড নিয়ে বহু সাইট রয়েছে। গত রবিবারই নিউ ইয়র্ক টাইমসে বড় করে একটা লেখা বেরিয়েছিল এই নিয়ে। আসলে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপার। নিঃসঙ্গ আমেরিকান পুরুষদের সংখ্যা কম নয়। রাশিয়ান সুন্দরী পাওয়ার মোহে অনেকেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয়। যোগাযোগ শুরু হয় ই-মেল বা টেক্সট পাঠিয়ে। এরপর ফোনে কথা, দেখাসাক্ষাৎ....কপালে থাকলে প্রেম, বিয়ে সবকিছুই ঘটে যেতে পারে। সতর্কবার্তাও ছিল লেখাটাতে। বিশেষ করে যখন অযাচিত ভাবে পুরুষদের কাছে ই-মেল আসে মেয়েদের তরফ থেকে। কল-গার্ল ও প্রস্টিট্যুশন র‍্যাকেট এই ভাবেই চলে।

।। ২।।

সোমবার কলেজ যাবার পথে ডেভের দোকানে থেমেছি কফি আর ক্রোঁসার জন্যে, দেখি একটি মেয়ে দুধ কিনছে! ডেভ আমাকে দেখেই বলল, “তুমি একদম ঠিক সময়ে এসেছ।”

তারপর মেয়েটিকে বলল, “এই যে নাদিয়া, ইনিই প্রফসর ডে, যাঁর কথা সেদিন বলছিলাম। হি উইল বি এব্ল টু হেল্প ইউ।” তারপর আমায় বলল, “এঁর হাজবেন্ডই এজে।”

কী হেল্প করব বোঝার আগেই নাদিয়া বলে মেয়েটি ঘুরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, “হাই, প্লিজ টু মিট ইউ।”

চমৎকার ফিগার। মুখটাও সুন্দর, তবে ওই ফিগারের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো নয়। গলাটা একটু ভারী, অ্যাকসেন্ট সুস্পষ্ট স্লাভিক। হয়তো বেশিদিন এদেশে আসেনি।

আমি উত্তর দিলাম, “সেইম হিয়ার।”

“আই ব্যাডলি নিড ইওর হেল্প।”

“মাই হেল্প!”আমি একটু অবাক হয়েই বললাম।

“আপনি একটু আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসবেন? একটা জিনিস দেখাব।”

আমি হতভম্ব হয়ে ডেভের দিকে তাকাতে ডেভ বলল, আমি একটু আগেই দেখেছি। ইট ওয়াজ গ্রিক টু মি!”

“প্লিজ, দু’-এক মিনিটের বেশি সময় আপনার নষ্ট করব না।” মেয়েটি অনুনয় করল।

এরপর আর ‘না’ বলা যায় না।

হাঁটতে হাঁটতে নাদিয়া বলল, “আপনাকে এই সময় পেয়ে যাব ভাবিনি, নইলে ওটা সঙ্গে আনতাম।”

"আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, কীভাবে আপনাকে আমি হেল্প করতে পারি!"

"কাল রাতে আমি একটা ই-মেল পেয়েছি। ভেরি আর্জেন্ট লেখা, কিন্তু চিঠিটা ইংরেজিতে নয়। আমি এখানে কাউকেই চিনি না। আজ ভোরে ডেভ যখন দোকান খুলতে আসে তখন ওকে দেখিয়েছি। ও পড়তে না পেরে আপনার কথা বলল।"

আজকাল অবশ্য বিভিন্ন ভাষায় ই-মেল লেখা যায়। আমিও মাঝেমধ্যে পাই। সম্ভবত কোনো জাঙ্ক ই-মেল। জিজ্ঞেস করলাম, "ই-মেলটা কার কাছ থেকে এসেছে?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"আজেবাজে ই-মেল কিন্তু অনেক সময়েই আসে। কে পাঠিয়েছে যদি না জানেন, ডিলিট করে দেবেন। আমি তো তাই করি।"

"আমিও তাই করি। কিন্তু ভাষাটা পড়তে পারছি না। যদি দরকারি কিছু হয়!"

"আই ডাউট ইট। আমিও মাঝেমধ্যে চাইনিজ বা জাপানিজ স্ক্রিপ্টে উলটোপালটা ই-মেল পাই। খুলিও না। সোজা ডিলিট করি। চেনাজানা কেউ যদি আপনাকে খবর পাঠাতে চায়, তাহলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই পাঠাবে।"

"আই হোপ ইউ আর রাইট।" বলে মেয়েটা আর কিছু বলল না।

কয়েক মিনিটের পথ। তার বেশির ভাগটাই গেল এলিভেটর অর্থাৎ দেশে যাকে লিফট বলি– তার অপেক্ষায়। পুরোনো লিফট ক্যাঁচকোঁচ করে অনেক আপত্তি জানাতে জানাতে ছ'তলায় উঠল। নাদিয়া দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আমায় বসতে বলে ভেতরে গেল চিঠি আনতে। আমি আর বসলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটার চারদিক দেখলাম। আসবাবপত্র সবগুলোই বেশ পুরোনো। মনে হল অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গেই ছিল। এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারটা শুধু নতুন। একটা বড়সড় প্লাজমা টিভি তার মধ্যিখানে বসানো। সাইডে কতগুলো ইন্ডিয়ান টুকিটাকি জিনিস আর রাশিয়ান ডল। ওপরের তাকের একদিকে নাদিয়া আর তার ছেলে। অন্যদিকে একটা লোকের ছবি। চোখে সানগ্লাস, বোঝা যায় ভারতীয়। নিশ্চয়ই ওর স্বামী এজে ডাট।

নাদিয়া এর মধ্যে ওর ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে। ই-মেলটা দেখাল। বাংলায় লেখা চিঠি — কোনো সম্বোধন নেই। ই-মেলের হেডিং ইংরেজিতে — 'ভেরি আর্জেন্ট'। নীচে লেখা —

শেষ সতর্কবার্তা–Nadiya ত্যাগ করা আবশ্যক অথবা মৃত্যু...

বাংলাটা আড়ষ্ট এবং অশুদ্ধ — সরকারি নোটিসে অনেক সময় যেমন থাকে। নিঃসন্দেহে কারোর রসিকতা, তবে নট ইন এ গুড টেস্ট। নীচে কোনো নামও নেই।

নাদিয়া জিজ্ঞেস করল, "কী লেখা আছে?"

বন্ধু হলে মজা করে বলা যেত, মনে হচ্ছে আপনার কোনো প্রেমিকের চিঠি। কিন্তু যার সঙ্গে এই মাত্র পরিচয় হল, তাকে তো আর সেটা বলা যায় না!

একটা ব্যাপারে বিরক্তি লাগল, মেয়েটিকে যত সরল ভেবেছিলাম তা নয়। স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে! বলেই ফেললাম, "চিঠিটা তো দেখছি আপনার স্বামীর ই-মেল অ্যাড্রেসে-এ পাঠানো হয়েছে!"

"হ্যাঁ," নাদিয়া সপ্রতিভ ভাবেই বলল, "কলকাতায় ওর ই-মেল দেখার সমস্যা হয়। আমিই প্রতিদিন ওর ই-মেল চেক করি – যাতে দরকারি কিছু হলে ওকে জানাতে পারি। কাল রাতে এই ই-মেলটা দেখি। সকালে ডেভকে দেখাতে ও বলল হয়তো বাংলা –

আপনি পড়তে পারবেন।”

“পড়তে পারছি, তবে এর মাথামুন্ডু নেই। আপনার স্বামী কবে আসছেন?”

“ও এখন প্লেনে।”

“উনি এলেই এটা ওঁর হাতে দেবেন। অনেক সময় বন্ধুদের মধ্যে চিঠিতে অনেক কিছু লেখা থাকে, শুধু বন্ধুরাই বুঝতে পারে।”

“এটা কোনো বন্ধুর চিঠি?”

“তাও বলতে পারব না।”

“কোনো নাম নেই নীচে?”নাদিয়া জিজ্ঞেস করল।

“না। ই-মেল অ্যাড্রেসটা থেকেও বোঝার উপায় নেই। xyz ইত্যাদি নানান অক্ষর দিয়ে @gmail.com খুব সম্ভবত এটা spam...junk mail।”

নাদিয়া আমার কথা কতটা বিশ্বাস করল বুঝলাম না। একটু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, “অন্য কিছু পড়তে পারছি না, কিন্তু আমার নামটা পড়তে পারছি। আমার সম্বন্ধে কি কিছু লিখেছে?”

“সেটা আমিও দেখলাম, হয়তো একই নাম দিয়ে হাজার হাজার জায়গায় পাঠিয়েছে, আপনার ক্ষেত্রে নামটা মিলে গেছে।”

নাদিয়া একটু চুপ করে রইল। “আমি জানি আপনার এখন তাড়া আছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয় এতে ভয় পাবার কিছু আছে? আমি এখানে একা আছি ছেলেকে নিয়ে।”

“মনে হয় না,” আমি ওকে ভরসা দিলাম।

হয়তো আরেকটু পজিটিভলি কথাটা বলা উচিত ছিল। নাদিয়া আর কিছু বলল না।

।। ৩।।

সকালে পরপর দুটো ক্লাস। সেগুলো পড়িয়ে ফিরে অফিসে বসতে না বসতে যে ফোনটা এল, সেটা আমি মোটেই এক্সপেক্ট করিনি। নাদিয়া। গলার স্বরটা ভাঙা ভাঙা।

“আপনার নম্বরটা ডেভের কাছ থেকে পেলাম। আপনার কাজ শেষ হলে ইউ মাস্ট কাম।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম,“কী ব্যাপার?”

“আই ডোন্ট নো। একজন আমাকে ফোন করে বলল, এজের আসতে দেরি হবে। ও দুবাইয়ে একটা কাজে আটকা পড়েছে। দু’-একদিনের মধ্যে ফোন করবে। কী কাজ কিছু বলল না, নিজের পরিচয়ও দিল না, লাইনটা হঠাৎ কেটে দিল। আমার মনে হচ্ছে এই চিঠির সঙ্গে ব্যাপারটার কিছু একটা আছে। এছাড়া, এছাড়া...”

“এছাড়া কী?”

“আপনি আসুন, তারপর আমি বলব। আমি এখানে আর কাউকে কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না। প্লিজ ডু কাম। ইউ মাস্ট ফিগার আউট দ্য কনটেন্ট অফ দ্য লেটার।”

আমাকে কিছু বলার সুযোগ প্রায় না দিয়েই ফোনটা রেখে দিল।

হঠাৎ একটা অজানা আশঙ্কা আমাকে গ্রাস করল। এমন কী কথা যে নাদিয়া আর কাউকে কিছু বলতে পারবে না, শুধু আমাকেই বলতে পারবে। শি হার্ডলি নোজ মি! এবার আমার মাথাটা পরিষ্কার হতে শুরু হল, ইজ ইট এ ট্র্যাপ? রাশিয়ান ব্রাইড বস্তুটির যে দুর্নাম আছে — তার ফাঁদে আমি পড়ছি না তো। নাদিয়া চাইছে আমি একা একা ওর কাছে যাই। কী ওর মাথায় ঘুরছে? চিঠিটা কি একটা টোপ ছিল? কিন্তু আমি ধনী নই, একজন সাধারণ প্রফেসর। আমার কাছে ও কী পেতে পারে?

দু'-মিনিটও যায়নি, আবার ফোন। আবার কি নাদিয়া! না, বাঁচা গেল! এবার একেনবাবু।

"কী খবর, কাল আসছেন তো?" স্বস্তি পেয়ে আমার গলার স্বরে উচ্ছ্বাসটা একটু বেশিই প্রকাশ পেল।

"সেকি স্যার, মেসেজ রেখেছি, পাননি?"

"না, চেক করিনি।"

"আমি তো বাড়ি থেকে বলছি, একটু আগেই এসে পৌঁছেছি।"

" এসে গেছেন! কেমন হল আপনার মিটিং?"

"আই ওপনার স্যার। টেররিস্টরা এখন যা শুরু করেছে না! আপনার নাম-ধাম চুরি করে টেররিজম করে অদৃশ্য হবে। পুলিশ আপনাকে এসে ধরবে, অথচ আপনি সাতে-পাঁচে ছিলেন না! ভাবুন অবস্থাটা!"

"কী সর্বনাশ! আগে তো আইডেন্টিটি থেফট করে শুধু ক্রেডিট কার্ড- টার্ডগুলো ফ্রড করা হতো!"

"এখন সবকিছু অন্য লেভেলে স্যার! সেকথা থাক, আপনার কোনো প্ল্যান নেই তো সন্ধ্যায়? একসঙ্গে খেতে যাব।"

"কোনো প্ল্যান নেই, ইন ফ্যাক্ট, আপনি এসে আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

"কেন স্যার?"

"এখানে বোধহয় একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে চলেছে।"

"তার মানে?" একেনবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"অত সিরিয়াসলি নেবেন না," বলে সংক্ষেপে নাদিয়া আর চিঠিটার কথা একেনবাবুকে বললাম।

"কবে এসেছিল স্যার চিঠিটা?"

"গতকাল।"

" কী তারিখ ছিল স্যার গতকাল?"

"পয়লা এপ্রিল। ও মাই গড! আপনি মনে করেন এপ্রিল ফুল?"

"একটা পসিবিলিটি স্যার।"

"আই হোপ সো। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় নাদিয়া ওর ওখানে যেতে বলেছে। আমি বুঝছি না কেন?"

" গেলেই জানতে পারবেন স্যার। তা আপনি ওঁর কাছ থেকে ঘুরে আসুন না, আমরা না হয় একটু পরেই ডিনার খাব।"

"খেপেছেন নাকি! আপনাকে রেখে আমি একলা যাব? আপনিও আসবেন, আমাকে পাহারা দিতে হবে না!"

।। ৪।।

নাদিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে আমরা পৌঁছলাম ছ'টা নাগাদ। একেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। একেনবাবুর কথা নাদিয়া ডেভের কাছে শুনেছে। মনে হল ওঁকে দেখে ভরসা পেল।

আমি বললাম, "একেনবাবুকে আমি ব্যাপারটা মোটামুটি বলেছি। কিন্তু তারপর মনে হচ্ছে আরও কিছু একটা ঘটেছে?"

"ইয়েস। আসলে সকালে আপনাকে আগের ফোনের কথাটা বলা হয়নি। একটা ফোন পেয়েছিলাম দু'দিন আগে। কেউ এজেকে খুঁজছিল। দ্যাট সারপ্রাইজড মি।"

"সারপ্রাইজড ইউ?" আমি একটু বিস্মিত মুখে তাকালাম।

"কারণ এই নম্বরটা আমি কাউকে দিইনি। পরিচিত দু-একজন ছাড়া কেউই এ নম্বরটা জানে না।"

"ডেভ আপনার নম্বর জানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ডেভকে আমি দিয়েছি। দোকানে ফ্রেশ ব্রেড এলে আমাকে জানাবার জন্যে।"

"তাহলে ধরে নিতে পারেন, নিউ ইয়র্কের অর্ধেক লোকই আপনার নম্বর জেনে গেছে।"

"ইয়েস, হি ইজ এ ভেরি ফ্রেন্ডলি পার্সন। কিন্তু ফোন যে করেছিল, সে আমার বাড়ির ঠিকানা চাইছিল, কী একটা জানি ডেলিভারি করবে। আমি যখন বললাম আমি কিছু অর্ডার করিনি। বলল এজে করেছে। জানি কথাটা সত্যি নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কে?' ফোনটা কেটে দিল। আজকে যে লোকটা ফোন করেছিল এজে দেরি করে আসবে বলে – সেও মনে হল ওই একই লোক! আপনার কি মনে হয় এজে ইজ ইন সাম কাইন্ড অফ ট্রাবল?"

"দ্যাট্স স্ট্রেঞ্জ!" আমি বললাম! "তবে সত্যিই কোনো ক্ষতি করতে চাইলে, এভাবে অ্যানাউন্স করে করবে না। মনে হচ্ছে কেউ ভয় দেখিয়ে মজা পাবার চেষ্টা করছে। আপনার কী মনে হয় একেনবাবু?"

একেনবাবু ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাচ্ছিলেন।

আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আমারও তাই মনে হয় স্যার।"

"আপনারও তাই মনে হয়?" একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে নাদিয়া প্রশ্নটা করল।

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"আসলে আমাকে না জানিয়ে এজের প্ল্যান চেঞ্জ করাটা আমাকে অবাক করেছে!"

"প্ল্যান চেঞ্জ করেছেন কি না, সেটা তো আপনি জানেন না ম্যাডাম। খবরটা তো ফল্স হতে পারে।"

"ইউ থিঙ্ক সো?" বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আই মিস হিম, প্রায় এক মাস হতে চলল.....বিয়ের পর পরই ওকে দেশে চলে যেতে হয়েছে মা ভীষণ অসুস্থ বলে। এনি ওয়ে হি উইল বি হিয়ার ভেরি সুন। তাই না?"

"এগজ্যাক্টলি, "আমি বললাম।

একেনবাবুর মনে হল ঘরের ইন্সপেকশন শেষ হয়েছে। এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারের ওপর ছবিটাকে দেখিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্বামী ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ।"

“হি ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম।”

“ইয়েস হি ইজ,” স্বামীর প্রশংসায় নাদিয়া মনে হল খুশি হয়েছে। “কী দেব আপনাদের? আমার কাছে রাশিয়ান চা আছে।”

“নো থ্যাঙ্কস।” আমি বললাম।

“আপনিও কিছু খাবেন না?” একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

“না ম্যাডাম, আজ না।”

“চিঠিটার অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন?” প্রশ্নটা এবার আমাকে।

“মনে হয় ওটা একটা জোক। তবে যে পাঠিয়েছে সে বাঙালি।”

“আমি চিঠির একটা কপি করে রেখেছি। আপনি যদি দেখেন, ” বলে একটা কাগজ একেনবাবুকে দিল।

“ভেরি ইন্টারেস্টিং বাংলা স্যার, ” আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন।

“ইন্টারেস্টিং!” নাদিয়া বিস্মিত হয়ে তাকাল।

“মানে ম্যাডাম, আন- ইউস্যুয়াল। আপনি কোনো বাঙালিকে চেনেন?”

“দ্যা ওনলি বেঙ্গলি পার্সন যাকে আমি চিনি সে হল এজের বন্ধু সুব্রত। আমায় খুব সাহায্য করে। এ বাড়িটা ওই দেখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসে।”

“হয়তো উনিই মজা করে এটা পাঠিয়েছেন ম্যাডাম।” ই-মেলের কপিটা ফেরত দিয়ে একেনবাবু বললেন।

“আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?” আমাকে জিজ্ঞেস করল নাদিয়া।

“অসম্ভব নয়। আপনার স্বামীর বন্ধুকে একবার ফোন করে দেখুন না?”

“ই-মেল পেয়েই আমি ওকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওর ফোন সুইচড অফ। একটা মেসেজ রেখেছি। ই-মেলটাও ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। যদি ও মানেটা বুঝতে পারে!”

এবার মনে হল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছি। বললাম, “হয়তো উনিই ই-মেলটা করেছিলেন, সেই জন্যেই উত্তর পাননি।”

আমার এই কথায় নাদিয়া মোটেই স্বস্তি পেল না। আবার জিজ্ঞেস করল,“কিন্তু কী রয়েছে ই-মেলটাতে?”

“অ্যাবসোলুট ননসেন্স। না বোঝার চেষ্টা করাই ভাল।”

“আপনারা আগে থাকতেন কোথায় ম্যাডাম?” একেনবাবুর প্রশ্নগুলো সব সময়েই একটু র‍্যান্ডম — অনেক সময়ই পারস্পর্য থাকে না।

“আপস্টেট নিউ ইয়র্কে, উডস্টকের কাছে।” প্রশ্ন শুনে নাদিয়া একটু বিস্মিত হলেও উত্তর দিল। সেই সঙ্গে প্রশ্নও করল,“ আপনি ওদিকে কখনও গেছেন?”

“না ম্যাডাম।”

“আমি গেছি,” আমি বললাম। ভারি সুন্দর জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গা থেকে একেবারে এখানে?”

“এজের ইচ্ছায়। ও ম্যানহাটান ভালোবাসে। দেশে যাবার পর থেকে তাগাদা দিচ্ছে ম্যানহাটানে একটা বাড়ি নিতে। বাড়িটা পাবার খবর পেয়ে হি ওয়াজ সো থ্রিলড।”

“ইট ইজ এ নাইস নেইবারহুড। এখানে আর কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?”

“তেমন করে না।”

এর পর দু’-একটা মামুলি কথার পর আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের বাড়ির ফোন নম্বরটা নাদিয়া চাইল। যদি দরকার হয়ে ফোন করবে। দিলাম। একেনবাবু আসায়

রাশিয়ান ব্রাইডের ভয়টা আমার গেছে।

।। ৫ ।।

বাড়িতে ফিরে স্নান-টান সেরে আমরা বেরলাম। কাছেই একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ছিল। আগে কোনো দিন যাইনি, ভাবলাম এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যাক। একেনবাবু মেনু দেখে খুব সন্তুষ্ট।

"চাইনিজরা খুব এফিসিয়েন্ট স্যার, ইন্ডিয়ার রেস্টুরেন্টের থেকে অনেক কম দামে খাবার দিচ্ছে।"

"এতে এফিসিয়েন্সির কি আছে? ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টের খাবারের তো অনেক বেশি দাম। ওদের থেকে কি ইন্ডিয়ানরা বেশি এফিসিয়েন্ট?"

"এটা ভালো বলেছেন স্যার। একেবারে মোক্ষম বলেছেন!" তারপর মেনুতে চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন,"আচ্ছা স্যার, নাদিয়া ম্যাডামের এটা কি দ্বিতীয় বিয়ে?"

"কেন বলুন তো?"

"না ছেলের বয়স তো বছর চারেক মনে হল। আর বিয়ে তো বললেন মাত্র এক মাস আগে হয়েছে।"

"কেন অবিবাহিত অবস্থায় কারও বাচ্চা হতে পারে না?"

"তা পারে স্যার, সেটা তো বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। আমি সোসাইটির কথা ভাবছি।"

"সোসাইটিও পালটাচ্ছে একেনবাবু। অবিবাহিত মেয়েদের বাচ্চা তো হামেশাই হচ্ছে এদেশে।"

"তাও তো বটে। আচ্ছা স্যার, টিভির নীচে পাঁচটা ডল লক্ষ্য করলেন? কেমন বড় থেকে ছোট!"

"ওগুলো টিপিক্যাল রাশিয়ান ডল — একটার মধ্যে একটা ঢুকে যায়।"

"ও হ্যাঁ, মাত্রিওস্কা ডল।

"আপনি তো সবই জানেন, অথচ ভাব দেখান কিছুই জানেন না!"

"কী যে বলেন স্যার, কত শিখছি আপনাদের কাছ থেকে! আচ্ছা স্যার, কিংস্টন উডস্টকের থেকে কত দূরে?"

"খুবই কাছে, কেন বলুন তো?"

"শুনলাম কিংস্টনে একজন মার্ডারড হয়েছে। লোকটা সম্ভবত ইন্ডিয়ান।"

"কার কাছ থেকে শুনলেন?"

"ডি. সি থেকে যখন ফিরছিলাম, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সঙ্গে ছিলেন। উনিই বললেন।"

"ও মাই গড, লোকটা কি নাদিয়ার স্বামী এজে ডাট হতে পারে? নাদিয়ারাও তো উডস্টকের কাছে থাকত বলল!"

"এখন তো আর থাকেন না স্যার। তাছাড়া এদেশে তো এখন কত ইন্ডিয়ান থাকে।"

"তা হোক, আপনি এখুনি খোঁজ নিন লোকটার পরিচয় কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না!"

আমার বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। একেনবাবুর মোবাইল বেজে উঠল। আমার

ধারণা একেনবাবু কলটা এক্সপেক্ট করছিলেন, নইলে অকারণে মোবাইল 'অন' রাখার পাত্র উনি নন। ঠিকই ধরেছি, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট।

একেনবাবুর দিক থেকে 'হ্যাঁ স্যার', 'ঠিক স্যার', 'আপনি শিওর স্যার', ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই শুনলাম না। ফোন শেষ হবার পর মনে হল একেনবাবুর মুখটা একটু যেন গম্ভীর।

"কী ব্যাপার, কোনো বাজে খবর?"

এর মধ্যে ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেছে।

"না, না, আসুন স্যার, খাওয়া যাক।"

একেনবাবু যখন কোনো কথার উত্তর দেন না, তখন একশোবার জিজ্ঞেস করেও কোনো লাভ নেই। তাই খেতে শুরু করলাম।

একটু বাদে একেনবাবু বললেন, "বুঝলেন স্যার, নামের মিল নামেই শেষ হয়।"

"কথাটার মানে কী?"

"নাম থেকে লোক চেনা মুশকিল। আমার এক কলিগের বন্ধু নবীন শাহ থাকে ওয়াশিংটন ডি.সি.- তে। নম্বর জানতাম না। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখলাম বারো জন নবীন শাহ!"

"শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেলেন?"

"নাহ, সময় পেলাম কই।"

"সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা এল কেন?"

"আসলে স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন, যে লোকটি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম অজয় দত্ত। তবে ইনি নিশ্চয় অন্য কেউ। দেশে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন।"

"মাই গড! নাদিয়ার স্বামীর নাম তো এজে ডাট!"

"তা ঠিক স্যার, কিন্তু তিনি তো বিয়ে করে গিয়েছিলেন, আর ইনি তো বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। বিগ ডিফারেন্স!"

"কি বলছেন যা- তা! এটা তো জাস্ট টাইমিংয়ের সমস্যা! আর পুলিশ এর মধ্যে এত ডিটেল্স জানলই বা কী করে!"

একেনবাবু চুপ করে রইলেন।

"আই হোপ এ অন্য কেউ। নাদিয়ার স্বামী হলে আমার অপরাধবোধের সীমা থাকবে না।"

"কেন স্যার?"

"দেখুন, চিঠিটার নানা অর্থ হতে পারে। বাজে ভাবে এটা ধরলে এজে-র লাইফ কুড হ্যাভ বিন ইন ডেঞ্জার। কিন্তু আমি তো সেটা ওকে জানাইনি!"

"ট্রু স্যার, 'নাদিয়াকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক অথবা মৃত্যু' — সেটাই তো বোঝায়। কিন্তু স্যার পরিত্যাগ করার সুযোগটা তো দিতে হবে। তার আগেই যদি খুন করে ফেলা হয়, তাহলে চিঠিটার কোনো মানে থাকে না।"

"ওইটেই বাঁচোয়া। রসিকতার পাল্লাটা ওটাই ভারী করেছে। কিন্তু কে এই অজয় দত্ত? আপনি চেক করে দেখবেন না?"

"কেন দেখব না স্যার। খাওয়া-দাওয়ার পরই একবার পুলিশ স্টেশনে যাব। সেরকমই কথা হল স্টুয়ার্ট সাহেবের সঙ্গে।"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের অফিসটা খুব দূরে নয়। আমি উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিলাম

না। প্রায় গোগ্রাসে খেলাম। একেনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। "তাড়াতাড়ি করছেন কেন স্যার, আমরা তো আর ট্রেন ধরতে যাচ্ছি না।"

"কী মুশকিল, এ যদি সেই অজয় দত্ত হয়!"

"হলেই বা আমরা কী করতে পারি স্যার? বসুন, স্যার বসুন, রিল্যাক্স করুন। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যখন এসেছি, ফ্রায়েড আইসক্রিমটা মিস করব না!"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট অফিসে ছিলেন না। কিন্তু ছবিটা দেখানোর ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিটা দেখে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। নাদিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে যে ছবি দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই মৃত লোকটির মুখের মিল একেবারে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ শুধু নামেরই মিল নয়! এই ডেডম্যানই নাদিয়ার স্বামী এজে!

আমার যে কী খারাপ লাগছিল বোঝাতে পারব না! একেনবাবুকে বললাম, "নাউ আই ফিল টেরিবলি গিল্টি, এজেকে লেখা চিঠিটার অর্থ নাদিয়াকে বলিনি বলে।"

"অর্থটা নাদিয়া ম্যাডামকে বললে কি আপনি এটা ঠেকাতে পারতেন স্যার?"

"তা হয়তো পারতাম না। কিন্তু চিঠিটার অর্থ জানতে মেয়েটা শুধু একটুখানি সাহায্য চেয়েছিল। জেনেও সে সাহায্যটুকুও আমি করিনি। আই ওয়ান্টেড টু প্লে গড। অর্থটা ওকে বললে মহাভারত কী অশুদ্ধ হত বলুন তো! এই চিঠি এখন পুলিশ পড়বে, অর্থটাও মেয়েটাকে জানাবে। নাদিয়া কী ভাববে — কী ধরনের প্রতিবেশী আমি! ডেভের কী ধারণা হবে আমার সম্পর্কে! এত বড়ো জিনিসটা আমি চেপে রেখে দিয়েছিলাম!"

একেনবাবুর কানে কথাগুলো মনে হয় পৌঁছল না। ফোন বার করে বললেন, "দাঁড়ান স্যার, স্টুয়ার্ট সাহেবকে খবরটা দিই।"

ওদিক থেকে কী কথা হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। কথা শেষ হওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বললেন ক্যাপ্টেন সাহেব?"

নাদিয়ার বা এই বিয়ের কথা কিছু জানতেন না। তবে অবাক হলেন না। বাড়ির চাপে কেউ কেউ এখানকার বিয়ের কথা চেপে ইন্ডিয়াতে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে!"

"কিন্তু সেটা তো বিগ্যামি, সেকেন্ড বিয়েটা ভ্যালিডও নয়।"

"রাইট স্যার। তাও লোকে করে ফেলে, ভাবে দেশের বৌকে এখানে না নিয়ে এলেই হল। এরকম কেস এই নিউ ইয়র্কে সিটিতেই বেশ কয়েকটা হয়েছে।"

"নাদিয়াকে তো এটা জানাতে হয়।"

"কী জানাতে হয় স্যার — এই বিয়ের ব্যাপারটা?" একটু বিস্মিত হয়েই একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"আরে না, আমি তো পাগল নই। আর কথাটা ঠিক না ভুল সেটাও তো জানি না। আমি ভাবছি এজের মারা যাবার খবরটা। কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেওয়া যায় কী করে!"

"স্যার, খবরটা তো আপনি অফিশিয়ালি পাননি। আর যে মারা গেছে তার সঙ্গে নাদিয়ার যে একটা সম্পর্ক আছে — সেটা পুলিশ আগে ভেরিফাই করুক। পুরো ব্যাপারটা শিওর না হলে — পুলিশ কাউকে মৃত্যুসংবাদ দেয় না।"

"কিন্তু ফটো ডোন্ট লাই।"

"ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক ঠিকই। আপনি চান তো ম্যাডাম নাদিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যেতে পারে। তবে মৃত্যুসংবাদটা চেপে রেখে — ওটা পুলিশই দিক।"

আবার আপনি আমাকে ভগবানের ভূমিকায় ফেলছেন! নাদিয়া যদি জিজ্ঞেস করে এজের কোনো খবর আমি পেয়েছি কি না।”

“ওটা আমি হ্যান্ডেল করব স্যার। আপনি বরং চিঠিটার অর্থ ওঁকে বলতে পারেন, তাহলে আপনার গিল্টি ফিলিংটা যাবে।”

ঘড়িটা দেখলাম রাত দশটা। এই রাতে যাওয়াটা বোধহয় সঙ্গত হবে না।

কাল সকাল সকাল যাব।

।। ৬।।

সকালে কলেজে যাবার পথে দেখলাম নাদিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের লবির দরজা খোলা। আমি একেনবাবুকে বললাম, “নাদিয়ার ফোন নম্বরটা জানি না। ফোন করে যেতে পারলে বোধহয় ভালো হত।”

“সেটা ঠিক স্যার। কিন্তু বেশি দেরি করলে আর যাবার দরকার হবে না। তার আগে পুলিশই খবরটা দিয়ে দেবে।”

“তাহলে চলুন।”

উপরে উঠে বেল বাজালাম। নাদিয়া বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে আমাদের দেখে অবাক। মুখটা দেখেই বোঝা যায় খুব টেন্সড হয়ে আছে।

“না বলে হঠাৎ করে চলে এলাম। আর কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“না, আমি এখনো এজের কোনো ফোন পাইনি।”

এবার একেনবাবু মুখ খুললেন, “বুঝলেন ম্যাডাম, আপনার ওই ই-মেলটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম। মনে হল বাংলায় আপনাকে কেউ একটা ওয়ার্নিং দেবার চেষ্টা করেছে। তাই ভাবলাম বলে যাই।”

“ওয়ার্নিং!”

“হ্যাঁ”, এবার আমি বললাম, অশুদ্ধ বাংলায় লেখা – ‘নাদিয়াকে ছাড়ো অথবা মৃত্যু’। পয়লা এপ্রিলের এই চিঠিটা আমি ফাজলামি ভেবেছিলাম বলে আর কিছু তখন বলিনি।”

“মৃত্যু!” নাদিয়ার মুখ দেখলাম কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বলল, “আমি আজকে আবার বাংলায় ওরকম আরেকটা ই-মেল পেয়েছি।”

“আজকে পেয়েছেন ম্যাডাম?”

“বোধহয় আগেই এসেছে। এজে-র জাঙ্ক ফোল্ডারে পড়ে ছিল, আজকে সেটা খুলতে চোখে পড়ল। আপনাদের কী মনে হচ্ছে, এজেকে কি কেউ খুন করবার চেষ্টা করছে?”

“এটা কেন ভাবছেন ম্যাডাম? কারোর সঙ্গে কি ওঁর কোনো শত্রুতা ছিল?”

“ আই ডোন্ট নো, বাট সামথিং ইজ নট রাইট।”

“কেন ম্যাডাম?”

নাদিয়া সেই অপরিচিত লোকের কাছ থেকে ফোন পাবার কথাটাই আবার বলল।

“সেটা তো কালকে বলেছিলেন। এছাড়া আর কারোর কাছ থেকে?”

নাদিয়া চুপ করে রইলো।

"ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু না বলতে চান, ঠিক আছে, আমরা বিরক্ত করব না।"

"না, না, না — বলার কিছু নেই। আসলে ব্যাপারটা একটু কমপ্লিকেটেড। আপনারা ভেতরে আসুন, ব্যাপারটা খুলে বলি।"

আমরা ঘরে ঢুকে বসার পর নাদিয়া বলল, "এজে আমার সেকেন্ড হাজবেন্ড। আমার প্রথম হাজবেন্ড মারা গেছে প্রায় আট মাস হল।"

"আপনার প্রথম স্বামী কি এদেশের লোক ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওঁর বয়স তো খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, উনি কি অসুস্থ ছিলেন?"

"না। ওর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। হঠাৎ বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে অ্যাকসিডেন্টালি ও মারা যায়।"

"আই অ্যাম সো সরি ম্যাডাম।"

নাদিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "আই থিঙ্ক ইউ শুড নো দ্য হোল স্টোরি।"

লম্বা কাহিনি। বলতে বলতে নাদিয়া বেশ ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজিতেও তেমন দক্ষ নয়। যেটুকু বুঝলাম সেটা হল–

নাদিয়া মস্কোর মেয়ে। বন্ধুদের অনেকের মতে নাদিয়াও ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বরের খোঁজে। সেই সূত্রেই অলিভারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় বছর পাঁচেক আগে। অলিভার স্মিথ ছিল অটো-মেকানিক। নাদিয়ার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়ো। অলিভার মস্কোতে নাদিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যায়। সেখানে দু'-সপ্তাহ একসঙ্গে থেকে ওরা বিয়ে করবে ঠিক করে। ন্যাডেজডা নিকোলায়েভনা ভোলকোভা হয়ে যায় নাদিয়া স্মিথ। অলিভার ফিরে আসে। তার কিছুদিন বাদে নাদিয়ার ভিসা হয়ে যায়, সে-ও চলে আসে। ওদের একটি বাচ্চা হয়। তারপর হঠাৎ অলিভারের মৃত্যু। ছোটো একটা বাচ্চা, নিজে ইংরেজি ভালো জানে না, বেশ অথই জলে পড়েছিল নাদিয়া।

অলিভারের বন্ধুদের নাদিয়া একেবারেই পছন্দ করত না। ওদের কয়েকজন, বিশেষ করে স্যাম গ্রোভার, অলিভার বেঁচে থাকতেই ওকে উত্যক্ত করত। অলিভার মারা যাবার ক'দিনের মধ্যেই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নাদিয়া রিফিউজ করে। কিন্তু তাও নাদিয়াকে পাবার আশা ছাড়েনি। এ রিয়েল জার্ক। এই সময় এজে প্রচুর সাহায্য করে। এজে আর এজের বন্ধু সুব্রত এক সময় ওদের প্রতিবেশী ছিল। দু'জনেই খুব সুইট, কিন্তু অলিভারের বন্ধুরা ওদের ঘৃণা করত। এজেকে ওরা একবার এমন থ্রেট করেছিল যে ভয় পেয়ে ওরা কিংস্টনে চলে যায়। কিন্তু যোগাযোগটা ছিল। নাদিয়ার টাকাকড়ি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে দেখে এজে একটা রাশিয়ান ট্রান্সলেশন এজেন্সির সঙ্গে ওর যোগাযোগ করিয়ে দেয়। নাদিয়া সেখানে ট্রান্সলেটরের কাজ করত। মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ বুঝতে অসুবিধা হলে এজের সাহায্য নিত। এই ভাবেই ওদের বন্ধুত্বের শুরু। অলিভারের মৃত্যুর মাস সাতেক বাদে নাদিয়া ওর বাচ্চাকে এক বান্ধবীর কাছে রেখে সুব্রত আর এজের সঙ্গে ক্রস-কান্ট্রি ট্যুরে বেরোয়।

নেভাডায় যাবার পর সুব্রতর হঠাৎ একটা কাজ এসে পড়ায় ওকে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হয়। এজে আর নাদিয়া তখন একা। এজে নাদিয়াকে প্রপোজ করে। নাদিয়া রাজি হয়। নেভেডাতে বিয়ে করাটা সহজ, ওয়েটিং পিরিয়ড নেই। ওখানেই ওরা বিয়ে করে। অলিভারের বন্ধুদের ঝামেলা এড়াতে দু'জনে ঠিক করে ম্যানহাটানে এসে সংসার পাতবে। ফেরার পথে মা মরণাপন্ন খবর পেয়ে এজে দেশে চলে যায়। একসঙ্গে ওদের সংসারও

করা হয়নি। প্রথমে এজে গিয়েছিল দু'-সপ্তাহের জন্যে, পরে জানায় আরও দু'- সপ্তাহ থাকতে হবে। বিয়ের খবরটা বেশি জানাজানি হওয়ার আগেই নাদিয়া ঠিক করে ম্যানহাটানে চলে আসবে। সুব্রত ওকে সাহায্য করে বাড়ি ঠিক করা, জিনিসপত্র আনার ব্যাপারে। মোটামুটি এটাই ঘটনা।

"মিস্টার সুব্রত এখন কোথায় ম্যাডাম — কিংস্টনে?"

"না, বেশ কিছুদিন হল ও কুইন্সে মুভ করেছে।"

"আপনাদের ওখানকার বাড়িঘরগুলোর কী হল ম্যাডাম?"

"আমারটা ভাড়াবাড়ি ছিল।"

"আপনার স্বামীরটা নিশ্চয়ই ওখানেই আছে, হঠাৎ করে চলে গেছেন যখন?"

"হ্যাঁ ওর জিনিসপত্র সব ওখানেই, আমি আর এর মধ্যে ওখানে যাইনি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আচ্ছা আপনার ই-মেল দুটোর কপি কি পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। দুটোই আমি কপি করে রেখেছি। নাদিয়া ঘরে গিয়ে ই-মেল দুটো একেনবাবুকে দিল।"

"দেখুন, যদি আর কিছু উদ্ধার করতে পারেন এগুলো থেকে।"

"দেখব ম্যাডাম। তবে একটা কথা বলি, আপনার স্বামীর খবর যখন পাচ্ছেন না, একবার নিউ ইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তারা যদি কিছু হদিশ দিতে পারে।"

ফেরার পথে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ই-মেলগুলো নিয়ে কী করবেন, যা হবার তো হয়েই গেছে?"

"তা ঠিক স্যার।"

"তাহলে?"

"আসলে স্যার, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।"

এটা একেনবাবুর একটা টিপিক্যাল লাইন। কোনো কিছুর উত্তর দিতে না চাইলে হয় চুপ করে থাকেন, নয় এ লাইনটা আওড়ান।

বাড়ি ফিরে আমার মনটা খারাপ লাগছিল। একটু বাদেই নাদিয়া জানতে পারবে এজের খবর। পর পর দুই স্বামীর মৃত্যু — প্রথমটা দুর্ঘটনা, দ্বিতীয় জন খুন– কী ট্র্যাজেডি! একেনবাবু নিজের ঘরে ঢুকে কী করছেন কে জানে! আমি কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছিলাম না। কতগুলো টার্ম পেপার জমে ছিল, গ্রেড করা হয়নি। সেগুলো দেখার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। তারপর 'দুত্তোর' বলে স্নান করতে ঢুকলাম। মাথাটা যদি একটু ঠান্ডা হয়! স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি একেনবাবু কফি টেবিলে ঠ্যাঙ- দুটো তুলে চোখ বুজে কী জানি ভাবছেন। কোলের ওপর ই-মেল দুটো।

"আপনি যখন স্নান করছিলেন স্যার, তখন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটু কথা হল।"

"কী কথা — এজের সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ স্যার। কিংস্টন পুলিশের চিফ টিম হোরে এজের মৃত্যুর ব্যাপারে নিজে ইন্টারেস্ট নিয়েছেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আমাদের কথা ওঁকে বলেছেন। আমরা যদি এ ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর চাই, তাহলে মিস্টার হোরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।"

"সেটা কি অনধিকার চর্চা হবে না, নাদিয়া তো আমাদের শুধু চিঠির অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল- আর তো কিছু করতে বলেনি।"

"ট্রু স্যার।"

"তাহলে?"

" কী জানি স্যার — আসলে মাথার মধ্যে ঘুরছে, হোয়াই ওয়াজ মিস্টার এজে কিলড? এই ই-মেল দুটোর অর্থ কী — কে লিখেছেন এগুলো? জাস্ট রসিকতা, না এর সঙ্গে কি খুনের সত্যিই কোনো যোগাযোগ আছে? এইসব নানান প্রশ্ন।"

"সেটা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা তো ম্যানহাটানের ব্যাপার নয় আর কিংস্টনের পুলিশের কর্তা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নন। আপনাকে এতে ওরা নাক গলাতে দেবে কেন? আর যদি দেয়ও, রহস্যের কিনারা করে আপনার লাভটা কী হবে— কানাকড়িও তো পাবেন না!"

"কী যে বলেন স্যার, পয়সার কথা আসছে কেন। একজন ফেলো — বেঙ্গলি ডেড- একটা দায়িত্ব তো সবারই আছে!"

"ঝেড়ে কাশুন না, আপনি কিংস্টন যাবার কথা ভাবছেন?"

"আমার ভাবা-ভাবিতে আর কী হবে স্যার, গাড়ি তো আপনার।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু কিংস্টন যেতে আমার তো পেট্রল খরচা হবে। সেটা দেবে কে — আপনি?" বলেই হেসে ফেললাম।

"আপনি না স্যার, সত্যি!"

।। ৭।।

কিংস্টনে আমার দূরসম্পর্কের কাকা থাকেন। ওখানে আইবিএম - এর একটা ল্যাবে দিনুকাকা কাজ করতেন। রিটায়ার করে সেখানেই থেকে যান। কাকিমা মারা গেছেন গত বছর। একমাত্র মেয়ে কেয়া পিএইচ.ডি করে গুগলের একটা রিসার্চ ল্যাবে কাজ করে। সেও বাইরে। দিনুকাকা এখন একেবারে একা। বাড়িটা বিক্রির জন্যে দিয়েছেন। বিক্রি হলে দেশে ফিরে যাবেন — সেটাই প্ল্যান। কাকিমা থাকতে দিনুকাকার ওখানে প্রায়ই যেতাম। এখন আর যাওয়া হয় না। দিনুকাকা মাঝে মাঝে ফোন করে আসতে বলেন, কিন্তু ওই যাচ্ছি, যাব করি।

একেনবাবু যখন বললেন উনি কিংস্টনে যাবেন ওখানকার পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে, তখনই মনে হয়েছিল দিনুকাকার কথা। ওখানে গেলে দিনু কাকা খুশি হবেন আর আমাদের কাজটাও হবে। তবে দিনুকাকা কিংস্টনে আছেন না বাইরে কোথাও গেছেন সেটা দেখতে হবে। লাকিলি দিনুকাকাকে পেলাম। ভীষণ এক্সাইটেড আমি আসছি শুনে। কেয়াও বাড়িতে এসেছে কয়েকদিনের জন্যে। ও-ও ফোন ধরে হই হই করে উঠল। দিনুকাকাকে একেনবাবুর কথা বললাম। উনি যে একজন গোয়েন্দা সে খবরটাও দিলাম। ওরে বাবা, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়। খুব ভালো লাগবে। ওকে বলিস, কোনো অসুবিধা নেই।

পরের দিন সকালে আমরা দিনুকাকার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। ওঁর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে ১০০ মাইলের মতো দূরে। প্রায় পুরোটা পথই হাইওয়ে — শেষের কয়েকটা মাইল বাদে। কিংস্টন শহর পর্যন্ত যেতেও হয় না। লিঙ্কন টানেল বা কোথাও জ্যাম না পেলে

দিনুকাকার বাড়ি পৌনে দু'ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়।

কিংস্টন আলস্টার কাউন্টিতে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। বিশেষ করে দিনুকাকা যেখানে থাকেন পুরো অঞ্চলটাই বিশাল বিশাল অ্যাশ গাছে ভর্তি,ফাঁকে ফাঁকে ছবির মতো বাড়ি। একেনবাবু মুগ্ধ!

"নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এখানে হলে স্যার বেশ হত।"

প্রায় এসে পড়েছি। পাড়ার রাস্তার শেষ টার্নটা নিতে নিতে বললাম, "এখানে ম্যানহাটানের মতো অত রেস্টুরেন্টে পেতেন না, রান্না করে খেতে হত।"

"কী আর করা স্যার, পজিটিভ থাকলেই নেগেটিভ থাকে।"

দিনুকাকা আর কেয়া সাগ্রহে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একেনবাবুকে কেয়া বা দিনুকাকা — কেউই আগে দেখেনি। জলজ্যান্ত গোয়েন্দা দেখে দু'জনেই খুব খুশি। আমরা পেছনের কাভারড প্যাটিওতে বসলাম। কেয়া কফি বানাতে গেল। আমিও ওর সঙ্গে কিচেনে গেলাম। আরও কিছু করার প্ল্যান করছিল। কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি বলে কোনোমতে ওকে নিরস্ত করলাম।

"ঠিক আছে, কিন্তু লাঞ্চ খেয়ে যাবে।" কেয়া ওর দাবি জানিয়ে রাখল।

"তোর হুকুম না মেনে উপায় আছে!"

"কত তো বোনের কথা রাখো!"

অভিমানী এই বোনটাকে আমার সবসময়েই ভাল লাগে। ওর কাজকর্মের খবর, প্রেম-টেম করছে কি না — এইসব নানান রকম বিষয় নিয়ে ঠাট্টা আলোচনা চলল কিছুক্ষণ।

কফি নিয়ে এসে দেখি, দিনুকাকা একেনবাবুর সঙ্গে দারুণ গল্প জুড়েছেন। একেনবাবু মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। আসলে কাকিমা থাকার সময় দিনুকাকা এত কথা বলতে পারতেন না। মাঝে মাঝেই কাকিমা বলতেন, একটু চুপ কর তো। ওরা গল্প করতে এসেছে, তোমার কথা শুনতে আসেনি। এখন ওঁকে বাধা দেবার কেউ আর নেই। দিনুকাকার গল্পের এক ফাঁকে একেনবাবু চুপি চুপি চুপি বললেন, "সত্যি স্যার, আপনার কাকার নলেজের তুলনা নেই। ওশন অফ নলেজ!"

কথাটা ভুল নয়, দিনুকাকা খবর প্রচুর রাখেন — বিশেষ করে টেকনোলজির খবর। আমরা আসায় গল্পে ছেদ পড়ল। কফিতে চুমুক দিয়ে দিনুকাকা একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা এদিকে আসা হল কেন ডিটেকটিভ মশাইয়ের?"

"এসেছি স্যার এক বাঙালি ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর করতে।"

"কে অজয় দত্ত?"

"আপনি চেনেন স্যার?" একেনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"এ অঞ্চলে ক'জন বাঙালি আছে? না, সেটা ঠিক কথা নয়। এখন অনেকেই আছে। কিন্তু অজয়কে ভালো করেই চিনতাম। কী স্যাড ব্যাপার বল তো? কয়েক মাস আগেও ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দ্য পুওর ফেলো।"

"তুমি কী করে চিনলে ওকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আরে সে এক কাহিনি। আমার অফিসে আই টি গ্রুপে সুব্রত বলে একটি ছেলে কনট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত। সুব্রতই নিয়ে এসেছিল একদিন আমাদের বাড়িতে ওর বন্ধুকে। দু'টি একেবারে মানিকজোড়। দেখলে মনে হয় পিঠোপিঠি ভাই। তারপর বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। গত বছর, দীপা তখনও বেঁচে- ওকে নিয়ে একদিন বার্গার হাউসে খেতে গিয়ে দেখি অজয় সেখানে ম্যানেজারের কাজ করছে।"

কেয়া একেনবাবুকে বলল, "দীপা আমার মায়ের নাম।"

"ও হ্যাঁ, তুমি তো সেটা জান না।"

"আমি বুঝেছি স্যার, আপনি বলুন।"

"কথায় কথায় অজয়ের কাছ থেকে জানলাম আগে যেখানে কাজ করত সেখানকার চাকরি যায়। তার ওপর সুব্রত আর ও যেখানে থাকত — কী সব ঝামেলার জন্যে সে জায়গাটা ছাড়তে হয়! সুব্রতর আই বি এম- এর কন্ট্রাক্ট তখন শেষ হবার মুখে। ও নিউ ইয়র্ক শহরে একটা কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে। এদিকে অজয়ের চাকরি নেই, থাকার জায়গা নেই — বেশ ঝামেলার মধ্যে গেছে বেচারা। একটা ট্রান্সলেশন এজেন্সির হয়ে কিছু কাজ করত। তবে তাতে আর কতটুকু টাকা। লাকিলি এই বার্গার হাউসের মালিক ওর কলেজের এক বন্ধু। সে নতুন একটা ব্রাঞ্চ খোলায়, ও সেটা ম্যানেজ করার দায়িত্ব পায়। এর পরপরই দীপা অসুস্থ হয়ে পড়ল। অজয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দীপাকে হারালাম ৮ই ফেব্রুয়ারি। খবর পেয়ে ফিউনারেলে অজয় এসেছিল। দিন পনেরো আগে একদিন সুব্রত এল — কী একটা কাজ ছিল এদিকে, আমাকে হ্যালো বলে গেল। ওর কাছ থেকেই খবর পেলাম, অজয় ভালোই আছে। তবে মা অসুস্থ বলে দেশে গেছে। একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি রাশিয়ান — এক সময়ে ওদের প্রতিবেশীও ছিল।"

"মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই নাদিয়া..."

"তুই তাকে চিনিস?"

"হ্যাঁ।"

"একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি বাপিদা!" কেয়া বলে উঠল।

"সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, গোয়েন্দা একেনবাবুকে কর?"

"জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে বলি," একেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে কেয়া বলল। "আপনার কথা কিন্তু আমি অনেক শুনেছি। বিশেষ করে মুনস্টোন মিস্ট্রির কাহিনি তো সবাই জানে। বাপিদাও তো কয়েকটা বই লিখেছে আপনাকে নিয়ে। সত্যি কী ভাল যে লাগছে!

"কী যে বলেন ম্যাডাম!"

"ওকে আবার ম্যাডাম বলছ কেন?" দিনুকাকা বললেন।

"আচ্ছা স্যার ম্যাডাম বলব না। মিস কেয়াদেবী।"

কেয়া কপট রাগ দেখিয়ে বলল, "আমি দেবি ফেবি নই। আর 'মিস' ও নয়। শুধু কেয়া।"

"কী মুশকিল!"

আমি বললাম, "কেয়া ছেড়ে দে, উনি স্যার বা ম্যাডাম ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন না।"

"আপনি বউদিকে কী বলে ডাকেন? ম্যাডাম?" কেয়া প্রশ্ন করল।

"কী যে বলেন, উনি তো ফ্যামিলি!"

"আর আমি বুঝি আপনার বোন নই?"

"এরকম ভাবে বললে তো স্যার," করুণভাবে দিনুকাকার দিকে তাকালেন একেনবাবু। "...আচ্ছা, ঠিক আছে শুধু কেয়া।"

আমি কেয়াকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম, "একমাত্র তুই-ই পারলি। আমি তো এখনও 'স্যার'।

"তার কারণ তুমি মানুষকে আপন করতে জানো না! থাক ওসব কথা।" তারপর একেনবাবুকে বলল, "তুমি আমার একেনদা, বাবু-টাবু নয়। আর 'আপনি' 'আপনি' নয়,

শুধু 'তুমি'। বোনকে কেউ 'আপনি' ডাকে?"

"বেশ," একেনবাবু হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়লেন।

"এবার রহস্যটা বল।"

"আসলে ম্যাডা... মানে কেয়া। এই নাদিয়ার সঙ্গে আমার গতকাল দেখা হয়েছে। উনি দুটো ডিস্টার্বিং ই-মেল পেয়েছেন — একই ই-মেল, কিন্তু দু'বার। বক্তব্য হল, নাদিয়াকে ছাড়ো, অথবা মৃত্যু। বাংলাটা আড়ষ্ট। মনে হচ্ছে যে লিখেছে সে বাংলা ভালো জানে না, অথবা ভান করছে না জানার। দুটোই ওঁর স্বামী এজেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তারপর এই মার্ডার।"

"ইন্টারেস্টিং। তোমাদের কাছে ই-মেলটা আছে?"

"তুইও কি গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি!" আমি ঠাট্টা করলাম।

"কেন তুমি করতে পারলে আমি পারব না!"

"এই তো এখানে।" একেনবাবু পকেট থেকে ই-মেলের একটা কাগজ বার করলেন।

কেয়া পড়ে বলল, "বাংলাটা তো মনে হচ্ছে খুব একটা শুদ্ধ নয়।"

"তুই এখনও বাংলা পড়তে পারিস?"

"বাপিদা! এখনও আমি সময় পেলে রবীন্দ্রনাথ পড়ি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখ, কী দেখবি।"

"বাংলায় কিছু লিখেছে বলেই যে বাংলা জানতে হবে তার কোনো মানে নেই, বলতে বলতে কেয়া আই- ফোনটা বার করল। তারপর কোত্থেকে একটা বাংলা অ্যাপস ডাউনলোড করে লিখল 'শেষ সতর্কবার্তা'Nadiya ত্যাগ করা আবশ্যক অথবা মৃত্যু'। তারপর একটু খুটখুট করে বলল, "গুগল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করলে এই বাংলাটার ইংরেজি হয় Last warning-Nadiya must leave or Death।

"গুগল ট্র্যান্সলেটর কি?"একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আমি ট্র্যান্সলেটর সফটওয়্যার কী সেটা বললাম। "কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে অনুবাদ করা। ওদের গুগল কোম্পানি একটা অনুবাদের সফটওয়্যার করেছে– সেই সাইটে ঢুকে আপনি ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় কিছু লিখে, আরেকটা ভাষায় তার অনুবাদ করে ফেলতে পারেন।"

"অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং। আগেও এটা শুনেছি। এখন চোখের সামনে দেখছি! কিন্তু যেমন বাংলা, তেমনই তো দেখছি ইংরেজি। দুটোই অশুদ্ধ।"

"মনে হচ্ছে যে লিখেছে, সে কোনোটাই জানে না।" আমি বললাম।

কেয়া একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "সেটা একটা সম্ভাবনা।"

"আচ্ছা এরকম ধরণের আর কোনো সফটওয়্যার কি বাজারে আছে?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, আরও দু'-একটা আছে, তবে তাতে বাংলা আছে কি না জানি না।" আর কিছু না বলে কেয়া বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

একেনবাবু দিনুকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন,"আপনার মেয়ে একজন জিনিয়াস স্যার! কী রকম চট করে বলে দিলেন, যে ই-মেল লিখেছে তার বাংলা না জানলেও চলবে!"

দিনুকাকুর মুখে কন্যাগর্বে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি। "মেয়েটার মাথা বরাবরই খুব সাফ। শুধু বিয়েতেই আপত্তি!"

আমি বললাম, “আচ্ছা দিনুকাকা, তুমি আর মা কি এক স্কুলে পড়েছ, দু’জনের মুখেই খালি এক কথা — বিয়ে বিয়ে।”

“শুনছ একেন,” দিনুকাকা একেনবাবুকে সাক্ষী মানলেন, “ছেলেপুলেরা বিয়ে না করলে বাপ-মায়ের চিন্তা হয় না!”

“তা তো বটেই,স্যার।”

“দেখ তো কোনো ভালো যদি কাউকে পাও। শুধু রিসার্চ নিয়ে পড়ে থাকলে তো হবে না! বাপিকে বলে তো কোনো লাভ নেই। ওকে কে দেখে তারই ঠিক নেই।”

আমার বিরক্তি লাগতে শুরু করেছে — এর থেকে টেকনোলজির জ্ঞান শোনা ভাল। তবে বেশিক্ষণ এটা চলল না। কেয়া এক গাল হাসি নিয়ে ফিরল।

“যা ভেবেছিলাম তাই, বাংলা ট্রান্সলেশনটা পুরোনো কোনো একটা ভার্সন থেকে করা। ফিলকে ফোন করতেই, ও চেক করে বলে দিল।”

দিনুকাকা জিজ্ঞেস করলেন,“ফিল কে রে, তোর বন্ধু?” দিনুকাকার ইন্টারেস্ট অন্যদিকে।

“না। জাস্ট এ কলিগ বাবা — তার বেশি কিছু ভাবতে যেও না।” বিরক্ত হয়ে কেয়া বলল।

আমি বললাম, “কী বলতে চাচ্ছিলি বল?”

“হ্যাঁ, যেটা জানলাম, সেটা হল বছরদুই আগের একটা ভার্সনে এই বাংলাটাকে ইংরেজি করলে হতো,Last warning - must leave Nadiya or Death।

“সেটাকে এখন বাংলায় ট্রানস্লেট করলে কি হত?”

কেয়া আবার আই-ফোনে গিয়ে ট্রানস্লেট করল।

“এখন হবে -‘শেষবার বলছি Nadiya ত্যাগ করতে হবে বা মৃত্যু’।”

“ভাস্ট ইমপ্রুভমেন্ট।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং!”একেনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

কেয়া বলল, “আসলে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা টুকরো টুকরো শব্দগুচ্ছ ম্যাচ করে অনুবাদগুলো করা হয়। সুতরাং সময়ের সঙ্গে এগুলো পালটাতে থাকে।”

“সত্যি স্যার।” আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন। “বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু আমরা জানি! ভাগ্যিস ম্যাডাম, মানে আমাদের কেয়াদিদি ছিল।”

“তাহলে একেনদা, আমিও এখন থেকে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তো?”

“আরে কী আশ্চর্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট কেন? আমরা সবাই রাজা।”

কিছুক্ষণ এরকম হাসিঠাট্টা চলার পর একেনবাবু দিনুকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন,“আচ্ছা স্যার, আপনি কি এখানকার পুলিশ চিফ, টিম হোরেকে চেনেন?”

“হ্যাঁ, আমরা দু’জনেই চিনি,” বলে দিনুকাকা কেয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

কেয়া বলল, “টিম হোরে হচ্ছে, তিমির হোড়। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। স্কুলে সবাই খ্যাপাত বলে হোড়টা হোরে করেছে। টিমির থেকে টিম হয়েছে।”

আমি বললাম,“তুই যখন এত চিনিস, আমাদের নিয়ে চল না।”

“বেশ চলো, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমার একটা কনফারেন্স কল আছে।”

“বাড়িতে এসেও অফিসের কাজ করছিস?”

“বেড়াতে তো আসিনি, টেলিকমিউট করছি। বাবা এত একা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই আসি। কয়েকদিন থাকি, টেলিকমিউট করি বলে ছুটি নিতে হয় না।”

।। ৮।।

টিম হোরে বা তিমির হোড় কেয়াকে দেখেই হইহই করে উঠল। মিডল স্কুল থেকে বন্ধু। কেয়া এদেশে এসেছে তেরো বছর বয়সে, কিন্তু তিমিরের জন্ম এদেশেই।

কেয়া বাংলাতেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

চমৎকার বাংলা বলে তিমির। সেটা বলাতে বলল,"না বলে উপায় আছে। বাবা-মা কেউই বাড়িতে ইংরেজিতে কথা বললে উত্তর দিত না। বাড়িতে সবসময়ই বাংলা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত। ইংরেজি অক্ষর চেনার আগে বাংলা অ-আ-ক- খ চিনেছি।"

"অ্যামেজিং স্যার, ট্রুলি অ্যামেজিং। দেশে এখন তার উলটো!"একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন।

আমি তিমিরকে বললাম,"আপনি কিন্তু একেনবাবুর 'স্যার'-টা ইগনোর করবেন,ওটা বারণ করেও থামাতে পারবেন না।"

তিমির কথাটা শুনে হেসে ফেলল। তারপর একেনবাবুকে বলল, "আপনার প্রশংসা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছে এত শুনেছি, যখন শুনলাম আপনি আসছেন- আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড। সত্যি, ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু মিট ইউ।"

"কী যে বলেন স্যার, " একেনবাবু লজ্জা পেলেন।

"আপনি জানেন কি না জানি না, আপনার 'মুনস্টোন মিস্ট্রি'র কেসটা এখন নিউ ইয়র্কের পুলিশ অ্যাকাডেমিতে পড়ানো হয়।"

"তাই নাকি!" আমি অবাক হয়ে বললাম। একেনবাবুর লজ্জা লজ্জা মুখ দেখে বুঝলাম উনি বোধহয় সেটা জানেন।

"আমিও ওই কেস-হিস্ট্রিটা পড়েছি। ব্রিলিয়ান্ট অ্যানালিসিস আর সাবসিকোয়েন্ট ডিডাকশন।"

"আমার একার কৃতিত্ব নয় স্যার, বাপিবাবু আর প্রমথবাবুও ছিলেন আমার সঙ্গে।"

"মাই গুডনেস, সেটা তো আমি জানতাম না। আর কেয়া, তুমি যে এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের চেনো এতদিন আমাকে বলনি কেন!"

"আমার কতগুলো সিক্রেটের মধ্যে এটা একটা।"কেয়ার মুখে দুষ্টু হাসি।

"এবার আসল কথায় আসি স্যার, আমরা এসেছি অজয় দত্তের মার্ডারের ব্যাপারে কিছু জানতে।"

তিমির গম্ভীরভাবে বললেন, "অফিশিয়ালি, নো কমেন্ট। কিন্তু আপনারা এসেছেন স্টুয়ার্ট সাহেবের কাছ থেকে, তার থেকেও বড় কথা কেয়া নিয়ে এসেছে, সুতরাং কিছু তো বলতেই হবে....তবে সব কিছুই বলব আন- অফিশিয়ালি।"

"ঠিক আছে স্যার, আমরাও আন- অফিশিয়ালি আপনাকে সাহায্য করব।"

"বেশ, এবার বলুন কী জানতে চান।"

"অজয়বাবু কখন কোথায় এবং কীভাবে খুন হন? এছাড়া আর যা মনে হয় আমাদের কাজে লাগতে পারে — সেগুলোও স্যার বলুন।"

"খুন হয়েছিলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। রোববার সম্ভবত রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ। বডিটা পুলিশের চোখে পড়েছিল রাত দেড়টাতে রাউন্ড দিতে গিয়ে। একেবারে সামনে থেকে কেউ গুলি করেছিল। হি ওয়াজ ডেড অন দ্য স্পট।

এছাড়া দেখি আর কী কী ইনফরমেশন আপনার কাজে লাগতে পারে....। হ্যাঁ, অজয়

দত্ত 'বার্গার হাউস' বলে একটা ফাস্টফুড রেস্টুরেন্টে ম্যানেজার ছিলেন। মায়ের অসুখ বলে দেশে গিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে ছুটি এক্সটেন্ড করিয়েছিলেন বিয়ে করবেন বলে। যেদিন মারা যান সেদিনই দুপুরবেলা ফিরেছিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা দোকানে। এগুলো সব কনফার্মড দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে। দোকান বন্ধ হয়েছিল রাত সাড়ে এগারোটায়। দোকান বন্ধ করে বেরোতে বেরোতে প্রায় রাত বারোটা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে নিজের গাড়ি ছিল না। দোকানের যে ছেলেটি ওকে রাইড দিয়েছিল, তার তার বাড়ি ছিল দোকান থেকে মাইল দশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায়। সেখান থেকে অজয় দত্তের বাড়ি হাঁটা পথে মিনিট পাঁচেক। অজয় দত্তকে যে খুন করে সে মনে হয় জানত ওই সময় অজয় দত্ত আসবেন। দরজার কাছে আসতেই দুটো গুলি।"

"অ্যাপার্টমেন্টের আর কেউ সেটা টের পায়নি।"

" যে ছেলেটি রাইড দিয়েছিল......"

"সে ক্লিয়ার। তার কোনো মোটিভ নেই। অপরচুনিটিও ছিল না। ছেলেটার বাড়িটা তো বলেছি একেবারে মোড়ের ওপরে। ওর মা জেগেছিলেন। বারোটা পঁচিশেই সে ঘরে ঢুকেছে।"

"বুঝলাম স্যার।"

"তবে দুটো জিনিস আমাকে ভাবাচ্ছে।"

"সেগুলো কী স্যার?"

"এক নম্বর, রবিবার অজয় দত্ত দেশ থেকে ফিরেই আমাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, কী একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। সে ব্যাপারটা কী, আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু মনে হয় ব্যাপারটা ইম্পট্যান্ট, নইলে দেশ থেকে ফিরেই যোগাযোগ করতে চাইবেন কেন? দু'নম্বর হল, অজয় দত্ত দোকানের মালিককে বিয়ে করার নাম করে ছুটি বাড়ালেও উনি নাকি একটি রাশিয়ান বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে দেশে গিয়েছিলেন। খবরটা ঠিক, নেভাডাতে কাল রাত্রেই খোঁজ নিয়ে জেনেছি। প্রশ্ন হল, এ দুটোর মধ্যে কোনো কানেকশন আছে কি না!"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।"

"যাই হোক, সেই রাশিয়ান মহিলাকে আমরা আজ সকালে কনট্যাক্ট করেছি। শি ইজ শকড। মনে হল এমন কিছু একটা শঙ্কা করছিলেন।

"ওঁর নাম নাদিয়া," আমি বললাম।

"আপনারা তাঁকে চেনেন?" টিম জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের নেইবার।"

"উনি নাকি দুটো থ্রেটনিং ই-মেল পেয়েছিলেন। তার কপিও আমরা সকালে পেয়েছি। কে ওটা পাঠিয়েছে ওঁর কোনো ধারণাই নেই। একটা নাম আমরা পেয়েছি যে ওঁকে বহুবার বিয়ে করতে চেয়েছিল। লোকটা এখানকার একটা মোটরবাইক গ্যাং- এর মেম্বার। গ্যাংটা রেসিস্ট। একটা সাদা মেয়ে ওকে বিয়ে না করে একটা বাদামি চামড়াকে বিয়ে করেছে, তার পক্ষে এ ধরনের বার্তা পাঠানো অসম্ভব নয়!"

"কোথায় থাকেন স্যার এই লোকটি?"

"দলের সবাই উডস্টকের কাছাকাছি থাকে। ইন ফ্যাক্ট, নাদিয়ার আগের স্বামীও ওই রেসিস্ট গ্যাং- এর মেম্বার ছিল। এখন আমাকে বার করতে হবে, এই লোকটার কোনো অ্যালিবাই আছে কি না।"

"একটা কথা স্যার, ম্যাডাম নাদিয়ার প্রথম স্বামী মারা যান কীভাবে?"

"সেও আরেকটা ব্যাপার। পয়েজনাস মাশরুম খেয়ে। ওঁর স্বামী যার নাম ছিল অলিভার, সে এমনিতে ছিল অটো-মেকানিক। কিন্তু সময় পেলেই জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে মাশরুম সংগ্রহ করত। এদিক ওদিক কয়েকটা রেস্টুরেন্টে বিক্রিও নাকি করত। হয়ত বাছতে ভুল করেছিল। কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ আছে।"

"কেন স্যার?"

"হয়ত জেনেশুনেই বিষাক্ত মাশরুম খেয়েছিল। কারণ 'ডেস্ট্রয়িং এঞ্জেল' মাশরুমকে চিনতে না পারা, যারা মাশরুম সংগ্রহ করে, তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। সুতরাং ডেথটা হয়তো অ্যাকসিডেন্ট নয়, সম্ভবত সুইসাইড।"

"খুন বলে মনে হয়নি স্যার আপনাদের?"

"ওই কেসটাতে আমি ছিলাম না। ধরে নিচ্ছি, সেটা সন্দেহ করার বিশেষ কোনো কারণ পাওয়া যায়নি। তবে এও বলি — আগে যিনি চিফ ছিলেন, তিনি ওই দলটাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। সব ক'টা মরলেই বোধহয় খুশি হতেন.....জাস্ট কিডিং!"

"বুঝলাম স্যার। আর একটা প্রশ্ন স্যার, অ্যাকসিডেন্ট না হয়ে সুইসাইড হলে তো ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সুবিধা — তাই না?"

"এক্ষেত্রে নয়। অলিভার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছিল মারা যাবার বছর পাঁচেক আগে। সুতরাং সুইসাইড ক্লজটা অ্যাপ্লিকেব্ল হবে না।"

"তাহলে তো চুকেই গেল স্যার। আচ্ছা স্যার, আরও একটা কথা, অজয় দত্ত ওঁর স্ত্রীর কাছে ম্যানহাটানে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?"

"সেটাই আমার কাছে রহস্য। তবে এরকম দু'-একটা কেস আমি দেখেছি। এখানে বিয়ে করে দেশে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আবার বিয়ে করা। হয় বাবা-মা'র চাপে পড়ে বা মেয়ের বাড়ি থেকে অনেক টাকা-কড়ি পাওয়ার লোভে। তারপর এখানকার পাট চুকিয়ে দেশে ভ্যানিশ হওয়া। আবার অন্যটাও হয়।"

"স্কাউন্ড্রেল!" কেয়া ভীষণ রেগে বলল।

"আই এগ্রি।"

"অজয়বাবুর একজন বন্ধু ছিলেন সুব্রত বলে, তিনি হয়তো স্যার এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন।"

"তার খবর আমরা পেয়েছি, উনি এখন নিউ ইয়র্কে একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন। আজ সকালেই ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনিও খবরটা শুনে ভীষণ আপসেট। নাদিয়া আর এজের সঙ্গে উনিও নেভোডাতে গিয়েছিলেন। নাদিয়ার প্রথম স্বামী অলিভার ও তাদের বন্ধুদেরও উনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। ওদের ভয়েই উনি আর এজে উডস্টক ছেড়ে কিংস্টনের দিকে চলে আসেন। ওদের তল্লাটে কেন বাদামি চামড়া ঢুকেছিল — তাতেই ওদের রাগ! রাত্রে বাড়ির সামনে এসে বিয়ারের বোতল ভেঙে রাখত, টেলিফোনে গালিগালাজ করত, অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে ই-মেল পাঠাত! পুলিশে জানিয়ে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। যেদিন ওদের বাড়ির সামনে একটা পেট্রলের ক্যান জ্বালাল, সেদিনই ভয় পেয়ে ওরা দু'জন ঠিক করেন বাড়ি ছাড়বেন। এখন বুঝতে পারছেন, কেন আগের চিফ ওদের এত অপছন্দ করত।"

"এরকম এখনও এদেশে হয় স্যার?"

"নিশ্চয়ই কোনো কোনো জায়গায় হয়। আমি ভাবিনি এদিকে হতে পারে বলে। কল্পনা করতে পারেন, ছয়ের দশকে এটা ছিল হিপিদের স্বর্গ! বাবা- মায়ের কাছে শুনেছি জোন বায়াজ, জ্যানিস জপলিন, জিমি হেন্ড্রিক্স- এঁরা সব এখানে গান গেয়ে গেছেন! যাই হোক,

এগুলো কয়েক বছর আগের ব্যাপার। এখন এই গ্যাং একেবারেই ঠান্ডা।”

“সুব্রতবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত।”

“সুব্রত কাল নাদিয়াকে নিয়ে এখানে এজের ফিউনারেল অ্যারেঞ্জ করতে আসবেন। আজকেই চলে আসতেন, কিন্তু ওঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। মনে হল ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড- দু’দিন আগে ডিলারকে দিয়ে গাড়ি সার্ভিস করিয়েছেন, দু’দিনের মধ্যে গাড়ি অচল! আবার পাঠাতে হয়েছে ডিলারের কাছে।”

“কী গাড়ি ওঁর?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমিও একই প্রশ্ন করেছিলাম। গাড়িটা তো খারাপ না — হন্ডা অ্যাকর্ড। খারাপ হচ্ছে ডিলারের সার্ভিস!”

“কবে ফিউনারেল হচ্ছে স্যার?”

“আমার কোনো ধারণাই নেই। ধরে নিচ্ছি দু’-এক দিনের মধ্যে। ইন্ডিয়ার কনস্যুলেটেও যোগাযোগ করেছি।”

আর বিশেষ কিছু জানার ছিল না। তিমিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা কেয়াকে বাড়িতে নামিয়ে দিলাম। ওর ফোন কলের সময় হয়ে গেছে। তবে ও নামার আগে বার্গার হাউসের ডিরেকশনটা নিয়ে নিলাম।

।। ৯।।

বার্গার হাউসের মালিক দিলীপ শর্মা নিজেই এখন দোকানটাকে ম্যানেজ করছেন। ভেতরে অফিস ঘরে বসেছিলেন। দেখেই বুঝলাম খুবই স্ট্রেসের মধ্যে আছেন। একেনবাবুর পরিচয় দিতেই উনি চিনতে পারলেন। এখন ইস্ট কোস্টে একেনবাবুর নাম অনেকেই শুনেছেন। বললাম, “আমরা পুলিশ চিফ টিম হোড়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। একেনবাবু প্রাইভেটলি এই ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান করবেন।”

দিলীপ শর্মা বললেন,“আমি ব্যাপারটা সম্পর্কে অল্পই জানি। যা জানি সবই পুলিশকে জানিয়েছি। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন, এরকম একটা ভালো লোককে কে এভাবে খুন করল!”

“জানি স্যার,”এবার একেনবাবু বললেন। “সেটাই আমাদের বের করতে হবে। আপনি শুধু আমাকে বলুন, অজয়বাবু কি দেশে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন?”

“না, গিয়েছিল মায়ের অসুখের খবর শুনে। দু’সপ্তাহের জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু দশ দিনের মাথায় ফোন করে আরও দু’সপ্তাহের ছুটি নিল। বলল, মা চাপ দিচ্ছে বিয়ে করে যাবার জন্যে। এরপর দু’-একটা ই-মেল পেয়েছি, ফোন পাইনি। মা’র মৃত্যুর খবরটা ই-মেলেই পেয়েছি।”

“বিয়ের খবর?”

“না, সেটা পাইনি। ধরে নিচ্ছি হয়েছে, মাতৃশোকে হয়তো আমাকে আর জানায়নি। আর এসে তো আমার সঙ্গে ঠিকমতো দেখাও হয়নি, যেদিন এল সেদিনই মারা গেল!”

“ওঁর সঙ্গে কারও কোনো সমস্যার কথা জানতেন কি?”

"না, সেরকম তো কিছু শুনিনি। আগে যেখানে থাকত সেখানে কিছু ঝামেলা হয়েছিল।"

"কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত দেখেননি স্যার?"

"চাকরি চলে যাওয়ায় চিন্তিত ছিল টাকাকড়ি নিয়ে। তারপর তো এখানে চাকরি নিল। হইহই করে বন্ধুদের সঙ্গে তো গাড়ি নিয়ে ক্রস কান্ট্রি করতে গেল। তবে বন্ধুদের সঙ্গে মনে হয় এবার একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল।"

"কীরকম স্যার?"

"সেটা বলেনি। আমার চেনাজানা ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে যখন ওর টিকিটটা বুক করছিলাম, তখনই যেটুকু কথা হয়েছিল। একটু গুম হয়েই ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম মাকে নিয়ে দুর্ভাবনা করছে। পরে হঠাৎ বলল, 'দিলীপ, মানুষকে চেনা খুব কঠিন ব্যাপার।' বুঝলাম অন্য কিছু, কিন্তু মায়ের অসুখ— দেশে যাচ্ছে, আমিও আর ও নিয়ে পীড়াপীড়ি করিনি।"

"দেশ থেকে ফিরে আসার পর আপনার সঙ্গে কথা হয়নি?"

"ও দোকানে আসতে না আসতেই আমাকে একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। কথা হবার মধ্যে ও বলেছিল, সোমবার ওর আসতে দেরি হবে। ওর ড্রাইভার লাইসেন্সটা খুঁজে পাচ্ছে না, সেটা করিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করে তারপর আসবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর রাইড লাগবে কি না। বলেছিল, না। আর কোনো কথা হয়নি।"

"কার সঙ্গে দেখা করবেন, কিছু বলেছিলেন স্যার?"

"না, আমি জিজ্ঞেসও করিনি... তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছি তখন।"

"উনি যে বেড়াতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন — সেটা নিয়ে আপনাকে কিছু বলেননি?"

"তাই নাকি, এটা তো জানতাম না! তাহলে কি সেটা নিয়েই চিন্তা করছিল? স্ত্রীকে নিয়ে কোনো সমস্যা?"

"আপনার সঙ্গে স্যার সুব্রতবাবুর দেখা হয় না?"

"অনেকদিন হয়নি। এখন তো আর এখানে থাকে না। মধ্যে মাঝে মাঝে কথা হয়েছে ফোনে। অজয় পয়লা আসছে শুনে বলল এসে একবার দেখা করে যাবে। অজয়ের ইনকাম ট্যাক্সের কাজগুলো সুব্রতই বরাবর করে দেয়। ১৫ তারিখে তো সেটা করার লাস্ট ডেট।"

দিলীপ শর্মার দোকান থেকে আমরা দিনুকাকার বাড়িতে ফিরে এলাম। লাঞ্চ না খেয়ে গেলে কেয়া আমাদেরই খুন করবে। ঘরে ঢুকে দেখি দিনুকাকা এক সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাদের দেখা মাত্র বললেন, "এসো এসো তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হল আমার বহুদিনের বন্ধু জ্যাক মিশকা। জ্যাক বোধহয় কিংস্টনের সবার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছে।"

"কাম অন ডিনু!" জ্যাক থামিয়ে দিল।

"এ হচ্ছে আমার ভাইপো। নিউ ইয়র্ক ইউনিভারসিটির একজন বিরাট অধ্যাপক। আর ইনি হলেন বিখ্যাত ডিটেকটিভ মিস্টার একেন্দ্র সেন।"

বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা দিনুকাকার স্বভাব।

"প্লিজড টু মিট ইউ।" জ্যাক উঠে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "আপনারা গল্প করুন, আমার কাজ শেষ। ডিনু তাহলে ওই কথাই রইল। আমার মনে হয় না এতে অসুবিধা হবে বলে। চলি।"

"ও হ্যাঁ, একটা ভালো কথা। ওরা এসেছিল, তাই মনে পড়ে গেল,... এজের খবর

জানো তো?”

“এভরিবডি নোজ। হোয়াট এ ট্র্যাজেডি।”

“এজেও তোমার ক্লায়েন্ট ছিল নাকি?”

“ইয়েস। ও, ওর বন্ধু সুব্রত — দু’জনের লাইফ ইন্সিওরেন্সই আমি করেছি। অ্যামাউন্টটা খুবই অল্প। কালকেই খবরটা শুনে দেখছিলাম। বেনিফিশিয়ারি হচ্ছেন ওর মা। সুতরাং তাঁকে এখন ক্লেইম করতে হবে।”

“তিনি স্যার মারা গেছেন,”একেনবাবু বললেন।

“তাই নাকি! ঐ যাঃ, ওরটাতে তো আবার ‘পার স্ট্রাইপস’ ক্লজ আছে” মাথা নাড়লেন, জ্যাক মিশকা।

“তার মানে?” দিনুকাকা প্রশ্ন করলেন।

“তার মানে খুঁজে বার করতে হবে ওঁর মায়ের নিকটাত্মীয় কে কে আছে। সেখানকার আইন আবার কী....হু নোজ! টাকার অ্যামাউন্ট যা — এইসব খোঁজ করতেই সেটা খরচা হয়ে যাবে।”

“ওঁর স্ত্রী কিছু পাবে না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“এজে-র স্ত্রী আছে নাকি?”

“উনি বিয়ে করে দেশে গেছেন।”

“এমনিতে কিছুই পেতেন না, কিন্তু এটা তো কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। তবে পান বা না পান — টাকার দিক থেকে শি উইল নট মিস মাচ।”

ইতিমধ্যে দেখি একেনবাবু রান্নাঘরে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই কেয়ার সঙ্গে কথা বলতে। দিনুকাকা আমার সঙ্গে গল্প জুড়লেন।

বিকেল চারটেতে আমরা বাড়ি ফিরলাম। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কেয়ার ফোন। আমার সঙ্গে নয়, একেনদার সঙ্গে ওর দরকার।

“বাঁদর মেয়ে!” বলে একেনবাবুকে ফোন দিলাম।

একেনবাবু দেখলাম খুব ‘থ্যাঙ্ক ইউ দিদি’, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দিদি’ করছেন।

ফোন শেষ হলে সোফায় গা এলিয়ে বসে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, “আচ্ছা স্যার, অজয়বাবু কিসের জন্য এত দুশ্চিন্তা করছিলেন বলে আপনার মনে হয়? মায়ের অসুস্থতার জন্য তো নয়।”

“এগ্রি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, এই বিয়ের খবরটা মাকে কী করে দেবেন সেই নিয়েই। আমাদের দেশের বাবা- মায়েদের ব্যাপার তো জানেন! একে বিদেশিনী, তার ওপর বিধবা। শুধু তাই নয়, একটা বাচ্চা আছে। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ! কিন্তু ‘মানুষকে চেনা কঠিন ব্যাপার” কথাটার অর্থ মনে হয় দিলীপ শর্মাই ঠিক ধরেছেন। হয়ত বিয়ের পর নাদিয়ার কোনও সিক্রেট জেনে ফেলেছেন।”

“সেই জন্যেই এসে নাদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, ভেরি গুড স্যার।”

চুপ করে আবার একটু পা নাচালেন, “যাই বলুন স্যার, কেয়াদিদি কিন্তু দুর্ধর্ষ।”

“কী ব্যাপার বলুন তো? কী এমন সংবাদ দিল আপনাকে?”

“ছোট বোন বলে নেগলেক্ট করবেন না স্যার। অসাধারণ বুদ্ধিমতী আমাদের দিদি।”

“তা তো বুঝলাম, কিন্তু ঠিক কী ভাবছেন একটু বলবেন?”

“বলার কিছু নেই স্যার। শুধু ভাবছি, পরশু কি আপনি খুব ব্যস্ত?”

“না পরশু আমার কোনো ক্লাস নেই।”

“তাহলে চলুন না, আরেকবার কিংস্টন যাই।”

“সে কী! এই তো ঘুরে এলাম!”
“কিন্তু সমস্যাটা এখনও তো মিটল না।”

।। ১০ ।।

দিনুকাকার বাড়িতে গিয়ে দেখি কেয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বলল, “বাবা একটু টায়ার্ড, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।”
“কোথায়?”
“তিমিরের অফিসে।”
“দিলীপবাবু স্যাম গ্রোভারের ব্যাপারটা জানেন কি?” একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।
“আমি বলে দিয়েছি,” কেয়া বলল, “এখন জানেন।”
“আচ্ছা ব্যাপারটা কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।
“আহ, চলো না দেখবে।”

তিমিরের অফিসে পৌঁছে আমি পুরো সারপ্রাইজড্। ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তাদের সবাইকে চিনি। শুধু একজনকে ছাড়া। লম্বা দোহারা চেহারা, স্পোর্টস জ্যাকেট, চোখে চশমা। নাদিয়ার পাশে বসে আছেন, নিশ্চয়ই সুব্রত।
“আসুন, আসুন,” বলে তিমির আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। “অন্যদের আপনারা বোধহয় চেনেন,” বলে সুব্রতর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।
“মিস্টার দত্তের ফিউনারেলের ব্যাপারে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম। দু’-একটা ফর্মালিটির ব্যাপার তো আছে, সেই নিয়েই আলোচনা।”
“ভালোই হল স্যার, এখানেই সবাইকে পেলাম। আমারও দু’-একটা কনফিউশন আছে। এঁরা যখন আছেন, সেগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারব।”
“কীসের কনফিউশন বলুন তো?” তিমির জিজ্ঞাসা করলেন।
“আমি খালি স্যার চিন্তা করছি, খুনটা করে লাভ কার হল?”
“তার মানে?” প্রশ্নটা করলেন দিলীপ শর্মা।
“অজয়বাবুর বহু টাকা থাকলে নাদিয়া ম্যাডামকে সন্দেহ করা যেত। কিন্তু তা তো ছিল না — তাই না?”
“যদ্দুর জানি, না।” দিলীপবাবুই সবার হয়ে উত্তর দিলেন।
“খুব বড় রকমের লাইফ ইন্সিওরেন্সও ছিল না, সুতরাং সেখান থেকেও তেমন কোনো প্রাপ্তি নেই।” নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে খানিকটা আত্মগত হয়েই কথাটা বললেন একেনবাবু।
প্রথমেই নাদিয়ার নাম ওঠায়, নাদিয়ার মুখে একটা ছায়া দেখছিলাম, সেটা চলে গেল।
“এখন স্যাম গ্রোভার নাদিয়া ম্যাডামের প্রেমে পাগল ছিলেন। নাদিয়া ম্যাডাম ওঁকে বিয়ে না করে বাদামি চামড়ার অজয়বাবুকে বিয়ে করে বসলেন! তার জন্যে কি স্যাম গ্রোভার অজয়বাবুকে খুন করতে পারেন স্যার?” এবার দিলীপ শর্মার দিকে তাকালেন

একেনবাবু।

"এরকম তো মাঝে মাঝে হয়।" দিলীপবাবু একটু থতমত খেয়েই বললেন।

"ঠিক। কিন্তু স্যাম গ্রোভার তো জানতেন না যে, নাদিয় ম্যাডাম অজয়বাবুকে বিয়ে করেছেন।"

"তাহলে ই-মেলটা কে পাঠাল? আর বিয়ের প্রশ্ন আসছে কেন, প্রেমিককেও তো মানুষ খুন করে।" এবার সুব্রতবাবু মুখ খুললেন।

"ট্রু স্যার, ট্রু। আবার বন্ধুকেও মানুষ খুন করে। মানছি, ই-মেলটা একটা পাজল স্যার। প্রথমে ভেবেছিলাম, স্রেফ মজা করার জন্যে! কিন্তু না, তা ঠিক নয়।"

"তাহলে?" সুব্রত প্রশ্ন করলেন।

"আপনি যখন প্রশ্নটা তুললেন স্যার, তখন বলেই দিই। অজয়বাবুকে খুন করার একটাই মোটিভ হতে পারে যে উনি কোনো একটা সিক্রেট জেনে ফেলেছিলেন, যেটা খুনির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।"

হঠাৎ মনে হল ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

"কী সিক্রেট?" এবার তিমির প্রশ্নটা করলেন, কিন্তু মুখে মনে হল একটা চাপা হাসি।

"সেটায় আসছি স্যার, কিন্তু তার আগে বলি নেভাডা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে স্যার।"

"কীরকম?" তিমির জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সুব্রতবাবুকেই জিজ্ঞেস করি। উনি হয়তো বলতে পারবেন?"

"কী কনফিউশন, বলুন?"

"স্যার, নেভাডাতে ম্যাডাম নাদিয়া আর অজয়বাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আপনি হঠাৎ ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে গেলেন - সেটাই ম্যাডাম নাদিয়া আমাদের বলেছেন। সেটা কি ঠিক?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে স্যার ওঁদের বিয়ের খবরটা আপনি জানতেন না?"

"বিয়ের পর নাদিয়া ফোন করে জানিয়েছিল।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। আপনার এত বন্ধু অজয়বাবু, তিনি বিয়ে করছেন। আপনি এত কাছে আছেন — তাও আপনাকে ডাকলেন না?"

"এর উত্তর যে দিতে পারত, সে তো নেই।"

"তা ঠিক স্যার। কিন্তু আপনার কী মনে হয়?"

"আমি কী বলব বলুন।"

"আপনি বিয়ের খবরটা জানার পরেও আর ওঁকে ফোন করেননি?"

"না।"

"কেন বলুন তো?"

"বলতে পারেন আমার অভিমান হয়েছিল।"

"রাইট স্যার। কিন্তু আপনি ম্যাডাম নাদিয়াকে প্রচুর সাহায্য করেছেন বাড়ি দেখে দেওয়া, জিনিসপত্র সেখানে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে।"

"কারণ নাদিয়া আমার বন্ধু এবং অজয়ের স্ত্রী। আর অজয়ের ওপর অভিমান হলেও- সে আমার বন্ধুই ছিল।"

"অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে অজয়বাবুর মনোমালিন্য হয়নি?"

“অন্য ব্যাপার মানে?”

“এই ধরুন, আপনার কোনো একটা গোপন ব্যাপার অজয়বাবু জেনে ফেলেছেন — সে নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি।”

“হোয়াট ননসেন্স!” এবার সুব্রত সত্যিই বিরক্ত।

“ঠিক আছে স্যার, এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নয়। এবার শুধু বলুন, আপনারা কি অজয়বাবুর গাড়িতে নেভাডা গিয়েছিলেন না আপনার গাড়িতে?”

“আমার গাড়িতে।”

“তা আপনি তো স্যার ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেলেন ওঁদের দু'জনকে ফেলে!”

“না ফেলে রেখে যাইনি। আমি গাড়ির চাবি অজয়কে দিয়ে গিয়েছিলাম। যাতে ওরা সময়মতো ফিরতে পারে।”

“এটা ঠিক কাজ করেছিলেন স্যার। কিন্তু গাড়ির কথায় মনে পড়ে গেল, তিমিরবাবু বলছিলেন, আপনার গাড়ি নাকি এই ক'দিন আগে সারানোর পরে দু'দিনের মধ্যে আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল?”

“ঠিকই বলেছেন।”

“এই দু'দিন কি আপনি নানান জায়গায় ঘুরেছেন — সেইজন্য?”

“না, শুধু অফিসে গেছি আর ফিরেছি।”

“কত দূরে আপনার অফিস স্যার?”

“মিনিট কুড়ির পথ।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার।” বলে একেনবাবু তিমিরের দিকে তাকালেন, “আচ্ছা তিমিরবাবু, আপনি কি জানেন সুব্রতবাবুর গাড়িটা দু'দিনে কত মাইল চলেছে?”

“হ্যাঁ, আড়াইশো মাইলের মতো।”

আমি এবার বুঝতে পারলাম, পুরোটাই সাজানো নাটক। তিমিরের সঙ্গে আগেই একেনবাবুর এ নিয়ে কথা হয়েছে। সুব্রতও কেমন জানি থতমত খেয়ে গেল।

“তিমিরবাবু এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন স্যার। আপনি যে হন্ডা ডিলারের কাছে দু'বার নিয়ে গেছেন, তারাই বলেছে। রিপেয়ার শপে ঢোকানোর সময়ে গাড়ির মাইলেজ লিখে রাখে কিনা।”

“তা হলে নিশ্চয়ই ভুল করেছে প্রথমবার।”

“দ্বিতীয়বার নয় কেন স্যার?”

“দ্বিতীয়বারও করতে পারে।”

“না স্যার, দ্বিতীয়বার নয়। দ্বিতীয়বার করলে, এক্ষুনি ভেরিফাই করা যেত, তাই না?”

“আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বলুন তো?” এবার সুব্রত বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল।

“আপনি উত্তেজিত হবেন না স্যার, বসুন। তার আগে আর একটা কথা বলুন স্যার, আপনাকে কি বছর দুই আগে নাদিয়ার স্বামী বা স্বামীর কোনো বন্ধু ই-মেলে ভয় দেখিয়েছিলেন?”

“আমরা ও রকম অনেক ইমেলই পেয়েছি।”

“আমি শুধু আপনার কথা জিজ্ঞেস করছি। আর শুধু একটা বিশেষ ইমেল- এর কথা — যেখানে নাদিয়ার নাম উল্লেখ করা ছিল।”

আমি স্পষ্ট দেখলাম সুব্রতর চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

“আপনি এসব প্রশ্ন করার কে?”

তিমির এবার মুখ খুললেন, “ধরুন প্রশ্নটা আমিই করছি।”

"উত্তর হচ্ছে 'না'।"

উত্তরটা শুনে তিমির একেনবাবুর দিকে তাকালেন।

"আপনাকে একটা কথা বলি স্যার, আপনি যদি ই-মেলটা ডিলিটও করে থাকেন, ওটা কিন্তু পুলিশের এক্সপার্টরা হার্ড ডিস্ক থেকে বার করতে পারবে। এবং গত কয়েকদিন আপনি কীভাবে কোথায় ইমেল পাঠিয়েছেন স্বনামে বা বেনামে- সেটাও কিন্তু বার করা যাবে।"

"আমি যেখানে বা যাকেই ই-মেল পাঠাই না কেন, তাতে কী এসে যায়?"

"কারণ ওটা দিয়ে স্যার একজনকে মিথ্যে করে খুনি সাজানো হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে, যে অজয়বাবুকে খুন করেছে, সে নাদিয়া ম্যাডামের প্রেমে পাগল এবং লোকটা আবার ভাল বাংলা জানে না! এরকম একটা লোক তো আছে স্যার।"

"সেটা কেন আমি করতে যাব?"

"সেটাই আমার প্রশ্ন স্যার, আপনি কেন সেটা করতে যাবেন, কারণ ম্যাডাম নাদিয়াকে আপনি ভালবাসেন এবং ওঁকে বিয়েও করেছেন। শুধু নামটা ব্যবহার করেছেন অজয়বাবুর। কেন?"

"তার মানে! সেটা করা কি এতই সোজা?"

তিমির এবার গম্ভীরভাবে বললেন,"আইডেন্টিটি থেফট এখন আকচার হচ্ছে। বিয়েটা তো হয়েছে নেভাডাতে — সব কিছুই ওখানে একটু ঢিলেঢালা। একটা ড্রাইভার্স লাইসেন্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর।"

"রাইট স্যার। অজয়বাবুর ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনি হাতিয়েছিলেন। আপনার দু'জনের চেহারার তফাত ছবিতে চট করে ধরা পড়বে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, কী সেই সিক্রেট, যার জন্যে আপনাকে তড়িঘড়ি এসে খুন করতে হল, ম্যাডাম নাদিয়াকে এত অ্যাক্টিং করতে হল!"

"আমি এই অদ্ভুত অভিযোগের কোনো উত্তর দেব না।"

"আপনি উত্তর না দিলেও স্যার, ম্যাডাম নাদিয়া হয়তো দেবেন। তবে শুধু এটুকু বলি অজয়বাবু দেশ থেকে ফিরে খুন হবার আগে তিমিরবাবুর কাছে দু'-একটা কথা ইতিমধ্যেই বলে গেছেন অলিভারের মৃত্যু সম্পর্কে। কে সেই মাশরুমগুলো জোগাড় করেছিলেন..........।

নাদিয়া দেখি ভয় থরথর করে কাঁপার পর ফোঁপাতে শুরু করেছে! "আই ওয়ার্নড হিম নট টু....।" তারপরের কথাগুলো কান্নার মধ্যে জড়িয়ে গেল।

।। ১১ ।।

দিনুকাকার বাড়িতে ফিরে আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো, এসব রহস্য আপনি উদ্ঘাটন করলেন কখন?"

"সবই তো আমার এই কেয়াদিদির জন্যে। যে মুহূর্তে বুঝলাম বাংলা ই-মেলটা

দু'বছরের পুরনো তখনই মাথায় এল, কোথাও একটা খেলা শুরু হয়েছে। তারপর নানান সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলাম। তার মধ্যে একটা মনে হল হলেও হতে পারে। নেভাডাতে হয়তো সুব্রতবাবু নাদিয়া ম্যাডামকে বিয়ে করবেন বলেই বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা কিছু ওখানে ঘটেছিল — ওঁদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে থেকেই হোক বা অন্য কোনো সূত্র থেকে অজয়বাবু সন্দেহ করলেন অলিভারের মৃত্যুর সঙ্গে সুব্রত ও নাদিয়া জড়িত। বিষাক্ত মাশরুম হয়তো সুব্রতই জোগাড় করেছিল। এ নিয়ে নিশ্চয়ই ওঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এরমধ্যে অজয়বাবুর মায়ের অসুস্থতার খবরটা আসে। সুব্রতবাবু আর নাদিয়া ম্যাডাম চিন্তা করলেন, অজয়বাবু যদি ওঁর সন্দেহের কথা পুলিশকে জানান, আর নতুন করে ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়, তাহলে একটা ঝামেলা। অলিভারের মতো অজয়বাবুকেও সরাতে হবে। কিন্তু কী করে? প্রথম কাজ হল ওঁরা বিয়ে করবেন না, বিয়ে করলে অলিভার হত্যার অভিযোগটা জোরদার হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দেখান যায় অজয়বাবু নাদিয়া ম্যাডামকে বিয়ে করেছেন। ব্যাপারটার মোড় তাহলে অনেকটাই ঘুরে যাবে। এটা খুবই দ্রুত ডিসিশন। সুব্রত অজয়বাবুর ড্রাইভার্স লাইসেন্সটা চুরি করেন।"

"তাহলে অজয় আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া প্লেনে উঠলেন কী করে?"

"কেন স্যার, গ্রিন কার্ড, পাসপোর্ট – একটা হলে তো চলে। একটা নিশ্চয়ই সঙ্গে ছিল। যাই হোক, এই প্ল্যানের টাইম- লাইনে নানা রকম ফাঁক আছে ঠিকই, কিন্তু অজয়বাবুকে সরিয়ে দিলে ফাঁকগুলো আর ধরা পড়বে না। অজয়ের পরিচয় দিয়ে বিয়ে করতে খুব একটা সমস্যা হল না। অজয়বাবুর ট্যাক্সের বহু কাজই সুব্রতবাবু করে দিতেন। অজয়বাবুর সোশ্যাল সিকিউরিটি, ঠিকানা ইত্যাদি সবই ওঁর জানা।

"যাক সে কথা, ফিরে এসে ওঁরা দেখেন এরমধ্যেই অজয়বাবু দেশে চলে গেছেন। তখন একটাই দুশ্চিন্তা অজয়বাবু পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেছেন কি না। একটু খোঁজ খবর করে সুব্রতবাবু বুঝলেন এখনও অজয়বাবু কিছু বলেননি। কিন্তু এটাও সুব্রতবাবু বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। ওঁর কোনো ই-মেলের উত্তর অজয়বাবু দিচ্ছেন না, ফোনও ধরছেন না। এই অবস্থায় নাদিয়া ম্যাডামকে ম্যানহাটানে বসিয়ে দিয়ে সুব্রতবাবু তক্কে তক্কে রইলেন কবে অজয়বাবু ফিরছেন। অ্যাপার্টমেন্টে অজয়বাবুর ছবি রাখা হল। অজয়বাবুর ই-মেল- এ ফেক ওয়ার্নিং পাঠানো হল- যেটা বছর দুই আগে অলিভার পাঠিয়েছিলেন সুব্রতবাবুকে। কারণ তখনই ওঁদের প্রেম শুরু হয়েছিল।"

"একটা কথা," আমি প্রশ্ন করলাম,"একই সময় ভারত আর আমেরিকা থেকে ই-মেল- এ ঢুকলে হ্যাকার ভেবে অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয় না?"

একেনবাবু কেয়ার দিকে তাকালেন। "কেয়াদিদি, তুমিই বল।"

কেয়া বলল, "ঠিক একই সময় ঢোকার চেষ্টা করলে হয়। আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করতে বলে। আমার বিশ্বাস সেই জন্যেই সুব্রত অজয়ের নামে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। সেটাই নাদিয়া ব্যবহার করছিল।"

"এগজ্যাক্টলি স্যার, আর নাদিয়া ম্যাডামও আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে অ্যাক্টিং করে গেলেন। তবে কি না স্যার, এসব ব্যাপারে বুদ্ধিমান লোকেরাও ভুল করে। ভেবে দেখুন স্যার, অজয়বাবু কবে আসবেন, না আসবেন — সেটা জানার জন্যে সুব্রতবাবুকে দিলীপ শর্মাকে ফোন করতে হবে কেন? বন্ধুর কাছ থেকেই তো জানতে পারতেন!"

"এবার বুঝেছি," আমি বললাম, "দিলীপ শর্মার কাছে খবরটা জেনে পয়লা এপ্রিলই

কুইন্স থেকে চলে এসেছিল। কাজ খতম করে ফিরে যায়।”

“শুধু শেষ রক্ষা হল না স্যার।”

“কারণ আমার একেনদাদার জন্যে” বলে কেয়া একেনবাবুর গলা জড়িয়ে ধরল।

একেনবাবু লজ্জা লজ্জা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দিদিকে নিয়ে আর পারা যায় না স্যার। আজকের এই শেষ দৃশ্য কিন্তু দিদিরই প্ল্যান। আমারে নাকি হারকিউল পয়রো সাজাতে হবে!”

“এ্যরকুল পোয়ারো,”কেয়া শুদ্ধ করে দিল।

“আমি কি দিদি অত সব উচ্চারণ জানি!”একেনবাবু স্নেহভরা চোখে কেয়ার দিকে তাকালেন।

সংখ্যার সংকেত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১ ।।

এবার প্ল্যান করেই আমরা তিনজন ন'মাসের জন্যে দেশে থাকব বলে এসেছি। আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে রিসার্চের ছুতো করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হয়েছি। দেশেও থাকা হবে আর ছাত্র পড়াবার দায়িত্বও থাকবে না। সোনায় সোহাগা। রিসার্চের একটু-আধটু কাজ — সেটা করতে আমার ভালোই লাগে। প্রমথ ইউনিভার্সিটিকে পুরো গুডবাই করে ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাচ্ছে। ওর ফিঁয়াসে ফ্রান্সিস্কা সুইটজারল্যান্ডে গেছে অসুস্থ মায়ের কাছে শেষ সময়টা থাকবে বলে। সুতরাং নিউ ইয়র্কে একা থাকার কোনও মানে হয় না, তাই প্রমথও চলে এসেছে। তবে এসেছে একটা চাকরি পাকা করেই। জয়েন করবে ন'মাস বাদে। এবং আমার যদ্দুর ধারণা এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে ওর চাকুরি এবং বিবাহ — দুটোই হবে। দু'জনের চোখই আজকাল যেরকম প্রেমঘন দেখি। তবে একেনবাবুও যে আমাদের সঙ্গে আসবেন সেটা ভাবিনি। উনি এখন নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সড ডিটেকটিভ। হাতে দেদার কেস। কিন্তু উনিও দেখলাম টিকিট কেটে বাক্সপত্র গোছাচ্ছেন। প্রমথও অবাক। "আপনি আবার বাক্স গোছাচ্ছেন কেন? বেশ তো টু-পাইস আসছিল।"

"কী যে বলেন স্যার! আপনারা আর ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা ছাড়া নিউ ইয়র্কে কী আছে! তাছাড়া ফ্যামিলির ব্যাপারটাও তো আছে।"

প্রমথ যে প্রমথ — কটু কথা বলতে যার জুড়ি নেই। সেও দেখি চুপ।

এখানে বলি, ফ্যামিলি মানে একেনবউদি। একেনবউদির অবশ্যই একটা নাম আছে, সেটা হল মিনতি। কিন্তু একেনবউদি লিখে লিখে এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, যে মিনতিবউদি লিখলে অন্য কারও কথা বলছি মনে হয়।

তিনজনের কেউই আমরা ন'মাস নিউ ইয়র্কে থাকছি না, তাই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে একটু-আধটু যা ছিল, সেগুলো একটা স্টোরেজে জমা রেখেছি। ফিরে এসে আবার নতুন একটা জায়গা খুঁজতে হবে। এরকম ভালো লোকেশনে জায়গা পাওয়াটা সহজ হবে না। কিন্তু আমাদের অফিসের সেক্রেটারি বেভ ভরসা দিয়েছে, ও একটা কিছু জোগাড় করে রাখবে। বেভ খুবই রিসোর্সফুল, আর আমাকে পছন্দ করে। না না, প্রেম-টেম নয়- যদিও প্রমথ সেটা মানতে চায় না।

আমরা যখন সেপ্টেম্বরে এসেছি তখন খুবই গরম। অক্টোবরে নভেম্বরেও গরমটা ঠিক কাটেনি। এখন ডিসেম্বর। শীতের আমেজ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে।

সেই সঙ্গে পল্যুশনটাও বেড়েছে। হাঁচি-কাশি ইত্যাদির কারণ ভাইরাস না পল্যুশন — সে বিতর্কে কার জয় হবে জানি না, কিন্তু ফলটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ক'দিন ধরেই বেদম কাশছি। ভাগ্যিস আজ রোববার, কলেজ নেই। এই অবস্থায় কলেজ যাওয়া একটা বিড়ম্বনা।

সাধারণত রবিবার আমরা একেনবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারি। আজকে প্ল্যানটা অন্যরকম। প্রমথ আগে থেকেই মাকে বলে রেখেছিল পাটিসাপটা খাবে। আমার আবদারে

সব সময় সায় না দিলেও প্রমথর কথা মা ফেলতে পারেন না। সুতরাং বাড়িতে পাটিসাপটার আয়োজন হয়েছে। আমরা তিনজনে যখন চা খেতে খেতে পাটিসাপটা আসার অপেক্ষা করছি, তখন ছোটমামা ঘরে ঢুকলেন। ছোটোমামা রিটায়ার করার আগে বহুদিন আলিপুর জেলের জেলার ছিলেন।

প্রমথ ছোটোমামাকে চেনে, অপরিচিত শুধু একেনবাবু। উনি সোফায় বসতেই একেনবাবু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে একেনবাবু হাতজোড় করে একেবারে মাথা নুইয়ে বললেন, "আমি কিন্তু স্যার, আপনাকে আগে দেখেছি।"

"তাই নাকি!" একেনবাবুর মাথা নোয়ানো আর কথা বলার ভঙ্গীতে কৌতুক বোধ করলেন ছোটোমামা।

"হ্যাঁ স্যার, আপনি তো আলিপুর জেলে ছিলেন?"

ছোটোমামা রহস্য করতে ভালোবাসেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ, এ তো ভালো কথা নয়, তুমিও সেখানে কয়েদি ছিলে?"

"কী যে বলেন স্যার...."

"একেনবাবু এক কালে সি.আই.ডি-তে কাজ করতেন," আমি বললাম।

"তাই বলো।"

তখন হিসেব করে বার হল, ছোটমামা যে বছর রিটায়ার করেন একেনবাবু সে বছরই পুলিশে যোগ দেন।

ছোটোমামাকে আমার খুবই পছন্দ। সত্যিকারের গোপ্পে লোক। জেলার ছিলেন বলে নানান ধরনের অপরাধীর সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়েছিল — তাদের জীবনের বহু ঘটনাই উনি জানতেন। সেই সব কাহিনিগুলো নিয়ে বই লিখলে জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' হয়তো হত না, কিন্তু বইটার কাটতি হত।

কিন্তু লেখার কথা তুললেই ছোটোমামা বলতেন, "খেপেছিস, বানিয়ে বানিয়ে গল্প তো নয়, এগুলো সব সত্যিকারের সুখ-দুঃখের কাহিনি! বিশ্বাস করে যেগুলো লোকে বলেছে, সেগুলো লিখে নাম কিনতে আমি রাজি নই।"

"নামগুলো পালটে দাও আর বিভিন্ন চরিত্র পাঞ্চ করে এক একটা নতুন চরিত্র খাড়া কর।"

"তা মন্দ বলিসনি, তবে মনে হয় না এই বয়সে আমার লেখক হওয়া হবে বলে।"

লেখা প্রসঙ্গের সেইখানেই ইতি। তারপর আরম্ভ হতো নানান গল্প।

আজ আর লেখার কথা তুললাম না। সকালে পত্রিকায় পড়েছিলাম রাজা জগদীশনারায়ণের হত্যাকারী গজলাল প্যাটেল কুড়ি বছর শাস্তি ভোগ করে আলিপুর জেলে মারা গেছে। ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর, চোখে কী করে পড়েছিল নিজেই জানি না। আলোচনা সেই নিয়েই শুরু হল।

গজলাল প্যাটেলের কেস নিয়ে এক কালে বেশ হইচই হয়েছিল। বয়স্কদের কারও কারও সে ঘটনা হয়তো মনে আছে। আমাদের জেনারেশনে সেটা মনে থাকার কথা নয়। আমি ঘটনাটা জানি, কারণ রাজা জগদীশনারায়ণকে আমার মা আর ছোটমামা দু'জনেই চিনতেন। দাদুর বাড়ি ছিল হাবড়ায়। সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে ছিল জদগীশনারায়ণের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। এককালে পূর্ববঙ্গে ওঁর বিশাল জমিদারি ছিল, রাজা খেতাবটা বোধহয় তখনই পান। দেশবিভাগের কিছুদিন পর এদেশে চলে এসে কৈগাছিতে

ওঁর বাড়িটা তৈরি করান। যখন উনি খুন হন তখন অবশ্য ওঁর পড়তি অবস্থা। দুপুর বেলায় খেতে বসেছিলেন, তিনজন আততায়ী হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওঁকে গুলি করে। পুলিশ পরে তদন্ত করে আবিষ্কার করে যে স্থানীয় ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেল গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে ওঁকে খুন করেছে। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স বছর এগারো, অর্থাৎ প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা।

গজলালের খবরটা ছোটোমামা নিজে পড়েননি, কিন্তু শুনেছেন। সকালে খবরটা পড়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছিল, সেটাই প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন কারাবাস মানে চোদ্দো বছরের জেল। সেক্ষেত্রে গজলাল কুড়ি বছর জেলে থাকে কী করে?

ধারণাটা ভুল। ক্ষেত্র বিশেষে কুড়ি, পঁচিশ এমন কী তিরিশ বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে। আর গজলাল শুধু একটা খুনের জন্য জেলে যায়নি, সাজা পেয়েছিল দু'টো খুনের জন্য। এটা ছিল আমার প্রশ্নের টেকনিক্যাল উত্তর। তবে এই প্রসঙ্গে যেটা ছোটোমামা বললেন, সেটা বেশ শকিং।

"দেখ, আমি ছিলাম জেলার। আমার দায়িত্ব ছিল সরকারি হুকুম মেনে কয়েদিদের ঠিকমতো দেখভাল করা, তারা দোষী না নির্দোষ — তার বিচার করা নয়। আমি অবাধে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সে নিয়ে প্রশ্ন করিনি। কেউ কেউ নিজের থেকেই এগিয়ে এসে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। অনেকটা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদারের কাছে কনফেশন করার মতো। অনেকে আবার অভিযোগ জানিয়েছে বিনা অপরাধেই তাদের শাস্তি হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যা, আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। কিন্তু গজলালের কথার সুরে এমন একটা কিছু ছিল যে, ওকে অবিশ্বাস করতে পারিনি।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার," একেনবাবু বললেন। "তারমানে আপনার ধারণা লোকটা খুন করেনি?"

"গজলাল নিজে খুন করেনি। গুণ্ডাদের এনে খুন করিয়েছিল বলে ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হল, সত্যি সত্যিই সেটা করিয়েছিল কি না। ওর কেসটা নিয়ে আমি তোমাদের সি.আই.ডি-র রথীন দত্তের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। রথীন দত্তকে চেনো?" একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটোমামা।

"নিশ্চয়ই স্যার, আমাদের সবার বস ছিলেন।"

"রথীন ছিল ওই কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। রথীন অবশ্য শিওর ছিল যে ওর তদন্তে কোনো ভুল নেই। হি মে বি রাইট। আমি শুধু আমার ফিলিং এর কথা বলছি। আসলে আমরা সবাই ছিলাম শাসনচক্রের শিকলে বাঁধা। রথীন যদি বুঝতেও পেরে থাকে কোথাও ভুল হয়েছে — সেটা শোধরানো সহজ ব্যাপার ছিল না।"

"আর এখন তো সেটা অসম্ভব স্যার।"

"ঠিক, গজলাল আমাদের আইন-আদালতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। তবে কী জানো, গজলালের ব্যাপারটা আমাকে এত নাড়া দিয়েছিল যে, রিটায়ার করার পরে, আমি ঠিক করেছিলাম নিজেই তদন্ত করব। কেস ফাইলও কিছু ঘেঁটেছিলাম, এমনকী কৈগাছিতে, মানে যেখানে রাজা জগদীশনারায়ণ খুন হয়েছিলেন— সেখানেও গিয়েছিলাম লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম গোয়েন্দা হবার এলেম আমার নেই।"

প্রমথ বলে উঠল, "এলেমদার গোয়েন্দা তো এখানে আছেন, তাঁকে কাজে লাগান।"

ছোটোমামা একটু হেসে বললেন, “আগে ওকে চিনলে তো ভালোই হত।”

ইতিমধ্যে পাটিসাপটা এসে গেছে। তাতে আমরা মনসংযোগ করলাম।

আমাদের রান্নাঘরটা বসার ঘরের লাগোয়া। মায়ের কানে সবকিছুই যাচ্ছিল। আমাদের খাওয়ার মাঝখানেই মা বললেন, “একটা লোক যদি অকারণে জেলে গিয়ে পুরো জীবনটা কাটায়, তার জীবন তো যায়ই, তার বৌ-বাচ্চার জীবনও ধ্বংস হয়। ওর ফ্যামিলির কথা কিছু জানো বিনয়?”

বিনয় ছোটোমামার নাম। ছোটোমামা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “স্ত্রী ছিল। প্রথম কয়েক মাস বছর তিনেকের একটা ছেলেকে নিয়ে আসত ওকে দেখতে। তারপর আর আসতে দেখিনি। পরে শুনেছি গজলালই ওকে গুজরাতে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলেছিল।”

আমরা সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলাম। বুঝলাম ছোটোমামা আর মায়ের ব্যথাটা কোথায়।

ক্রিসমাসের সময়ে আমার কয়েকদিনের ছুটি। ছুটির ঠিক দু'দিন আগে একেনবাবু ফোন করে বললেন, “আমি আর প্রমথবাবু দিন তিনেকের জন্যে কৈগাছি যাচ্ছি স্যার, আপনি আসবেন?”

এটা এত অপ্রত্যাশিত যে, আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

“কৈগাছি যাচ্ছেন মানে!”

“কী করব স্যার, আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রমথবাবু আমাকে যাচ্ছেতাই বকলেন। মাসিমার অনারে অন্তত আমার কেসটা নেওয়া উচিত ছিল।”

“কীসের কেস!”

“কেন স্যার গজলালের?”

“এটা আবার কী কেস, এর সাজা তো অলরেডি হয়ে গেছে! খুনিও ডেড।”

“কী যে বলেন স্যার, সাজা তো হয় শুধু সত্যের দরবারে।”

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে প্রমথ রয়েছে।

আমরা প্ল্যান করেছিলাম পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে যাব। প্রমথর উপর ভার ছিল থাকবার জন্য ওর মাসির বাড়িটা ম্যানেজ করা। নিশ্চয়ই সেটা করতে পারেনি। এখন আমাদের ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে কৈগাছিতে।

আমি বললাম, “প্রমথকে ফোনটা দিন।”

“প্রমথবাবুকে?”

“হ্যাঁ, ও নিশ্চয়ই আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আপনিই শুধু গোয়েন্দা নাকি? ছলচাতুরি আমি কিছু বুঝি না!”

“দিচ্ছি স্যার।”

প্রমথ ফোনটা তুলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বলল, “তুই কৈগাছি যেতে না চাস যাবি না। আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে, আমরা যাচ্ছি।”

“দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমাকে তুই জ্ঞান দিস না। মাসির শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ম্যানেজ করেছিস?”

“না, তার কারণ আমরা কৈগাছি যাচ্ছি। তোর ইচ্ছে হয় তো শান্তিনিকেতনে যা।”

“থাকব কোথায়?”

দ্যাট্স ইওর প্রবলেম।”

।। ২।।

কৈগাছি কোলকাতা থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে– যশোর রোড ধরে যেতে হয়। তবে রাস্তা তেমন ভালো নয় আর ট্র্যাফিকও ভীষণ, সুতরাং সময় লাগে অনেকটা। আমারা থাকব ছায়ানীড়–এ। ওটা একটা গেস্ট হাউস কমবয়সি এক দম্পতি চালায়। একেনবাবু ওঁর পুলিশি সূত্র কাজে লাগিয়ে জায়গাটি আবিষ্কার করেছেন। কৈগাছিতে থ্রি-স্টার হোটেল আশা করা যায় না। তবে জায়গাটা নাকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভাড়াও খুব রিজনেবল। ভাড়া যে আনরিজনেবল নয়, সেটা আমাকে না বললেও বুঝতাম। একেনবাবুর মতো হাড়কেপ্পন লোক হিসেবপত্তর না করে জায়গাটা বুক করতেন না। তাছাড়া কৈগাছি টুরিস্ট স্পট নয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকটা হল বেড়ানোর মোক্ষম সময়। এই সময়ে কৈগাছিতে ছুটি কাটাতে কে আসবে! এগুলো বলছি বটে, কিন্তু কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা আনন্দ আছে। যশোর রোডে যখন পড়লাম, তখন অজস্র ট্রাক, সাইকেল রিক্সা, গাড়ি, বাস ইত্যাদির দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও মনে বেশ ফুর্তিই এল।

আমি গাড়ি চালাচ্ছি, পাশে প্রমথ — আমার ন্যাভিগেটর। একেনবাবু পেছনে।

আমি বললাম, “বেশ লাগছে, না রে?”

প্রমথ তার উত্তর না দিয়ে বলল, “ঐ যাঃ, মশারিটা প্যাক করতে ভুলে গেছি।”

প্রমথ মশার কামড় সহ্য করতে পারে না। আর মশারাও প্রমথকেই টার্গেট করে। কোথাও মশা থাকলে আমাদের থেকে প্রমথই কামড় খায় বেশি।

“গেস্ট হাউসে নিশ্চয় মশারি থাকবে।” আমি ভরসা দিলাম।

“তোর মুণ্ডু।”

“তাহলে কোনো দোকান থেকে একটা কিনে নিস।”

“তুই পয়সা দিবি?”

“আমি কেন দেব? সমস্যাটা তো তোর!”

প্রমথ চটল, তাই অন্য লাইন ধরল। “বেশ আমিই কিনব, কিন্তু তুই দোকান খুঁজে বের করবি।”

“আমি মশারির দোকান কোথায় পাব!”

“তাহলে বললি কেন–দোকান থেকে কিনে নিস। সব সময়ে বড় বড় কথা।”

আমাদের তর্কাতর্কি বন্ধ করার জন্যে একেনবাবু বললেন, “যাই বলুন স্যার, কলকাতার বাইরে এলেই মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যায়।”

“গুড, তা বলে গান ধরবেন না, বাপি গাড়ি চালাচ্ছে। এমনিতেই ও আনস্টেডি।”

“জানলে তো ধরব স্যার, গান আমার আসেই না।”

“বাঁচিয়েছেন। আপনার ঐ ঘ্যানঘ্যানে গলায় গান এলে, সত্যিই একটা সমস্যা হতো।”

প্রমথ অকারণে মানুষকে আঘাত করে। আমি প্রমথকে বললাম, “তোর বাজে কথা বলাটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।”

“কোনটা বাজে কথা?”

“এই একেনবাবুর গান নিয়ে।”

“বাজেটা কী বললাম, গলায় সুর থাকলেই তো শুধু হয় না, সেটা শ্রুতিমধুর করার জন্য গলার একটা ক্যারেক্টার চাই। সেটা একেনবাবুর নেই।”

“তোর ওপিনিয়ন আমরা কেউ শুনতে চাই না।”

"না চাইলে শুনিস না। তোর মতো গা বাঁচিয়ে আমি চলি না।"

"তোর সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

"গুড, তোর একটু লেট-এ বোঝা স্বভাব।"

সারাটা পথ এইরকম হাবিজাবি অবান্তর কথা চালাচালি করেই কাটল। পাক্কা আড়াই ঘন্টা লেগে গেল ছায়ানীড়ে পৌঁছতে। কুড়ি মিনিট অবশ্য একস্ট্রা লাগল জায়গাটা খুঁজে পেতে। বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর নয়। একটা ছোটো মেঠো রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা যেতে হয়। খান ছয়েক কুঁড়েঘর পার হয়ে, রাস্তার ওপর বসা ছাগল, মুরগির পালকে ক্রমাগত হর্ন দিতে দিতে সরিয়ে রাস্তাটা যেখানে ডান দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে পৌঁছনোর পর বাড়িটা চোখে পড়ে। বড় রাস্তায় অবশ্য ছায়ানীড় এইদিকে বলে একটা ছোটো সাইন বোর্ড আছে, কিন্তু সেটা প্রথমবার মিস করেছিলাম।

বাড়িটা নতুন রঙ করা — ছিমছাম সুন্দর। মালিক সুবীর দাস আমাদের জন্য বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদেরই বয়সি-হয়তো বা একটু ছোটোই;

বেঁটেখাটো গোলগাল ফর্সা চেহারা। বয়সের তুলনায় মনে হল একটু বেশি সিরিয়াস। ঘরে ঢুকতেই "আসুন আসুন, বসুন," বলে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর চেঁচিয়ে একজনকে ডেকে বললেন, "একটু চা কর, ওঁরা এসে গেছেন।"

যাঁকে ডাকলেন তিনিও এক ঝলকের জন্য দেখা দিলেন। শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল টেনে খোপা করে বাঁধা, মিষ্টি চেহারা। সুবীরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার স্ত্রী অঞ্জনা।"

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

অঞ্জনা বেশ সপ্রতিভ। বললেন, "চায়ের সঙ্গে একটু টা-ও দিচ্ছি, দুপুরের খাবার কিন্তু একটার আগে পাওয়া যাবে না।"

আমি একটু ভদ্রতা করলাম, "শুধু চা হলেই চলবে।"

প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ওর কথা শুনবেন না, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন।"

অঞ্জনা মুখ টিপে হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

সুবীরবাবু আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বন্ধু।"

"একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে," প্রমথ বলল। "সেই থেকে ওকে সামলাতে হচ্ছে। তবে ইনি আমাদের নতুন বন্ধু — বিখ্যাত গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন।"

"কী যে বলেন স্যার," একেনবাবু একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন।

"কেন বলব না — লোককে তো জানাতে হবে, বাপির কলমের জোরে আপনার পরিচিতি হবে ভেবে থাকলে পস্তাবেন।"

আমি প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যেই বললাম, "আমাদের ঘরগুলো কোথায়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন," বলে সুবীরবাবু আমাদের নিয়ে বাইরে এলেন। বাড়ির পাশ দিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো সরু প্যাসেজ পেছনের দিকে চলে গেছে। একটু এগোলেই পাশাপাশি তিনটে ঘর। ঘরে ঢোকার জন্য আলাদা আলাদা দরজা। পাশে একটা করে ছোটো জানলা। সবগুলোই বন্ধ। প্যাসেজের উলটো দিকে মাঝারি সাইজের ফুলের বাগান। একেনবাবু সেটা দেখে মুগ্ধ।

"গ্র্যান্ড বাগান স্যার আপনার! সত্যি কোলকাতায় এসব ভাবা যায় না....এত বড় সাইজের ডালিয়া আমি বহুদিন দেখিনি।"

সুবীরবাবু খুশি হলেন বাগানের প্রশংসায়। "এবারের ডালিয়া বেশ ভালো হয়েছে। তবে এর থেকে আরও অনেক বড় ডালিয়া দেখবেন প্রশান্তদার বাগানে।"

"উনি কি কাছাকাছি থাকেন?"

"খুবই কাছে, সামনের রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে।"

"সেটা তো দেখতে হচ্ছে স্যার।"

আমার আর প্রমথর কারোরই ফুলের ব্যাপারে উৎসাহ নেই। প্রমথ বলল, "তার আগে আমাদের ঘরগুলোর ভেতরটা দেখি।"

"ও হ্যাঁ," বলে সুবীরবাবু একটা দরজা খুললেন। "সবগুলো ঘরই এক রকম।"

ঘরটা বন্ধ ছিল বলে একটু ভ্যাপসা গন্ধ। সেটা অবশ্য একটু বাদেই চলে গেল। এমনিতে ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফার্নিচার বলতে একটা ডাবল বেড, মাথার পাশে দুটো নাইট স্ট্যান্ড, দুটো চেয়ার। এক দিকের দেয়ালে জামাকাপড় রাখার জন্য একটা ক্লজেট। তার পাশেই আয়না লাগানো নীচু ড্রেসিং টেবিল।

"প্রত্যেকটা ঘরেই অ্যাটাচড বাথরুম," একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন সুধীরবাবু। "ওগুলোকে মর্ডান স্টাইলে করেছি বিদেশি বা আপনাদের মতো গেস্টদের জন্য।"

বাথরুমটা একটু উঁকি দিয়ে দেখলাম। কমোডটা দেশি বা ওয়েস্টার্ন স্টাইল কোনোটাই নয়, আবার দুটোই। অর্থাৎ, দেশি স্টাইলেও হাঁটুমুড়ে বসা যায় আবার চেয়ারের মতো করেও যায়। কী জানি স্পেশাল নাম আছে এগুলোর, ঠিক মনে পড়ল না।

টয়লেট টিস্যু অবশ্য দেখলাম না, শুধু জলের কল আর মগ। গিজার লাগানো শাওয়ার আছে, সেই সঙ্গে বালতিও।

শাওয়ার খুললে পুরো বাথরুমটাই ভিজে যাবে। বিদেশি পর্যটকদের সেটা পছন্দ হবে না, তবে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।

সুবীরবাবু এতক্ষণ আমাদের রি-অ্যাকশন দেখছিলেন। দেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের পছন্দ হয়েছে?"

প্রমথকে সন্তুষ্ট করা শক্ত। পাছে ও একটা বাঁকা মন্তব্য করে বসে তাই আমি বললাম, "বেশ ভালোই তো।"

একেনবাবু সেটাকে আরেক ধাপ চড়িয়ে বললেন, "ভাবাই যায় না স্যার, এত সুন্দর বন্দোবস্ত। বিদেশি গেস্ট বললেন, সাহেবরাও এখানে আসেন নাকি স্যার?"

"লোক-উৎসব দেখতে গত বছর দু'জন সাহেব এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। ওঁরাও বাথরুমের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে খুশি হয়েছিলেন।"

"না হবার তো কোনো কারণ নেই স্যার।"

ব্যাগগুলো নিজেদের ঘরে রেখে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলাম। সুবীরবাবু বললেন, "যখন খুশি এখানে এসে বসবেন — এটা কমন বসার ঘর। সকালের খাবারটা এখানেই খাওয়া হয়। পাশে খাবার ঘর — লাঞ্চ আর ডিনার সেখানে হয়। সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট, একটায় লাঞ্চ আর রাত আটটায় ডিনার। আপনারা তো নন-ভেজ, তাই না? আগেই অবশ্য আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।"

"ভেজ, নন-ভেজ কিছু একটা হলেই চলবে।" আমি বললাম, "কিন্তু আপনার স্ত্রী আবার এই দশটার সময় কষ্ট করে রান্না করছেন — ব্রেকফাস্টের সময় তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।"

"আরে তাতে কী হয়েছে, সময়টা কিছু বাঁধাধরা নয়। সময়ের অত হিসেব করলে কি

চলে?”

প্রমথ এতক্ষণ টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিল। পত্রিকাটা নামিয়ে বলল, “আমরা দু’দিন থাকব, সেটা তো আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে, কিন্তু যদি সেটা এক্সটেন্ড করতে হয়, পারা যাবে?”

“নিশ্চয়ই। আগামী সপ্তাহে বুকিং আছে, এ সপ্তাহটা এখন পর্যন্ত ফাঁকা।”

“গুড।”

“এক্সটেন্ড করার কথা কেন ভাবছিস?” আমি একটু অবাক হয়ে প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম।

“কারণ রান্নার সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি।”

প্রমথর রসিকতাটা সুবীরবাবু বোধহয় ঠিক ধরতে পারলেন না। রেজিস্ট্রি বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, “নেক্সট উইকের মঙ্গলবার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে এখানে কাটাতে পারেন।”

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “এ দু’দিন কোথাও বেড়াতে যেতে চান আপনারা?”

“কিছু দেখার আছে এখানে?” প্রমথ উলটে প্রশ্ন করল।

“তেমন কিছু নেই। একটা ভাঙ্গা প্রাসাদ আছে — রাজা জগদীশনারায়ণের। এখন ওটা একটা পোড়ো বাড়ি — সমাজ বিরোধীদের জায়গা। দিনদুপুরে অবশ্য কোনো ভয় নেই। প্রাসাদের পেছনের বাগানটা এখনও আছে, একটা ট্রাস্ট দেখভাল করে। এই সময়টাতে অনেক ফুলের গাছ দেখবেন। ক’দিন বাদে এলে কাছেই একটা লোক-উৎসব হয়, সেখানে যেতে পারতেন। বেশ বড় মেলা বহু লোক আসে। তখন আশেপাশে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন।”

“অন্য সময়ে আপনার গেস্টরা স্যার কারা?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বার বার ‘স্যার’ শুনে সুধীরবাবু যে অসোয়াস্তি বোধ করছেন, সেটা বুঝছিলাম। এবার উনি বলেই ফেললেন, “আমাকে ‘স্যার, স্যার’ বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন।”

“ঐ লজ্জাটা আপনাকে কয়েক দিন পেতে হবে,” প্রমথ গম্ভীর মুখে বলল, “একেনবাবু আমাদেরও ‘স্যার’ বলেন। ও নিয়ে না ভেবে উত্তরটা দিন — এখানে সাধারণত কারা থাকেন?”

“কাছাকাছি কয়েকটা কারখানা হয়েছে, তাদের ভেন্ডার সাপ্লায়েররা কেউ কেউ আসেন। এছাড়া আশেপাশে বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন চলছে। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা মাঝে মাঝেই দু-এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে নেন। কেউ কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্যেও আসেন-যেমন আপনারা এসেছেন।”

“আমরা কিন্তু স্যার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্যে ঠিক আসিনি।”

“তাহলে কীসের জন্যে এসেছেন?” সুবীরবাবুর চোখে কৌতূহল।

এমন সময় অঞ্জনা একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে চা, পরোটা আর আলুর তরকারি নিয়ে ঢুকলেন। সুন্দর গন্ধে ঘরটা আমোদিত হয়ে উঠলো।

“চায়ে চিনি বা দুধ দিইনি, আপনারা পছন্দ মতো মিশিয়ে নিন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।” বলে প্রমথ একটা প্লেট তুলে নিয়ে আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অঞ্জনাকে বলল, “আমার মনে হয় না, বাপি খাবে বলে। ওরটাও আমি খাচ্ছি।”

“আরও অনেক পরোটা আর তরকারি আছে,” অঞ্জনা হেসে প্রমথকে অভয় দিয়ে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাকেও দেব?”

"আরে না, আমি তো একটু আগেই খেলাম।"

আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, "আমরা একলা একলা খাব?"

উত্তরটা ওঁদের আগে প্রমথই দিল, "খাস না। তোকে তো কেউ খেতে সাধছে না।"

এবার অঞ্জনাও বললেন, "আপনারা সত্যিই ভীষণ বন্ধু — এরকম আজকাল বেশি দেখি না।"

আমরা খাওয়া শুরু করতে সুবীরবাবু বললেন, "আপনারা বেড়াতে আসেননি বললেন, তাহলে কীসের জন্য এসেছেন?"

"আসলে স্যার এখানে বহুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছিল, সেটা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে।

কথাটা শোনামাত্র সুবীরবাবু আর অঞ্জনা চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আমাদের কারোরই সেটা নজর এড়ালো না। প্রমথ বলল, "একেনবাবু নিউ ইয়র্কের একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, আপাতত কলকাতায় আছেন। একজনের অনুরোধে ওটা নিয়ে খোঁজখবর নিতে এসেছেন।"

সুবীরবাবু গলায় একটু উত্তেজনার আভাস পেলাম, "কতদিন আগের কথা বলছেন?"

"তা প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা।"

"কিন্তু সেই খুনের জন্যে তো একজনের জেল হয়েছিল। ক'দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সে মারাও গেছে।"

"ঠিকই দেখছেন স্যার।"

"তাহলে?"

"তার উত্তরটা তো স্যার এখনও জানি না। প্রশ্নটা শুধু জানি।"

"কী প্রশ্ন?"

"যে খুনি বলে শাস্তি পেয়েছে, সেই আসল খুনি কি না।"

সুবীরবাবু অঞ্জনার দিকে তাকালেন।

অঞ্জনা বললেন, "বেশ কয়েক বছর আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একই কারণে এসেছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে অনেক কথাও হয়েছিল তাঁর।"

"ভদ্রলোকের নাম কি বিনয়বাবু?"

"হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা নাম বলেছিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন?"

প্রমথ আমাকে দেখিয়ে বলল, "তিনি এঁর মামা।"

তাতে অবশ্য অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বিস্ময় কাটল না।

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, আপনারা কী ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানেন, বা এমন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন যাঁর সেই সময়কার কথা মনে আছে?"

"সেটাই মুশকিল,"সুবীরবাবু বললেন। "যাঁরা জানতেন, অর্থাৎ অঞ্জনার বাবা আর আমার বাবা-তাঁদের কেউ বেঁচে নেই।"

"অঞ্জনা অনুচ্চস্বরে বলল, ওর বাবাও খুন হন সেই সময়ে — রাজা জগদীশনারায়ণের সঙ্গে।"

অঞ্জনার শেষ কথাটা আমরা কেউই এক্সপেক্ট করিনি।

"মাই গড! সুরেশ মিত্র আপনার বাবা স্যার?" একেনবাবু সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুবীরবাবু এই প্রশ্নে ক্ষণিকের জন্য একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর বললেন,

"হ্যাঁ।"

"আমি একটু কনফিউজড স্যার। আপনার পদবী তো দাশ, উনি তো ছিলেন মিত্র?"

"উনি যখন মারা যান, আমি তখন ছোটো। মা তারপর আরেক জনকে বিয়ে করেন, তাঁর পদবীই আমি ব্যবহার করি।"

অঞ্জনা বললেন, "আমার বাবার সঙ্গে সুবীরের দুই বাবারও খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, এতদিন বাদে আপনাদের কেন মনে হচ্ছে যে আসল খুনি ধরা পড়েনি?"

"হয়তো ধরা পড়েছে ম্যাডাম। ওই যে বিনয়বাবুর কথা বললেন, তাঁর মানে একটা খটকা ছিল। আর আমাদেরও হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, তাই ভাবলাম বেড়ানোও হবে আর রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও হবে।"

অঞ্জনা বলল, "আমি ডিটেকটিভ গল্প ভীষণ ভালোবাসি, আমি আপনাদের যা সাহায্যের দরকার করতে পারি। কিন্তু একটা কন্ডিশনে– কী করে রহস্যভেদ করলেন জানাতে হবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ, নিশ্চয়ই জানাব।"

"সবই বুঝলাম, তবে লাঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এদিকে কোনো অ্যাটেনশন দেবেন না।" প্রমথ সতর্ক করল।

"না, দেব না," অঞ্জনা বুদ্ধিমতী – প্রমথকে ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছেন। "লাঞ্চের আইটেম মোটেও কম হবে না।"

।। ৩।।

যেটা আমি জানতাম না সেটা হল, ছোটোমামা যখন জগদীশনারায়ণের কেস ফাইলগুলো দেখেছিলেন, তার বহু তথ্যই উনি একটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন। একেনবাবু এর মধ্যেই সেটা হস্তগত করেছেন। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না, তার কারণ প্রমথ আর একেনবাবু দু'জনেরই ভয় ছিল, পৌষমেলায় না গিয়ে আমরা এখানে আসছি জানলে আমি কুরুক্ষেত্র বাঁধাব। তাই শেষ সময়ে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত কেসটাতেই আমি একটা ডিস-অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে। একেনবাবু অনেক কিছুই জানেন, প্রমথও বেশ কিছু জানে, আমার জ্ঞান শূন্য। দুপুরে খেতে বসার আগে একেনবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি যা উদ্ধার করলাম, তার সংক্ষিপ্তসার হল:

রাজা জগদীশনারায়ণ যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি। তিনি বিপত্নীক ছিলেন – ছেলেপুলেও ছিল না। পূর্ববঙ্গে ওঁর বিরাট জমিদারি ছিল, কিন্তু তার বেশির ভাগই দেশ বিভাগের সময় খোয়ান। এদেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে জমি-বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কিছু ক্যাশ টাকা পেয়েছিলেন; আর মৃত স্ত্রীর কিছু গয়নাগাটি – এই ছিল ওঁর সম্বল। সেই ক্যাশ টাকা আর সম্ভবত কিছু গয়নাগাটি বেচে বিশাল বাড়িটা করান। কেন? তার কোনো সদুত্তর নেই। তবে ওঁর মেজাজটা রাজার মতোই ছিল। তাই সব কিছু

খুইয়েও প্রাসাদে থাকার অভ্যাসটা বোধহয় ছাড়তে পারেননি।

ওঁর কাজের লোক বলতে ছিল চারজন — একজন রান্না করত, আরেকজন ফাইফরমাশ খাটত। আর ছিল একটি ঠিকে ঝি, আর এক পার্ট-টাইম মালী। নিজে প্রাসাদের এক কোণে থাকতেন।

নিজের শোবার ঘরটা বাদ দিলে খাবার ঘর, বসার ঘর আর একটা অফিসঘর ছাড়া বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো বন্ধ অবস্থাতেই থাকত। পেছনের বাগানের লাগোয়া একটা ছোটো সার্ভেন্টস কোয়ার্টার বানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের লোকেরা কেউই সেখানে থাকত না। রাজা জগদীশনারায়ণ একলা শুতে ভয় পেতেন বলে তাদের দুজন জগদীশনারায়ণের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় ঘুমাত।

সিঁড়ির নীচে একটা খুপরিতে ওদের জিনিসপত্র থাকত। জগদীশনারায়ণের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষা করতেন ওঁর এক সেক্রেটারি-কাম বাজার সরকার। এই ভদ্রলোকই সুরেশ মিত্র, যিনি সুবীরবাবুর নিজের বাবা।

জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, কাজের লোকদের মাইনেপত্র দেওয়া, যেটুকু জমিজমা আছে সেটা সামলানো, টাকাপয়সার হিসেব রাখা — সংসারের প্রায় যাবতীয় কাজকর্ম সুরেশবাবুই করতেন। ১৯৫৫ সালে জগদীশনারায়ণ যখন ওঁর বাড়িটা তৈরি করাচ্ছিলেন তখন সুরেশবাবুর বাবা ছিলেন বিল্ডিং কনট্রাক্টরের সাইট সুপারভাইজার। বাড়িটা শেষ হয়ে গেলে জগদীশনারায়ণ সুরেশবাবুর বাবাকে ওঁর সেক্রেটারির কাজ অফার করেন। বছর কুড়ি চাকরি করার পর যখন সুরেশবাবুর বাবার মৃত্যু হয়, তখন সুরেশবাবুকে কাজে বহাল করেন। সুরেশবাবু সেই সময়ে বি.এ. পাশ করে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছিলেন। স্কুলের পাকা চাকরি না ছেড়েই একস্ট্রা টাকার জন্যে এই কাজটা নেন। জগদীশনারায়ণ ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কে টাকা রাখায় বিশ্বাস করতেন না। কারণ ওঁর কোনো অ্যাকাউন্টের খবর পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। পোস্ট অফিসে হাজার দশেক টাকা ছিল। পোস্ট অফিসের পাশ বই আর কিছু কোম্পানির কাগজ পুলিশ ওঁর অফিসঘরের সিন্দুকে পায়। কাগজগুলোর মূল্যও বিরাট কিছু নয় বড়জোর হাজার তিরিশেক হবে। এছাড়া সিন্দুকে আর কিছুই ছিল না-না গয়না, না ক্যাশ টাকা। টাকাকড়ি নিয়ে জগদীশনারায়ণ চিন্তিত ছিলেন এবং এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে সুরেশবাবুর আলোচনার কথা বাড়ির কাজের লোকদের জেরা করে পুলিশ জেনেছিল। এও জেনেছিল যে, জগদীশনারায়ণ ওঁর পুরোনো কিছু মোহর আর একটা হিরে বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন। ওটা বিক্রি করলে সব সমস্যা মিটে যাবে-ওঁদের কথাবার্তা শুনে এটাই কাজের লোকদের মনে হয়েছিল। এই নিয়ে অশোকনগরের এক গুজরাতি ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেলের সঙ্গে সুরেশবাবুর কথা হয়েছিল। গজলাল জগদীশনারায়ণের সঙ্গেও কথা বলে যান।

এর ঠিক কয়েকদিন বাদে, দিনটা স্মরণীয় দিন, ১৫-ই অগাস্ট, তিনজন মুখে রুমাল-বাঁধা লোক দুপুরবেলা যখন জগদীশনারায়ণ খেতে বসেছেন তখন বাড়িতে ঢুকে ওঁকে গুলি করে। কাজের লোকদুটো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পেয়ে চম্পট দেয়। বহু দূরে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে পরে সাহসভরে সুরেশবাবুর স্কুলে যায় ওঁকে ঘটনাটা জানাতে। কিন্তু স্কুল তো বন্ধ। স্কুলের পাশে একটা বাড়িতে অন্য এক মাস্টারমশাই থাকতেন। তাঁকে ব্যাপারটা জানায়।

পুলিশ এসে সুরেশবাবুকে না পেয়ে, প্রথমে সন্দেহ করেছিল সুরেশবাবু এর মধ্যে জড়িত। ইতিমধ্যে একটা খবর আসে যে, গজলাল বলে একটি লোক মুম্বাইয়ের এক

হিরের ব্যবসায়ীকে বারো লাখ টাকায় একটা হিরে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। তখন পুলিশ গজলালকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

গজলালের বক্তব্য সে ওই হিরে আর কয়েকটা আকবরি মোহর দশ লাখ টাকা ক্যাশ দিয়ে জগদীশনারায়ণের কাছ থেকে কিনেছে। নিজে গিয়ে সুরেশবাবু আর জগদীশনারায়ণকে টাকাটা দিয়ে এসেছে। গজলালের কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সুরেশবাবুর দোষী হবার সম্ভাবনাটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। উনিই নিশ্চয়ই টাকাটা হস্তগত করে জগদীশনারায়ণকে খুন করিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও বেরিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন লোক জগদীশনারায়ণের বাগান থেকে ফুল তুলতে গিয়ে বিশ্রী পচা গন্ধ পায়–যেটা আসছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। তারা দরজার তালা ভেঙ্গে আবিষ্কার করে মুখ–বাঁধা অবস্থায় পিছমোড়া করে হাত–পা বাঁধা সুরেশবাবুর পচা–গলা মৃতদেহ। এবার সন্দেহটা আবার গিয়ে পড়ে গজলালের উপরে। সুরেশবাবুর মৃতদেহটা সরানোর পর পুলিশের চোখে পড়ে পেছনের দেয়ালে নখের আঁচড়ে করা কিছু সাংকেতিক দাগ। সেখান থেকেই পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় যে, গজলালই খুনি।

কী ধরণের সাংকেতিক দাগ সেটা আর শোনা হল না, তার আগেই লাঞ্চের ডাক পড়ল।

।। ৪ ।।

খাওয়া নিয়ে আমার একটা দুর্বলতা আছে। ফলাও করে সেটা বলি। এবার কিন্তু নিজেকে সংযত করছি। খেতে খেতে যে আলোচনাটা হল সেটাই বলি।

সুরেশবাবুর স্মৃতি সুবীরবাবুর কাছে এখন অস্পষ্ট। এটুকু ওঁর মনে আছে বাবা একদিন স্কুলে পড়াতে গিয়ে আর ফেরেননি। মা খুব কান্নাকাটি করছিলেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ ছিল না, যাঁরা ছিলেন তাঁরাও খুব গরীব। মা একেবারে অথই জলে পড়লেন। তখন সুরেশবাবুর দুই বন্ধু অজয়কাকা আর কনককাকা এগিয়ে এলেন। কনককাকার মেয়েই হল অঞ্জনা। অজয়কাকা বিয়ে করেননি। তিনিই সংসারের হাল ধরলেন। পরে অজয়কাকাকেই মা বিয়ে করেন।

সুবীরকে তিনি অ্যাডপ্ট করেন–সুবীরের পদবী মিত্র থেকে দাস হয়। অঞ্জনা সুবীরের থেকে বছর তিনেকের ছোটো। জগদীশনারায়ণ আর সুরেশবাবুর মৃত্যুর সময় ওঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর। সুতরাং এ ব্যাপারে ওঁর নিজস্ব কোনো স্মৃতি নেই, মা-বাবার কাছে যেটুকু শুনেছেন। তবে অঞ্জনা বললেন, "কানাইকাকার কাছে কিছু খবর পাওয়া যাবে। ওঁর মেমারি খুব ভালো, উনি সুরেশকাকাকেও চিনতেন। তবে সন্ধ্যের আগে ওঁকে পাওয়া যাবে না। এখনও কলকাতায় নিয়মিত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন।"

"আর কে এ ব্যাপারে বলতে পারেন?"

"মা এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু মা'র আজকাল কিছু মনে থাকে না," অঞ্জনা বলল।

"আপনার বাবা কী করতেন ম্যাডাম?"

"বাবার লরির ব্যবসা ছিল।"

আমি মনে মনে হিসেব করছিলাম, বেঁচে থাকলে অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বাবাদের বয়স কারোরই ষাটের বেশি হওয়ার কথা নয়। সুবীরবাবুর বয়স যদি তিরিশও ধরি, আর উনি যখন জন্মান তখন যদি ওঁর বাবার বয়স হয় তিরিশ, তাহলে এখন ষাট দাঁড়াত। যাই হোক পঞ্চান্ন বা ষাট পঁয়ষট্টি–কোনওটাই আজকের দিনে খুব একটা বেশি বয়স নয়।

"আপনারা কি খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চান?"

ওঁরা নিজেরা বোধহয় ঘুমোন, তাই এই প্রশ্ন। আমাদের প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল–দুপুরে জগদীশনারায়ণের বাড়িটা দেখতে যাব। সেটা জানাতে সুবীরবাবু বলতেন, "তাহলে ঠিক আছে, নইলে আপনাদের বিছানাটা রেখাকে এখনই করে দিতে বলতাম।"

রেখা নিশ্চয়ই ওদের কাজের মেয়েটির নাম।

"আপনাদের এখানে মশা কীরকম?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"এবার অত বেশি হয়নি। এমনিতে বিকেলের আগে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখলে ঘরে ঢুকতে পারে না। তারপর রাত্রে জানলা খুলে দিন, তখন বাবাজিরা আর আসবে না। তবু মশারি ব্যবহার করবেন। রেখাই বিছানা করার সময়ে টাঙিয়ে দেবে।"

কথাটা শোনা মাত্র একেনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রমথকে বললেন, "দেখুন স্যার, সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল।"

"কীসের সমস্যা?" সুবীরবাবু একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আমরা স্যার আসার সময়ে আলোচনা করছিলাম, আপনার এখানে মশারি থাকবে কি না।"

"কেন থাকবে না, প্রত্যেকটা গেস্টরুমেই মশারি আছে।"

"আমার মশারির দরকার নেই," আমি বললাম। "আমি কোলকাতায় মশারি ছাড়াই শুই।"

"এখানে শোবেন না, এ অঞ্চলে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াটা একটু বেশি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, অঞ্জনার বাবা ওতেই মারা গেলেন গত বছর। উনিও মশারির ধার ধারতেন না।"

একটা মৃত্যুর উত্তর জানা গেল। ভাবলাম সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করি, ওঁর পালক-পিতার মৃত্যু কী করে হল। নিজেকে সংযত করলাম।

খেয়েদেয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। সুবীরবাবু ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। বড় রাস্তা ধরে আরও এক কিলোমিটার এগোলে একটা ছোটো কালভার্ট পাওয়া যাবে। তার ঠিক আগে যে রাস্তাটা বাঁ দিকে গেছে, সেটা দিয়ে আধকিলোমিটার গেলেই জগদীশনারায়ণের বাড়ি। মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ। তাও গাড়ি নিয়েই গেলাম। সেখান থেকে আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে।

জগদীশনারায়ণের বাড়ি দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ। দেয়াল থেকে ইট খসে পড়েছে। কাঠের জানলার বেশির ভাগই অদৃশ্য হয়েছে। সামনের মাঠে অন্তত হাফ ডজন গরু চরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা লোক বারান্দায় বসে বিড়ি খাচ্ছে আর তাস খেলছে। আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে সবাই সচকিত। খাকি প্যান্ট পরা বুড়ো মতো একটা লোক উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কী চাই।

"পেছনের বাগানটা দেখাশোনা করে কে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"আমি করি বাবু।"

"ওটা দেখব।"

"আপনারা?"

"আমরা অফিস থেকে আসছি।"

এত কনফিডেন্টলি প্রমথ কথাটা বলল, লোকটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। বাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পেছনের ভাঙ্গা দরজা খুলে যেখানে নিয়ে এল–তার সামনেই একটা বিশাল পুকুর। সেই পুকুরের দুপাশে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ফুলের বেড। গাছগুলো একটু দূরে দূরে বলে ফুলগাছগুলোতে আলোর অভাব হয় না, থোকা থোকা অজস্র ফুল ফুটে আছে। পুকুরের উলটো পারে একটা ভাঙ্গা ছোটো বাড়ি। সেটাই নিশ্চয়ই সার্ভেন্টস কোয়ার্টার যেখানে সুরেশবাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা পুকুরটা ডানদিকে রেখে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগোলাম। হঠাৎ একেনবাবু বলে উঠলেন, "অ্যামেজিং স্যার।"

"কী অ্যামেজিং?"

"এই গাছটা দেখুন একদিকের ফুলগুলো সব লাল, আর অন্যদিকে শুধু বেগুনি।"

সত্যিই ইন্টারেস্টিং! "দু'রকম রঙের ফুল একই গাছে দেখেছি," আমি বললাম। "কিন্তু সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এরকম কখনও দেখিনি।"

প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল, "এটা এমন কী ব্যাপার — একটা গাছে অন্যরকমের গাছ গ্র্যাফটিং করা হয়েছে।"

"তুই কী করে জানলি?"

"তোর অন্য কোনো এক্সপ্লানেশন আছে?"

সোজাভাবে উত্তর দেওয়া প্রমথর ধাতে নেই।

আমি আর প্রমথ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছি দেখে বুড়ো লোকটা বলল, "ওদিকে যাবেন না বাবু, ওখানে অনেক সাপ আছে।"

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। হয়তো চোখের ভুল, কিন্তু মনে হল আমাদের একটু সামনেই সাপের মতো কিছু একটা কিলবিল করে চলে গেল। আমরা সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে বড়জোর দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এই দিকটায় জঙ্গল সাফ করা হয় না। বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভর্তি।

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারটা দেখতে যাচ্ছিলাম নিতান্তই কৌতূহলবশে। এত বছর বাদে ওখানে কিছু আবিষ্কৃত হবে–সে আশা ছিল না। একেনবাবুর মনে হল সার্ভেন্টস কোয়ার্টার দেখার চেয়ে বাগান দেখতেই উৎসাহ বেশি। এদিক যাচ্ছেন, ওদিক যাচ্ছেন–মাঝে মাঝে বুড়ো লোকটাকে গাছ নিয়ে প্রশ্ন করছেন। লোকটা গাছের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না, ওর কাজ বুঝলাম শুধু জায়গাটা পাহারা দেওয়া।

সকালে আর বিকেলে দুটো মালী আসে। তখন দরকার মতো তাদের একটু আধটু সাহায্য করে। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কী মশাই, আর কিছু দেখবেন?"

একেনবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "না স্যার, অনেক তো দেখা হল।"

আমরা গাড়ির দিকে যখন এগোচ্ছি, তখন বুড়ো লোকটা বলল, "স্যার, বড়বাবু কবে আসবেন?"

কে বড়বাবু আমাদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"গোবর সার ফুরিয়ে গেছে, মালীরা ক'দিন ধরে বলছে।"
"এটা আমাকে বলছ কেন, অফিসে গিয়ে খবর দিও।"
"হ্যাঁ, বাবু।"
গাড়িতে উঠে আমি প্রমথকে বললাম, "ভালোই ম্যানেজ করেছিস।"
"কাউকে তো করতে হবে-তোরা দু'জন তো মুখ বুজে বসেছিলি। এই যে গোয়েন্দামশাই, কিছু বুঝলেন?"
"কীসের কথা বলছেন স্যার?"
"কীসের কথা মানে? গোয়েন্দা তো আপনি! এত দূর ঠেঙিয়ে বাপির পেট্রল ধ্বংস করে — এটাই আপনার উত্তর?"
"আসলে স্যার, আমি একটু কনফিউজড।"
"কনফিউজড? কেন, একটা গাছে দু'রকমের ফুল দেখে?" প্রমথর গলায় ঠাট্টার সুর।
"সেটাও একটা কারণ স্যার। আমি বুড়ো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করছিলাম। ও বলল, বহুদিন ধরে সবাই ভেবেছিল ওটা লালফুলের গাছ। হঠাৎ একদিন দেখে বেগুনি ফুলে গাছটা ভরে গেছে। ওরা স্যার আপনার গ্র্যাফটিং-এর ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। বলল, রাজাসাহেব বেগুনি ফুল ভালোবাসতেন, উনিই ওটা ফুটিয়েছেন।"
"ননসেন্স!" প্রমথ বলল। "দেশটা কুসংস্কারে ভর্তি!"
"প্রমথর কথা বাদ দিন, আপনার কনিফিউশানের অন্য কারণটা কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"আসলে স্যার, আমি ভাবছিলাম এই সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা। কেন গজলালের লোকরা সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখল-খুন না করে?"
"এতে কনফিউজড হবার কী আছে? আমার কাছে তো ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার," প্রমথ বলল।
"কী ক্রিস্টাল ক্লিয়ার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"গজলাল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ পিস্তল উঁচিয়ে সুরেশবাবুর কাছে সিন্দুকের চাবি চায়। সুরেশবাবু ভয়ে পেয়ে ওদের চাবি দেন। কিন্তু সেটা ঠিক চাবি না ভুল চাবি-সেটা গজলালের জানার কোনো উপায় ছিল না। ওঁকে বেঁধে রেখে জগদীশনারায়ণকে খুন করে গজলাল আর ওর সঙ্গীরা সিন্দুক খোলে। সিন্দুকটা যদি না খুলত, তাহলে আসল চাবির জন্যে আবার সুরেশবাবুর উপর হামলা চালানো যেত, কিন্তু সুরেশবাবুকে খুন করলে, সেটা সম্ভব হতো না।"
"তা বুঝলাম স্যার, কিন্তু সুরেশবাবুকে যদি পুলিশ খুঁজে পেত, তাহলে তো গজলাল সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত।"
"ওদের সবার মুখই ঢাকা ছিল, কাজের লোকদের কেউ গজলালকে চিনতে পারেনি। সুরেশবাবু কী করে শিওর হবেন।"
"দ্যাট্স দ্য পাজল স্যার। সুরেশবাবু গজলালকে চিনতে পেরেছিলেন আর সাংকেতিক ভাবে ওঁর নামটা লিখেছিলেন।"
"সাংকেতিক ভাবে কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"আমার মনে হয় দুটো কারণে। সুরেশবাবুর হাত পেছনে বাঁধা ছিল।
ওই অবস্থায় অক্ষর লেখা খুবই কঠিন। একটা পাথর কুচি বা ধারালো কিছু কাছাকাছি পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে দেয়ালে সংখ্যা লিখেছিলেন।"
"কী সংখ্যা?"

একেনবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো আমায় দিলেন। “এটা ফটো থেকে কপি করা।”

দেখলাম সেখানে লেখা আছে:

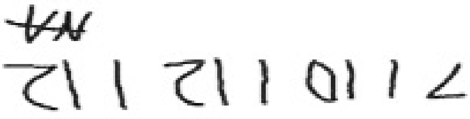

“এর অর্থ কী?”

“উনি পেছনে হাত দিয়ে সংখ্যাগুলো লিখেছিলেন বলে উলটো দেখাচ্ছে। এভাবে পড়ুন স্যার,” একেনবাবু কাগজটা উলটো করে ধরলেন।

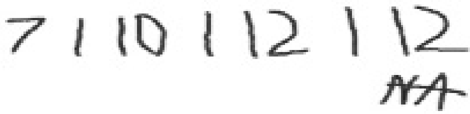

“7 1 10 1 12 1 12 .... তা তো বুঝলাম, কিন্তু অর্থটা কী?”

“এগুলো স্যার ইংরেজি ABCD র পজিশন। A হল ‘1’, B হল ‘2’, এইভাবে চললে G হল ‘7’, J হবে ‘10’, আর L হবে ‘12’। অর্থাৎ যেটা লিখেছেন, সেটা হবে GAJALAL।”

“মাই গড!”

“সাংকেতিক ভাবে লেখার আরেকটা কারণও হয়তো ছিল স্যার।”

“আর কী কারণ?” প্রমথ আর আমি দু’জনেই প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্নটা করলাম।

“যদি গজলাল ও তার গুণ্ডার দল ফিরে এসে ওকে খুন করে, তাহলে ওরা যাতে না বোঝে যে, উনি গজলালের নাম দেয়ালে লিখে যাচ্ছেন।”

“দ্যাট্‌স ক্লেভার অফ হিম।” প্রমথ বলল।

“তবে একটা জিনিস একটু আনক্লিয়ার।”

“কী সেটা?”

“এগুলোর শেষে উনি কী লিখতে চেয়েছিলেন?”

বা ওইরকম কিছু একটা....কিন্তু সেটা কী?”

“আপনার কী মনে হয়, এর কোনো একটা অর্থ আছে?”

“সেটাই ভাবছি স্যার।”

প্রমথ লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় উনি NA লিখতে চেয়েছিলেন, A –এর পেটটা বেশি কাটা হয়ে গেছে।”

“কিন্তু তার অর্থ কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“NA মানে Numbered Alphabet অর্থাৎ অ্যালফাবেটের নম্বর,” প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল। “পুলিশের জন্যে একটা ক্লু।”

“ননসেন্স। এটা কোনো কথা হয় নাকি!”

"তোর কোনো বেটার এক্সপ্লানেশন আছে?"

।। ৫ ।।

বিকেলবেলা অঞ্জনা আমাদের কানাইবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক। চাকরি করেন রেলওয়ের বুকিং অফিসে–সেটা পেট চালানোর জন্য করতে হয়। ওঁর শখ হল ইলেকট্রনিক্সের জিনিস সারানো।

টেলিভিশন সেট, টেপ রেকর্ডার, ভিসিআর — হেন জিনিস নেই যাতে উনি হাত লাগান না। এ অঞ্চলের প্রায় সবাই আসে ওঁর কাছে।

পয়সা রোজগারের থেকে নতুন নতুন সার্কিট আর ডিজিটাল লজিকের প্যাঁচ উদ্ধার করেই উনি আনন্দ বেশি পান। আর ভালোবাসেন গল্প করতে।

আমরা যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কানাইবাবু একটা সার্কিট ডায়াগ্রামের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

অঞ্জনাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে সার্কিট ডায়াগ্রামটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন,

"আয় মা, আয়। এঁরা কারা?"

অঞ্জনা পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা বললেন।

"ওরে বাবা, সে তো অনেকদিনের আগের ঘটনা।"

"সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা স্যার। ম্যাডাম বললেন, যদি কেউ সে সময়ের কথা কিছু বলতে পারেন, তাহলে আপনি।"

"কথাটা ভুল বলেনি। কনকদা, অজয়দা, সুরেশদা — সবাই আমাকে ভাইয়ের মতো দেখতেন। কিন্তু জগদীশনারায়ণের ব্যাপারে আমি আর কী বলব। পুরোটাই একটা পাজল।"

"সুরেশবাবুর কেউ শত্রু ছিলেন স্যার?"

"সুরেশদার শত্রু?" একটু ভাবার চেষ্টা করলেন, কানাইবাবু। "তেমন তো কাউকে মনে পড়ছে না। তবে এইসব জায়গায় যেটা সাধারণত হয় সেটা হল জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোল। সেরকম একটা গণ্ডগোল চলছিল কয়েকজনের সঙ্গে।"

"কাদের সঙ্গে স্যার?"

"জগদীশনারায়ণের জমিজমা দেখাশুনা করতেন সুরেশদা। বেশিরভাগ জমিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বিঘা যা ছিল, সেগুলো চাষ করতে দিয়েছিলেন দু'জনকে। একজনকে ঘোষের পো বলেই সবাই চিনত, নাম বোধহয় কালীচরণ বা ওই ধরনের কিছু একটা। আরেকজন হল লালা– লালা হালদার।" তারপর অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কানাইবাবু, "হ্যাঁরে, লালাকে কি তোর মনে আছে?"

"না," মাথা নাড়লেন অঞ্জনা।

"মনে না থাকারই কথা, তুই তো তখন খুব ছোটো। ও হ্যাঁ, যা বলেছিলাম, লালা ছিল বেশ বাজে ক্যারেক্টারের লোক। ওর বৌ জদগীশনারায়ণের বাড়িতে কাজ করত, সেইজন্যেই বোধহয় জমিটা পেয়েছিল। লালা বা ঘোষের পো– কেউই ফসলের কোনো

ভাগ জগদীশনারায়ণকে দিচ্ছিল না। সেই নিয়ে সুরেশদার সঙ্গে ওদের খুব ঝামেলা হয়। ঘোষের পো-কে চেষ্টাচরিত্র করে সুরেশদা গ্রামছাড়া করতে পেরেছিল, কিন্তু লালাকে নয়। কোর্ট কাছারির ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি। উলটে সুরেশদাকে মারধরের হুমকি দিয়েছিল ব্যাটাচ্ছেলে। একবার তো জগদীশনারায়ণের বাড়িতেও কয়েকজনকে নিয়ে চড়াও হয়েছিল-জগদীশনারায়ণ নাকি ওর বৌকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। পরে অবশ্য একটা মিটমাট হয়েছিল।"

"কী রকম মিটমাট স্যার?"

"তা সঠিক করে বলতে পারব না। ব্যাপারটা নিয়ে সুরেশদা কিছু বলতে চাইতেন না। তবে জমির ঝামেলাটা মিটেছিল কারণ লালা তার বৌকে নিয়ে এখান থেকে চলে যায়। মনে হয় টাকাপয়সা দিয়ে কিছু একটা রফা করা হয়েছিল।"

"জগদীশনারায়ণ কি দুশ্চরিত্র ছিলেন স্যার?"

"বড়লোকদের ব্যাপার, সব খবর কি আর কানে আসে। তবে ওই ঘটনা ছাড়া আর তো কিছু শুনিনি। লালার বৌ চলে যাবার পর গ্রামেরই এক কমবয়সি বিধবাকে ওই কাজে বহাল করা হয়। অনেকে ভেবেছিল, আবার হয়তো কিছু ঘটবে, কিন্তু না। আসলে আগে যেটা বললাম, লালার ক্যারেক্টার ভালো ছিল না। পরে শুনেছি এরকম তোলাবাজি আগেও নাকি এক আধবার করেছিল।"

"এসব জেনেও সুরেশবাবু লালাবাবুকে কাজ দিয়েছিলেন স্যার!"

"হয়তো এগুলো জানতেন না। এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে তো কেউ মুখ খোলে না। তবে লালা যে একটু গুণ্ডা টাইপের — সেটা অজানা থাকার কথা নয়।"

"জমিজমা ছাড়া সুরেশবাবুর সঙ্গে কি লালাবাবুর কোনো সমস্যা হয়েছিল স্যার?"

"তেমন তো কিছু শুনিনি।"

"লালাবাবু এদিকে আর আসেননি স্যার?"

"এসেছিল শুনেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। যেটা জানি, সেটা হল গজলাল ধরা পড়ার কয়েকদিন পর কনকদা আর অজয়দার কাছে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল। সুরেশদার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিল বলে ক্ষমা চেয়েছিল সবার কাছে। এমনকী জগদীশনারায়ণের ব্যাপারটাও যে ভুল বোঝাবুঝি-সেটাও স্বীকার করেছিল।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি স্যার, সেই সময়ে রাজা জগদীশনারায়ণের আর সুরেশবাবুর মৃত্যু নিয়ে অন্য কোনো লোককে কি কেউ এখানে সন্দেহ করতো?"

"এই প্রশ্নটা আমি নিজেও অনেক করেছি। কিছুদিন আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই আপনাদেরই মতো আমার কাছে এসে একই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁকে যা বলেছিলাম, আপনাদেরও তাই বলছি। হ্যাঁ, গজলালকে আমরা কেউই পছন্দ করতাম না। একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে এখানে এসে পাঁচ বছরের মধ্যে যে লোকটা দুটো বড় দোকানের মালিক হয়ে লাখ লাখ টাকার কারবার করতে পারে, সে কখনওই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। শুনতাম একটা স্মাগলিং রিং -এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই ক্রিমিনালদের সঙ্গে তার দোস্তি থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সুরেশদাকে ওভাবে বেঁধে রেখে তিলে তিলে খুন করার কারণটা কী? গুলি করে ওঁকেও তো ফিনিশ করে দেওয়া যেত!"

"হয়তো ওঁকে খুন করার ইচ্ছে ছিল না স্যার।"

"হ্যাঁ, সেটাই পরে খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছিল। ভয় দেখিয়ে জগদীশনারায়ণের হিরে আর সোনাগুলোকে হাতানোই ছিল গজলালের লোকদের প্ল্যান। ওইদিন সুরেশদা থাকবেন না, বুড়ো জগদীশনারায়ণকে সহজেই ভয় দেখিয়ে কবজা করা যাবে — এই

ভেবে লোকগুলো এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ ওদের কেউ নিশ্চয়ই দেখে সুরেশদা ওখানে আসছে। সুরেশদা ওখানে একবার এসে পড়লে ঝামেলা হবে। তাই আচমকা ওঁর ওপর চড়াও হয়ে বেঁধে কাজের লোকদের চোখ এড়িয়ে আউটহাউসে রেখে এসেছিল। কাউকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আসেনি, কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে সেটা ঘটে গেছে। ফলে একজনের নয় –দু'–দু'জনের প্রাণ গেছে।"

"আপনি এই থিওরিতে বিশ্বাস করেন স্যার?"

"কে জানে! আসলে .... থাক সে কথা।"

"থাকবে কেন স্যার!"

"আসলে এই নিয়ে কনকদা, অজয়দা আর আমি বহুদিন আলোচনা করেছি, কিছুই এগোয়নি। অজয়দা বলতেন, আমাদের থিওরি কে শুনবে বল, পুলিশের কাছে কেস ইজ ক্লোজড।"

"আপনাদের থিওরি কী ছিল স্যার?"

"থিওরি মানে — পুলিশ লালাকে অনেক জেরা করেও পরে ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ লালা নাকি খুনের দিন মেদিনীপুরে ওর শ্বশুরবাড়িতে ছিল। সেটা সত্যি নাও হতে পারে। ওকে নাকি বনগাঁয় এক চায়ের দোকানে কেউ দেখেছিল। বনগাঁ এখান থেকে বড়জোর মাইল দশেক দূরে।"

"মাই গড!"

"কোনটে সত্যি কে জানে! তবে শুনেছি খুনিদের পরে অনেক অনুশোচনা হয়। সেইজন্যেই হয়তো পরে এসে এখানে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল। বিশেষ করে বাণীবউদির কাছে।"

নামটা নতুন। আমরা একটু অবাক হয়েছি দেখে অঞ্জনা বললেন, "আমার শাশুড়ি।"

কানেকশনটা বুঝতে পারলাম। ইনিই ছিলেন সুরেশবাবুর স্ত্রী, যিনি পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন। আমি হলে এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করতাম না। কিন্তু একেনবাবু সে পাত্তর নন।

"বুঝেছি স্যার, উনি সুরেশবাবুর স্ত্রী ছিলেন, পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন।"

"ঠিক। সুরেশদার সংসারটা ভেসে যাচ্ছিল। অজয়দাই হাল ধরেন। ছোট্ট ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করেন। কীরে ঠিক বলেছি?" বলে সস্নেহে অঞ্জনার দিকে তাকালেন কানাইবাবু।

অঞ্জনা সলজ্জে হাসল।

এক্কেবারে রাইট স্টেটমেন্ট স্যার, সুবীরবাবু একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান। ভালো কথা, অজয়বাবু কী করতেন?"

"অজয়দা হাবড়ায় একটা কারখানায় ফোরম্যান ছিলেন। পরে কনকদা যখন ওর সাইকেল সারাইয়ের ব্যবসা বেচে দিয়ে লরির ব্যবসায় নামেন তখন অজয়দাও বন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন। দুজনে মিলে ব্যবসাটা বেশ বড় করে ফেলেছিলেন। এখানকার প্রায় সব ব্যবসায়ীই ওঁদের লরি ব্যবহার করতেন। তারপর বছর পাঁচেক আগে অজয়দা আর বউদি গাড়ি করে বেনারস যাবার পথে অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। সে বছরই তো তোদের বিয়ে হবার কথা ছিল — তাই না?"

"হ্যাঁ," অনুচ্চস্বরে অঞ্জনা বলল।

"ওদের বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে গেল। তারপর কনকদাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তারপর তো গত বছর উনিও চলে গেলেন, নাতি–নাতনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

পারলেন না।”

অঞ্জনা দেখলাম একটু লাল হলেন। বললেন, “আপনারা গল্প করুন, আমি যাই রাত্রির রান্নার জোগাড় করি।”

“আমরাও এখুনি উঠব ম্যাডাম।”

“না, না, আপনারা কথা বলুন না,’ বলে অঞ্জনা বিদায় নিলেন।

অঞ্জনা চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন, “আপনারা সময় আর বেশি নষ্ট করব না স্যার– লালাবাবু ছাড়া আর কারোকে সন্দেহ হয়?”

“তেমন তো কাউকে মনে করতে পারছি না। আর সত্যি কথা বলতে কী, লালার ব্যাপারটাও নিতান্তই সন্দেহ। পুলিশ নিশ্চয়ই ওর অ্যালিবাই ভেরিফাই করেছিল।”

“করা তো উচিত ছিল স্যার। অ্যালিবাই যাঁর ছিল না, তিনি হলেন গজলালবাবু। ঠিক কি না স্যার?”

“তা ঠিক। গজলালের বিরুদ্ধে প্রমাণের অন্ত নেই। কিন্তু সুরেশদাকে গজলাল পছন্দ করত। কে না করত। গান পাগলা লোক ছিলেন। কথায় কথায় গানের কলি আওড়াতেন। প্রায়ই বলতেন গান গেয়ে যদি পেটে ভাত জুটত, তাহলে চাকরি বাকরি ছেড়ে শুধু গান নিয়েই পড়ে থাকতেন। ওগুলো অবশ্য কথার কথা। হিসেবিও ছিলেন যথেষ্ট। জদগীশনারায়ণের চাকরিটা ওঁর না নিলেও চলত। আমরা খ্যাপাতাম, বুড়ো মরলে সুরেশদা টু-পাইস পাবেন — সেইজন্যেই সুরেশদা কাজ নিয়েছেন। যাক সে কথা, সুরেশদার কথা বলতে শুরু করলেই আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ি। তবে হ্যাঁ, গজলালের ব্যাপারে আমার আরও একটা খটকা ছিল।”

“কী স্যার সেটা?”

“সুরেশদা অনেককে ভুল নামে ডাকতেন। গজলালকে উনি বরাবর জগলাল ডেকে এসেছেন। যেমন লালাকে ভালা। ভুল ধরিয়ে দিলেও একবার দু’বার ঠিক বলতেন, তারপর আবার সেই এক ভুল। এমনকী লালা যখন সুরেশদাকে এসে হুমকি দেয়, আমরা সুরেশদাকে থানায় ডায়রি করতে বলি। সুরেশদা সেই ডায়রি করে এসেছিলেন ভালার নামে। সেই নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করেছিলাম। সেইজন্যেই আমার মনে হয়েছিল – উনি জগলাল না লিখে গজলাল লিখলেন কেন। হতে পারে উনি অনেক ভাবনাচিন্তা করে ঠিক নামটাই লিখেছিলেন। তাও একটা খটকা থাকে।”

“ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট স্যার। ও হ্যাঁ, আপনি তো জানেন, উনি সাংকেতিকভাবে গজলালবাবুর নাম লিখেছিলেন।”

“হ্যাঁ, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। উনি জানতেন, আর কেউ না হোক-কনকদা বা অজয়দা ওটা বুঝবেন। নিজেদের মধ্যেও ওঁরা গোপনে এইভাবে কথা চালাচালি করতেন।”

“আপনি কী করে জানলেন স্যার?”

“সেটা একটা মজার ব্যাপার। একবার কনকদার কাছে গ্রামের কয়েকটা ছেলে এসেছিল সুরেশদার লেখা চিঠি নিয়ে। চিঠিতে ছিল, ‘ভাই কনক, আমার হয়ে ওদের হাতে একশো টাকা দিও, পরে তোমায় আমি দিয়ে দেব বা ওই রকম কিছু। কনকদা চিঠি পড়ে টাকা না দিয়ে ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিল। ওরা চলে যাবার পর আমি বললাম, ‘তাড়িয়ে দিলেন ছেলেগুলোকে — সুরেশদা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন।’ ‘কেন দুঃখ পাবে। ওই তো লিখেছে — NO। দেখলাম নীচে সুরেশ নামের পেছনে লেখা 14 15। অ্যালফাবেটের ১৪ নম্বরে N আর ১৫ নম্বরে O।”

"ভেরি ক্লেভার স্যার। আচ্ছা, জগদীশনারায়ণ যেদিন মারা যান, সেদিন তো ১৫ই অগাস্ট ছিল তাই না?"

"ঠিক তাই।"

"পুলিশ রিপোর্টে দেখেছিলাম স্যার, কাজের লোকেরা সুরেশবাবুর খোঁজে স্কুলে গিয়েছিল। সেখানে সুরেশবাবু ছিলেন না। স্কুলের পাশে এক মাস্টারমশাই থাকতেন, তিনিই পুলিশকে খবর দেন। সেই মাস্টারমশাই কে আপনি জানেন?"

"অনাদিবাবু, তিনিও গত হয়েছেন।"

"১৫ই অগাস্ট ছুটির দিন — কাজের লোকগুলো স্কুলে সুরেশবাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিল কেন?" একেনবাবু নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলেন।

"আমার ধারণা ওরা ভেবেছিল সুরেশবাবু তখনও ওখানে আছেন। ওই দিন স্কুলে সকালবেলা ফ্ল্যাগ তোলা হতো, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। একটা ফাংশনও হতো। স্কুলে ছাত্রদের গান সুরেশদাই শেখাতেন। ফাংশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুরেশদা ওখানে থাকতেন। দুপুরের একটু আগে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু সেদিন সেখান থেকে সুরেশদা আর বাড়ি ফেরেননি। কোনো কাজে জগদীশনারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন। সেটাই কাল হল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

বাড়ি ফেরার পথে দেখি একেনবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছেন। এক মনে ডায়েরি বার করে কাগজে কী সব আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে হাঁটছেন।

"কী বুঝছেন?" ঘাড় ঘুরিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর নেই।

"কী মশাই, একেবারে মৌনীবাবা হয়ে গেলেন যে!" প্রমথ ধমকের সুরে বলল।

"ভাবছি স্যার।"

"কী ভাবছেন এত?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ছাড়ান দে," প্রমথ বলল। "এখন নানারকম নকশা চলবে ওঁর।"

যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন সুবীরবাবু ফোনে জানি কার সঙ্গে কথা বলছেন।

"না, কালকে এখানে কোনো জায়গা নেই। আপনারা নেক্সট উইকে আসবেন বলেছিলেন.... আমি বুঝতে পারছি তিন মাস আপনারা থাকবেন, কিন্তু গেস্টদের তো আমরা চলে যেতে বলতে পারি না।"

হঠাৎ একেনবাবু সুবীরবাবুকে ইশারা করলেন। সুবীরবাবু ফোনের মুখে হাত দিয়ে বললেন, "কী?"

"ওঁদের আসতে বলুন স্যার, আমরা কাল সকালেই চলে যেতে পারি।"

"না, না, সে কী কথা, আপনারা দু'দিনের জন্য থাকবেন ঠিক করে এসেছেন।"

"প্লিজ স্যার, বলুন — আপনার এই ক্ষতি আমরা হতে দেব না।"

সুবীরবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে কাল বিকেলে ঘর খালি হবে, আপনারা আসুন।"

ফোনটা নামিয়ে সুবীরবাবু বললেন, "ছি, ছি, এটা কী বিশ্রী হল।"

"কিচ্ছু বিশ্রী হল না স্যার। তিন মাসের জন্য আপনি গেস্ট পাচ্ছেন, এক রাতের জন্য তাকে খোয়াবেন, এটা একটা কথার কথা হল?"

একেনবাবু ব্যাপার দেখে আমি অবাক। এর মধ্যেই ওঁর তদন্ত শেষ!

"আপনার তদন্তের কী হল? অঞ্জনা প্রশ্ন করলেন।

“বুঝলেন, ম্যাডাম, বাইশ বছরের পুরনো রহস্যের উদঘাটন দু’দিনে হবে না। তবে কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক–আর আপনাদের খুব ভালোবাসেন মনে হল।”

“হ্যাঁ, আমাদের আপন কাকার মতো। কিন্তু আপনারা কালই চলে যাবেন ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগছে। কিছুই খাওয়াতে পারলাম না।”

“সে কী কথা!” প্রমথ বলল, “কানাইবাবুর কাছে যাওয়ার জন্য মেনু কম হল নাকি?”

“তা হল না। তবে কালকের মেনু তো বাদ পড়ল।”

সুবীরবাবু বললেন, “সত্যি, আপনারা আসাতে ও খুব খুশি হয়েছে।”

“খুশি তো আমাদের হবার কথা। উনি খাটছেন আর আমরা খাচ্ছি।”

।। ৬।।

ফেরার পথে রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখলাম একেনবাবু ভীষণ গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

“কী এত ভাবছেন?”

“ভাবছি স্যার, মার্ডারটা ঘটেছিল একটা খুব শুভদিনে — আমাদের স্বাধীনতা দিবসে।”

প্রমথ বলল, “সো?”

“কিছুই না স্যার,” বলে হঠাৎ ঘ্যানঘ্যানে গলায় শুরু করলেন, “জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে,––––।”

“থামুন তো মশাই” প্রমথ ধমকে উঠল। “দেখছেন বাপি গাড়ি চালাচ্ছে।”

“থামছি স্যার।”

শব্দটা থামালেন, কিন্তু ওঁর মুখ নাড়ানো দেখলাম বন্ধ হল না। বাস্তবিকই খ্যাপা লোকটা।

“এবারের যাত্রাটা আপনার অকারণেই হল,” প্রমথ বলল। “তবে বারে বারে কী আর পাশ হয়, মাঝে মাঝে তো ফেলও মারতে হয়।”

“তা হয় স্যার, কিন্তু এবার ফেল মেরেছি বলছেন কেন?”

“কারণ অঞ্জনাকে প্রকারান্তরে তাই বলে এলেন।”

“তা এলাম স্যার।”

“সেটা সত্যি নয়।”

“কে জানে স্যার, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।”

“যেটুকু জানেন, সেটুকুই বলুন না, এখানে আমি আর বাপি ছাড়া তো কেউ নেই।”

“এখন বললেন স্যার বাপিবাবুর কনসেন্ট্রেশন থাকবে না, একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে।”

“এই বাপি একটা ধাবায় গাড়ি দাঁড় করা তো। চা খাব আর ওঁর কেরামতির খবর শুনব।”

“আপনি না স্যার, সত্যি।”

একটু বাদেই একটা ভদ্রগোছের ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম।

চা, তাওয়া রুটি আর ডাল মাখানি অর্ডার দিয়ে দূরের একটা বেঞ্চিতে নিরিবিলিতে বসলাম।

"এবার বলুন," আমি বললাম।

একেনবাবু শুরু করলেন। "গজলালের বিরুদ্ধে কেসটা জোরদার হয়েছে দুটো কারণে। ওঁর কাছে হিরেটা ছিল। উনি অস্বীকার করেননি যে ওটা জগদীশনারায়ণের কাছ থেকে পাওয়া; আর দ্বিতীয় হল গজলালের নামটা দেয়ালে মরার আগে সুরেশবাবু লিখে গিয়েছেন। সোজাসুজি নয়, সাংকেতিক ভাবে। তাই তো স্যার?"

"ইয়েস।" আমি আর প্রমথ দু'জনেই একসঙ্গে বললাম।

"কিন্তু স্যার একটা গাছে তো দু'ধরনের ফুল হয়–দেখলেন তো কাল।"

একেনবাবু যে কী বলতে চাইছেন — মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। "হোয়াট ড্যু ইউ মিন?"

"আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, আমরা হয়তো ভাবছি গাছটা লাল, তারপর হঠাৎ দেখলাম বেগুনি।"

"কী হেঁয়ালি শুরু করেছেন মশাই, একটু ঝেড়ে কাশুন না!" প্রমথ ধমক লাগালো।

"যদি ভাবা যায় স্যার, 'গজলাল' নামটা সুরেশবাবু লিখতে চাননি। আর কানাইবাবু তো বললেন গজলালের নাম লিখতে চাইলে উনি লিখতেন 'জগলাল'।"

"ননসেন্স! তাহলে কী লিখতে চেয়েছিলেন?" প্রমথ ধমক লাগাল।

"সেটাই স্যার আমি ভাবছিলাম। সংখ্যাগুলো আবার দেখুন," বলে পকেট থেকে ওঁর ডায়রির একটা পাতা ছিঁড়ে লিখলেন।

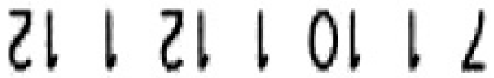

"আমরা জানি স্যার, অ্যালফাবেট গুণে গুণে দেখলে–A হল '1', B হল '2', এইভাবে চললে G হল '7', J হবে '10', আর L হবে '12'। উনি পেছন ফিরে লিখছিলেন স্যার, তাই পুলিশ ওটাকে ঘুরিয়ে পড়েছিল 7 1 10 1 12 1 12। তাই পেয়েছিল GAJALAL। ধরুন, আমরা সেটা না করে পড়ি, 12 1 12 1 01 1 7। তাহলে কী দাঁড়াবে, LALA 01 AG।....."

"ওয়েট এ মিনিট!" আমি বলে উঠলাম।

"দাঁড়ান স্যার, আমার বলা শেষ হয়নি। সংখ্যাগুলোকে একটু অন্য রকম করে লিখছি–

12 1 12 1 0 11 7– এবার পড়ুন....।"

"LALA 0 KG। ও মাই গড! ওই ঘোষের পো কালীচরণ না কি জানি তার নাম–সেটা তো KG হবে!"

"রাইট স্যার।"

"তার মানে তো ওই দুজনকেই খুন করেছে!"

"আপনি আমার পয়েন্ট মিস করছেন স্যার। লালাবাবুর অ্যালিবাই নিশ্চয়ই পুলিশ খতিয়ে দেখেছিল এবং তাতে কোনো ফাঁক পায়নি। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, সেটা

হল সংখ্যাগুলোর মধ্যে নানান জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা অর্থ খুঁজে বার করে–সেটাকেই ধ্রুব সত্য মনে করলে বিরাট ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়।”

“এটা মন্দ বলেননি।” আমায় মানতে হল।

“আমার একটা থিওরি আছে,” প্রমথ বলল, “যদিও প্রমাণ করতে পারব না।”

“কী থিওরি?”

“সুরেশবাবু খুন হয়েছেন অবৈধ সম্পর্কের জেরে। সুরেশবাবুর অরিজিনাল স্ত্রী–মানে ওই বাণীবউদি আর অজয়বাবুর মধ্যে প্রেম ছিল। দু’জনে শলা করে সুরেশবাবুকে খুন করেছিলেন। কী একেনবাবু, ঠিক বলছি কি না বলুন?”

“আপনি স্যার আমার ভাত মারবেন।” একেনবাবু প্রমথকে বললেন।

“গুড, এবার প্রমাণ করুন, কেন আমি ঠিক বলছি।”

“সেখানেই মুশকিল স্যার। তবে কিনা সেটা যদি সত্যি হতো, তাহলে সুরেশবাবু ওইভাবে নামের ক্লু দিতেন না।”

“তার মানে?” প্রমথ প্রশ্ন করল।

“মানে স্যার, সুরেশবাবু খুনিকে ধোঁকা দেবার জন্যে এই রকম সংখ্যার কোড ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু অজয়বাবুর কোডটা জানা ছিল, সুতরাং অজয়বাবু খুনি হলে সুরেশবাবু অন্যভাবে খুনির নাম লিখতেন।”

দ্যাট্স ট্রু। কথাটা অযৌক্তিক নয়। আমি ভাবার চেষ্টা করছিলাম, একেনবাবু ঠিক কোনদিকে এগোচ্ছেন।

ধাবার সার্ভিস খুব ফাস্ট। এর মধ্যেই আমাদের খাবার এসে গেল। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে একেনবাবু বললেন, “যেটা প্রশ্ন, সেটা হল এই সংখ্যাগুলো সুরেশবাবু অন্য কোনো কোড ব্যবহার করে লিখেছিলেন কি না।”

“অন্য কোনো কোড!”

“কেন নয় স্যার, নইলে খুনিকে ধরাবেন কী করে?”

“খুনিকে ধরাবেন মানে? আপনি কি প্রমথর স্টুপিড থিওরিটা ঠিক বলে ভাবছেন?”

“চুপ কর, আমার কোনো থিওরি স্টুপিড নয়।” প্রমথ গর্জন করল।

“প্রমথবাবুর থিওরি ঠিক না ভুল জোর করে বলতে পারব না স্যার, তবে আমার নিজের আরেকটা থিওরি আছে।”

“কী সেটা?”

“গজলাল যে জগদীশনারায়ণকে হিরের জন্যে পনেরো লক্ষ টাকা দেবে–সেটা সুরেশবাবু ওঁর প্রাণের বন্ধু অজয়বাবু আর কনকবাবুকে জানিয়েছেন। প্ল্যান ছিল টাকাটা পাওয়া মাত্র ওঁরা তিনজন জগদীশনারায়ণকে খুন করবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুরেশবাবুর উপর পুলিশের সন্দেহটা পড়বে। সুতরাং ঠিক করা হল, সুরেশবাবুকে হাতমুখ বেঁধে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে আটকে রাখা হবে। সেক্ষেত্রে পুলিশ এসে মনে করবে– ডাকাতরা সুরেশবাবুকে বেঁধে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়ে জগদীশনারায়ণকে খুন করে হিরে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। তবে একটু ভাবলেই বোঝা যায় স্যার, প্ল্যানটা অত্যন্ত কাঁচা। একটা খুনই যদি করতে হয়, তাহলে ডাকাতদের দুটো খুন করতে অসুবিধা কী? এইভাবে বেঁধেছেঁদে একজনকে ঘরে আটকে রাখা অনেক বেশি রিস্কি–পুলিশের মনে সন্দেহ জাগবে।”

যাক সে কথা। এবার জিনিসটা একটু ইন্টারেস্টিং অবস্থায় পৌঁছল। পুলিশ সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সার্চ করল না। সুরেশবাবু ওখানেই আটকা পড়ে রইলেন। তখন কনকবাবু

আর অজয়বাবু চাইলে পুলিশকে জানাতে পারতেন যে, ওঁরা খুঁজতে খুঁজতে সুরেশবাবুকে পেয়েছেন–উনি সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে বাঁধা পড়ে রয়েছেন। কিন্তু ওঁরা ভেবেচিন্তেই সেটা করলেন না। সুরেশবাবু যদি উদ্ধার হন, পুলিশ গজলালকে আটক করলেও সন্দেহের তীর সুরেশবাবুর ওপরও থাকবে। পুলিশ যদি হঠাৎ সুরেশবাবুর বা সন্দেহবশে ওঁদের বাড়ি সার্চ করে, তাহলে টাকার হদিশ পেয়ে যাবে। সুরেশবাবুর সঙ্গে অজয় এবং কনকও ধরা পড়বেন। ওঁরা তাই কিছুই করলেন না, বন্ধুকে তিলে তিলে মরতে দিলেন।"

"মাই গড!" আমি বললাম।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বলতে চান, ওই বাণীবউদি ক্যারেক্টার এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না! বরকে খুন করে প্রেমিকের ঘর করা তো স্ট্রং মোটিভেটর।"

"হু নোজ স্যার। তবে কি না, সুরেশবাবুর মৃত্যুর পর অজয়বাবু যদি শুধু বন্ধুর বৌকে পেতেন– তাহলে আপনার থিওরিটা জোরদার হত। কিন্তু এক্ষেত্রে অজয়বাবু আর কনকবাবু–দু'জনেই বেশ কিছু টাকারও মালিক হয়েছিলেন। সাইকেল সারানোর ব্যবসা থেকে কনকবাবু লরির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। অজয়বাবু চাকরি ছেড়ে তাতে যোগ দেন। এই ব্যবসায় তো অনেক ক্যাপিটাল লাগে। হঠাৎ টাকাগুলো এল কোত্থেকে? তারপর ঐ সুন্দর ছায়ানীড় বাড়িটা– সেটা বানাতেও তো পয়সা লেগেছিল অনেক। না স্যার, আমার মনে হয় টাকার ব্যাপারটাই মুখ্য। যদিও মানি স্যার, এইসব অবৈধ সম্পর্ক থেকে অনেক খুনোখুনি হয়।"

"প্রমথর থিওরি বাদ দিন, আপনি আপনার কথাটা শেষ করুন," আমি বললাম।

"আমার ধারণা টাকাটা কনকবাবু আর অজয়বাবুর কাছে ছিল। সুরেশবাবুকে উদ্ধার করলে, তাহলেই উনি ভাগ পেতেন। তিনি বেঁচে না থাকায় অজয়বাবু আর কনকবাবুর ভাগটা বাড়ল। একের তিন না হয়ে আধা।

যাই হোক, সুরেশবাবু যখন বুঝতে পারলেন বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন মরার আগে দেয়ালে ওদের নাম লেখার চেষ্টা করলেন। এবিসিডি –কোড বন্ধুরা জানে। নতুন কী কোড ব্যবহার করা যায়?

গান পাগলা মানুষ, হয়তো ওঁর মনে হয়েছিল ১৫–ই অগস্টে খুন হয়েছে।

এই গানটা সেই দিনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত–সুতরাং যাঁরা ওঁর সঙ্কেত বোঝার চেষ্টা করবেন তাঁদের মাথায় সেটা থাকবে। তাও একটা হিন্ট দেবার জন্যে দুটো অক্ষর NA নীচে জুড়ে দিলেন। NA মানে National Anthem।"

"আই সি, কিন্তু তাহলে কী দাঁড়ায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"গুণে দেখুন স্যার, আমি গাইব না, গাইলে প্রমথবাবু আবার বকবেন। এই নিন স্যার, এই ছিল সুরেশবাবুর কোড–7 1 10 1 12 1 12। তবে কোডটা একটু অন্যভাবে পড়ুন। এই ভাবে 7 1 10 11 2 11 2। সংখ্যাগুলো এক–শুধু দুটো পেয়ার একটু আলাদা ভাবে লিখলাম।"

আমি আর প্রমথ জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে–র অক্ষর গুণে গুণে লিখতে লাগলাম। জ হল 1, ন হল 2, গ হল 3, ণ হল 4, ম হল 5, ন হল 6, অ হল 7, ধি হল 8, না হল 9, 10 হল য় আর 11 হল ক। তাহলে 7 1 10 11 2 11 2 দাঁড়াচ্ছে: অজয় কনক ২– ও মাই গড!

আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

"আমার মনে হয় সুরেশবাবু ভাবেননি স্যার যে সংখ্যাগুলো অ্যালফাবেটের পজিশন হিসেবে সাজালে গজলাল হয়ে দাঁড়াবে!" একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন।

"সাধু, সাধু," প্রমথ বলল। "নাঃ, আপনার কল্পনাশক্তিকে সেলাম না ঠুকে পারছি না। কিন্তু এইরকম আরও কিছু কল্পনাশক্তি লাগালে তো যাকে খুশি তাকেই খুনি বানিয়ে ফেলতে পারেন!"

"তাই তো বললাম স্যার, এটা নিতান্তই থিওরি।"

"তা হোক থিওরিটা মন্দ নয়, এটা সত্যি হওয়াও সম্ভব।" আমি বললাম।

"তোর মুণ্ডু!" আমাকে নস্যাৎ করে প্রমথ একেনবাবুকে বলল, "তা গোয়েন্দামশাই, এই কীর্তির কথা সুবীর আর অঞ্জনাকে বলে এলেন না কেন? ওদের কাছে তো হেরো হয়ে ফিরলেন।"

"কী যে বলেন স্যার। আমার থিওরি ঠিক হলেও ওঁদের বাবাদের কুকর্মের জন্যে তো ওঁরা দায়ী নন। ওয়ান্ডারফুল কাপল স্যার, জাস্ট ওয়ান্ডারফুল!"